ভাই গিরিশচন্দ্র সেন : দেশকাল জীবন ও সাহিত্যকর্ম

ইসরাত মেরিন

পিএইচ.ডি. গবেষক

শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৪৩

পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জানুয়ারি–২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

প্রয়াত শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শাহ্ হালিমুজ্জামান স্যারকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইসরাত মেরিন কর্তৃক উপস্থাপিত 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন : দেশকাল জীবন ও সাহিত্যকর্ম' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। গবেষক গভীর অনুসন্ধান ও কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন।

আমার জানা মতে, গবেষক এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(আবুল কাসেম ফজলুল হক)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন বাঙালি সমাজে আজ অনেকটাই বিস্মৃত। তাঁর জীবন সম্পর্কিত তথ্য প্রমাণ এখন দুর্লভ প্রায়। কোরআনের বঙ্গানুবাদ ছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনাও আজ দুষ্প্রাপ্য। সমকালে বা পরবর্তী সময়েও তাঁর জীবনী নিয়ে তেমন লেখালেখি হয়নি। তাঁর লিখিত 'আত্ম-জীবন' (১৩১৩ সাল ২২ পৌষ) নামক গ্রন্থ তাঁর জীবন সম্পর্কিত তথ্যের মূল অবলম্বন। এ পর্যন্ত যাঁরা তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁরা সকলেই তথ্যের জন্য 'আত্ম-জীবন' অবলম্বন করেছেন। কাজী মোতাহার হোসেন প্রথম 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' নামক সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনার মাধ্যমে তাঁর প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর আবুল আহসান চৌধুরী 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' নামে সংক্ষিপ্তাকারে গিরিশচন্দ্র সেনের সম্পূর্ণ জীবনী রচনা করেন। গিরিশচন্দ্রের ভাইয়ের পৌত্র রণজিৎ কুমার সেনও 'মওলানা ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' নামে গিরিশচন্দ্রের একটি জীবনী রচনার প্রয়াস পান। ড. সফিউদ্দিন আহমদ গিরিশচন্দ্রের 'আত্ম-জীবন' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি পরবর্তী সময়ে গিরিশচন্দ্র সেন সম্পর্কিত 'কোরানের প্রথম অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেন। রঞ্জন গুপ্তের 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' গিরিশ জীবনীর এক অনন্য সংযোজন। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে আমরা দু / একটি খণ্ড খণ্ড বর্ণনা পাই প্রিয়বালা গুপ্তার 'স্মৃতিমঞ্জুষা' গ্রন্থে। মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের 'কোরআনের বঙ্গানুবাদকারী ভাই গিরিশচন্দ্র সেন: জীবন ও কর্ম' গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। এসব রচনায় গিরিশচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। তবে সবদিক মিলিয়ে এখনো গিরিশ জীবনী রচনার প্রয়োজন আছে। এসব গ্রন্থ গিরিশচন্দ্রের জীবনী রচনায় আমাকে পথনির্দেশনা দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের 'আত্ম-জীবন'কেই অধিকতর অনুসরণ করেছি। এছাড়া গিরিশচন্দ্রের জীবন সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধানে তাঁর পৈতৃক নিবাস পাঁচদোনায় গিয়েছি। কিন্তু সেখানে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন বলতে একটি দালানের ভগ্নাবশেষ অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র। তাঁর কর্মস্থল ময়মনসিংহেও তাঁর জীবন সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান করেছি। সেখান থেকেও রিক্ত হস্তে ফিরে এসেছি। গিরিশচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের জন্য দুবার কলকাতা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ, আদি ব্রাহ্মসমাজ, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশন, কলেজ স্ট্রিট সংলগ্ন লাইব্রেরিতে গিয়েছি। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির জীবনী ও ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত কিছু বই পেয়েছি। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। 'বাংলাদেশ ব্রাহ্মসমাজ'ও গিরিশ তথ্য উপাত্তের ক্ষেত্রে তেমন সহযোগিতা করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মধর্ম এখন মৃতপ্রায় ধর্মে পরিণত হয়েছে। এর কার্যপ্রণালীতে এখন আর সেই প্রাণ নেই। যার ফলে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবুও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি, জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় যাদুঘর গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল আর্কাইভস, ন্যাশনাল লাইব্রেরির সহযোগিতায় এ দুঃসাধ্য সাধনে কর্মপ্রয়াস চালিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক এর তত্ত্বাবধানে আমি আমার ‘ভাই গিরিশচন্দ্র সেন : দেশকাল জীবন ও সাহিত্যকর্ম’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা করি। অভিসন্দর্ভের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সামগ্রিক বিষয় বাস্তবায়নে তিনি আমাকে সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। অনুপ্রেরণা, দিকনির্দেশনা, পরামর্শ দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন প্রখ্যাত লেখক সাজাহান সাকিদার। আমার মা-বাবা, ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধব যাঁরা আমার মানসিক শক্তিকে দৃঢ় করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার জীবনসঙ্গী মোঃ শফিকুল ইসলাম যাঁর উপর সংসারের সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থেকেছি, যাঁর প্রেরণা, ভালোবাসা ও নিরন্তর তাগিদ ব্যতীত এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না, তাঁর প্রতি আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা থেকে বিরত থাকছি।

ইসরাত মেরিন
পিএইচ.ডি গবেষক
শিক্ষাবর্ষ– ২০১২-২০১৩, রেজিস্ট্রেশন নম্বর–১৪৩
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন : দেশকাল জীবন ও সাহিত্যকর্ম

পৃষ্ঠা

অবতরণিকা : ৮

প্রথম অধ্যায় : দেশকাল ও সমাজ

ক. সমসাময়িক দেশকাল ও সমাজ : ১২

খ. রাজনৈতিক পট পরিবর্তন : ইংরেজ শাসন : ১৭

গ. শিক্ষায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি : ২২

ঘ. সাহিত্যে ও সমাজজীবনে আধুনিকতার প্রসার : ২৯

ঙ. ধর্মসংস্কার ও মানবীয় মূল্যবোধ : ৩৬

চ. রেনেসাঁসের ধারায় নবতর চেতনার উন্মেষ : ৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : জীবনকথা

ক. বংশ পরিচয় ও জন্ম : ৫৮

খ. শৈশব ও কৈশোর : ৬২

গ. শিক্ষাজীবন : ৬৭

ঘ. কর্মজীবন : ৭৩

ঙ. সংসারজীবন : ৭৬

চ. ধর্মজীবন : ৮৩

ছ. স্ত্রীশিক্ষায় অনুরাগ : ১০৩

জ. পারিবারিক বিষয়সম্পত্তি ও গিরিশচন্দ্রের জীবিকা সংস্থান : ১১২

ঝ. কেশবচন্দ্রের কন্যার বিয়ে নিয়ে বিতর্ক ও গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা : ১১৬

ঞ. বঙ্গভঙ্গের প্রতি গিরিশচন্দ্রের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি : ১২৭

ট. গিরিশচন্দ্রের উইল : ১৩৫

ঠ. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : ১৪০

ড. পরলোক গমন। : ১৪৫

তৃতীয় অধ্যায় : ব্রাহ্মসমাজ ও গিরিশচন্দ্র সেন

ক. ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস : ১৫৪

খ. পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ : ১৭০

গ. ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ভাই গিরিশচন্দ্রের সম্পৃক্ততা : ১৮২

চতুর্থ অধ্যায় : গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন ও রচনাবলীর পরিচয়

ক. সাহিত্যিক জীবন ও রচনাবলীর বিষয়বস্তু : ১৮৯

খ. রচনার নিদর্শন ও গ্রন্থ পরিচিতি : ১৯৭

গ. পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা : ২১৪

ঘ. সাময়িকপত্র সম্পাদনা : ২১৫

ঙ. কোরআন অনুবাদে গিরিশচন্দ্রের সাফল্য : ২১৮

চ. কোরআন অনুবাদে সমকালীন প্রতিক্রিয়া : ২২৯

পঞ্চম অধ্যায় : রচনাবলীর পর্যালোচনা ও মূল্যবিচার : ২৩৮

গ্রন্থপঞ্জী : ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট নবজাগরণের ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। মানুষের জীবন-যাপন, চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য-ভাবনা, ধর্মবোধ এক নবতর মাত্রা পায়। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলায় নবজাগরণের নব অরুণোদয় সূচিত হলেও রামমোহনের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রাণস্পর্শে তা সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়। রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতবর্ষে আলোর প্রতিফলন ঘটাতে হলে প্রথমেই তাঁদের অন্তর থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি উপড়ে ফেলতে হবে। আধুনিক শিক্ষা ও মানবতাবোধ পারে জরাজীর্ণ অন্ধত্বকে দূর করে ভারতবর্ষ তথা বাংলাকে হীনম্মন্যতার কলুষ হতে মুক্ত করতে। রামমোহনের ধর্মসংস্কার বা রিফর্মেশন ধারার পরবর্তী সাধক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ'এ যোগদান করেন। সংস্কারবাদী তারুণ্যদীপ্ত কেশবচন্দ্রের সঙ্গে অচিরেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামক পৃথক সমাজ গঠন করেন। গিরিশচন্দ্র কেশব অনুসারী হয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' এ যোগদান করেন এবং আজীবন কেশবচন্দ্রেরই একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে নিবেদিত থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর সমাজে এমনকি পরিবারেও তিনি নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। কিন্তু বিপদে তিনি ধৈর্য ধরেছেন, পরম ব্রহ্মের সাধনায় মগ্ন থেকেছেন। কোনো প্রতিকূলতাই তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি।

গিরিশচন্দ্র সেন শিক্ষাদীক্ষা বঞ্চিত পশ্চাদপদ পূর্ববাংলার যে গ্রামীণ পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করেছেন সে পরিবেশের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে আত্মবিকাশের অমসৃণ পথ পেরিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। অবশ্য তাঁর সময়ের যুগমানসকে তিনি লালন করতে পারেননি। পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষা তিনি অল্পই লাভ করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বরাবরই প্রাচীনকে বেছে নিয়েছেন। বিশ্বাস এবং ভক্তির আতিশয্যে কুয়াশাচ্ছন্ন ভাবালুতার ইন্দ্রজাল তিনি বিস্তার করেছেন তাঁর চারপাশে। অথচ তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বাংলার আধুনিকতার পাদপীঠ কলকাতাতে অবস্থান করছেন। তিনি অন্ধভাবে ব্রাহ্মধর্ম ও কেশবচন্দ্রকেই অনুসরণ করেছেন। আধুনিকতার চরম উৎকর্ষে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ভক্তি শ্রদ্ধার দুর্ভেদ্য প্রাচীর পেরিয়ে সময়োপযোগী পরিবর্তনকে আত্মস্থ করতে পারেননি। এককেন্দ্রিক চিন্তার মধ্যেই ঘূর্ণায়মান ছিল তাঁর জীবনের সরল বৃত্ত।

গিরিশচন্দ্রের জীবনাচরণে কোনো কৃত্রিমতা নেই। যা বিশ্বাস করেছেন তা-ই জীবনের চরম সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। কোনো বাধা-বিপত্তি, ভুল-ভ্রান্তি, এমনকি চরম বিপর্যয়ও তাঁর বিশ্বাসকে টলাতে পারেনি। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, সমাজের প্রতিকূলতা সহ্য করেছেন, ধর্ম সাধনায় অবিচল থাকতে গিয়ে সমালোচিত হয়েছেন, অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এমনকি আদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে তাঁর জীবনের চরম

Dhaka University Institutional Repository

বিপর্যয়কে মেনে নিয়েছেন। তাঁর কারণে তাঁর স্ত্রীও পরিবারের আপনজনের কাছ থেকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেয়েছেন। তারপরও তাঁর স্ত্রী ছিল তার কাছে সবচেয়ে ভরসার স্থান। স্ত্রীর অকাল প্রয়াণে বড্ড বেশি নিঃসঙ্গ গিরিশচন্দ্র ঝুঁকে পড়েন ব্রাহ্মধর্মের উন্নয়ন ও প্রচারকাজে। এ উদ্দেশ্যে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে, প্রদেশ থেকে প্রদেশে। এ ভ্রমণ মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। প্রচারযাত্রায় বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। একটি নব্য ধর্মকে সনাতন হিন্দুরা সুনজরে দেখেননি। বিরূপ মনোভাবে তাঁরা তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। শত সহস্র প্রতিকূলতায় মুষড়ে না পড়ে তিনি তাঁর কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করেছেন। তাঁর নিরলস সাধনায় মুগ্ধ হয়ে কেশবচন্দ্র 'রবিবাসরীয় মিরার' পত্রিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করে তাঁকে প্রচারকের মর্যাদা দেন। কেশবচন্দ্রের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। কেশবচন্দ্র যখন তাঁর নাবালিকা কন্যার বিয়ে (যা ইতিহাসে 'কোচবিহার বিবাহ' নামে খ্যাত) নিয়ে বিতর্কিত হয়ে পড়েন, উন্নতশীল ব্রাহ্মরা যখন আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণে একে একে তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, গিরিশচন্দ্র তখনো অবিচল নিষ্ঠায় কেশবচন্দ্রকেই সমর্থন করেছেন। তাঁর ততোধিক একগুঁয়েমির কারণে তাঁর পরিবারের উন্নতিশীল ব্রাহ্মরা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন এমনকি তাঁর সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করেছিলেন। পারিবারিক টানাপোড়ন কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধাকে এতটুকু কমাতে পারেনি। 'কোচবিহার বিবাহ'এর ঝড়ে বিধ্বস্ত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' আর কেশবচন্দ্র ১৮৮০ সালে 'নববিধান' ঘোষণা করেন।

গিরিশচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও সাধনার প্রতি কেশবচন্দ্রেরও ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাই সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রয়াসে তিনি 'নববিধানের' বেদী থেকে গিরিশচন্দ্রকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কীয় দায়িত্ব অর্পণ করেন। গিরিশচন্দ্র এ দায়িত্বকে গুরুদায়িত্ব মনে করে নিরলস কর্ম প্রয়াসে ব্রতী হন। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে লক্ষ্ণৌ নগরে গিয়ে আরবি শিখেন। কলকাতায় ও ঢাকায় এসে পুনরায় আরবি চর্চা করেন। এরপর 'নববিধান'এর প্রয়োজনে তিনি আবার ময়মনসিংহে ফিরে আসেন। এখানে থাকাবস্থায় তিনি পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদ খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করেন। সামাজিক বিরূপতার আশঙ্কায় তিনি তাঁর অনুবাদের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে অনুবাদকের নাম উল্লেখ করেননি। কোরআন বঙ্গানুবাদের মতো মহান দায়িত্ব পালন করেও তিনি রক্ষণশীল মুসলমানদের তোপের মুখে পড়েন। কেউ কেউ তাঁকে শিরশ্ছেদের হুমকিও দিয়েছেন। তবে মুসলিম সমাজের কিছু উদার প্রাণ ব্যক্তি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। কোরআন বঙ্গানুবাদ ছাড়াও তিনি ইসলাম সম্পর্কীয় অসংখ্য গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এসব গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ছিল সর্ব ধর্মের সমন্বয় সাধন। যা 'নববিধান ব্রাহ্মধর্মে'র আদর্শ। ইসলাম সম্পর্কীয় রচনা ছাড়া অন্য ধর্ম সম্পর্কীয় রচনা ও কিছু মৌলিক রচনাও তাঁর রয়েছে। তাঁর সব রচনাই ধর্মজাত প্রেরণা থেকেই উৎসারিত। তবু এসব রচনায় যে সমাজ, জীবন ও জীবনের আনুষঙ্গিক চালচিত্র ফুটে উঠেছে তা সমসাময়িক জীবনবোধেরই বাস্তব রূপায়ণ।

Dhaka University Institutional Repository

গিরিশচন্দ্র পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকপত্রেও লেখালেখি করেছেন। ভারতাশ্রমে অবস্থানকালে তিনি ‘জ্ঞানোন্নতি বিধায়িনী’ ও ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ‘পরিচারিকা’ নামক মাসিক পত্রিকায়ও তিনি বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন। ১২ বছর ‘মহিলা’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সমসাময়িক অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি নারীশিক্ষা ও নারীকল্যাণকে মনে প্রাণে সমর্থন করেছেন। ছাত্র বয়স থেকেই নারীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর প্রশ্নোত্তর ছলে তিনি ‘বনিতা বিনোদ’ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। নারী শিক্ষার জন্য পাঁচদোনা ও ময়মনসিংহে তিনি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন।

গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর জন্মভূমি পূর্ববাংলাকে ভালোবাসতেন। জন্মভূমির প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমত্ববোধ। জন্মভূমি পাঁচদোনার কল্যাণে তিনি তাঁর সম্পত্তির একটি অংশও দান করে গেছেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গে পূর্ববঙ্গকে যখন আলাদা প্রদেশের মর্যাদা দেয়া হয়, শিক্ষাদীক্ষা, চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে যখন আলাদা সুযোগ সৃষ্টি হয়, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। পূর্ববাংলার মানুষ শিক্ষিত হবে, চাকরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে এটি ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণায় সে স্বপ্নই যেন সফল হতে চলেছিল। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সভা-সমিতি, মিছিল-মিটিং, রাখীবন্ধন, অরন্ধন, নগ্নপদে পথ পরিক্রমার পর গঙ্গাস্নান এবং স্বদেশী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে, তখন তিনি ব্যথিত হয়েছেন এবং এসবের বিরুদ্ধে লেখনি চালনা করেছেন। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য, বঙ্গভঙ্গের পক্ষে তাঁর অবস্থানের পেছনে ইংরেজ-প্রীতিও কিছুটা সক্রিয় ছিল। আর এ রাজভক্তি ‘নববিধান’এর আদর্শ রূপেই তাঁর চেতনায় প্রভাব ফেলেছিল।

গিরিশচন্দ্র সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। নাগরিক জীবনের বিলাসিতা তাঁকে কখনো গ্রাস করেনি। জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অতি সাধারণ ও গরীবানা রূপে চলাফেরা করেছেন। খাদ্যাভাসেও ছিলেন অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক মানুষ। তিনি ছিলেন সাধারণত নিরামিষভোজী। তাঁর স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় স্ত্রীর বিচলিত অনুরোধে তিনি মাছ খাওয়া শুরু করেন বটে কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করে আমিষ খাওয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন। শুধু ডাল চর্চরি ও ভাত খেয়ে ৭১/৭২ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন এবং এ বয়সেও পর্যাপ্ত পরিশ্রম করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ১৯০০ সালের দিকে মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে Erysipelas বা বিসর্প রোগে আক্রান্ত হন। এতে তাঁর পা ভীষণ স্ফীত হয়ে উঠে। দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় সে যাত্রায় তিনি অবশ্য সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠেন এবং পুনরুদ্যমে লেখালেখির কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। এবার তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়, তিনি এতটাই কাতর হয়ে পড়েন যে, খাওয়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেন। বায়ু পরিবর্তনে কিছুটা সুস্থ হলে তিনি স্বদেশে ফিরে আসার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। পরিশেষে জন্মভূমির মাটিতেই তিনি ১৫ আগস্ট ১৯১০ খ্রি. (৩০ শ্রাবণ) সকাল দশটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

গিরিশচন্দ্র সেন আধুনিক ধর্ম সমন্বয়ে এক মহৎ প্রাণ ব্যক্তিত্ব। কোরআন বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে তিনি সহস্রাব্দের কুসংস্কারের জড়তা থেকে মুক্ত করেছিলেন। অথচ তাঁর মৃত্যুর মাত্র একশ বছর পর তিনি আজ অনেকটাই বিস্মৃত। তাঁর রচনাদিও আজ দুষ্প্রাপ্য। বাংলার ধর্মীয় কিংবা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি তেমন কোনো স্থান পাননি। জোরালোভাবে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণও তিনি করতে পারেননি। অথচ কী মহৎপ্রাণ উদারতায় সকল ধর্মের সঙ্গে তিনি ইসলাম ধর্মের সেতু বন্ধনের পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। এ ধর্মসেবক যশস্বী ব্যক্তিত্বের মানস গঠনে সমসাময়িক কালের ভূমিকা, তাঁর জীবনের বিকাশ ও তাঁর রচিত সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করে তাঁর অবদানকে পাঠক সমাজে পৌঁছে দেয়া আমার 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন : দেশকাল জীবন ও সাহিত্যকর্ম' অভিসন্দর্ভের অভিপ্রায়। যথাসম্ভব অতিকথনকে বর্জন করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে গিরিশ জীবনীর পূর্বাপর আলোচনায় বিয়ষটি সুসংহতভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছি। নিম্নোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আমি আমার গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি–

* ভূমিকা
* প্রথম অধ্যায় : দেশকাল ও সমাজ
* দ্বিতীয় অধ্যায় : জীবনকথা
* তৃতীয় অধ্যায় : ব্রাহ্মসমাজ ও গিরিশচন্দ্র সেন
* চতুর্থ অধ্যায় : গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন ও রচনাবলীর পরিচয়
* পঞ্চম অধ্যায় : রচনাবলীর পর্যালোচনা ও মূল্যবিচার
* গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : দেশকাল ও সমাজ

ক. সমসাময়িক দেশকাল ও সমাজ

কোরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদের দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর নাম ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। এ যশস্বী পুরুষ ১৮৩৫ সালে[১] পূর্ববঙ্গের মহেশ্বরদী পরগণার পাঁচদোনা গ্রামের বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গোঁড়া হিন্দুয়ানীতে বিশ্বাসী গিরিশচন্দ্র পরবর্তী সময়ে কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে ধর্মান্তরিত হয়ে ব্রাহ্মধর্মের একনিষ্ঠ সেবকে পরিণত হন। ধর্মপথ পরিচালনায় নববিধান আচার্যের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কীয় অনুবাদে মনোনিবেশ করেন। আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষা থেকে তিনি ইসলাম সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ অনুবাদে যেমন দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি অন্যান্য ধর্ম ও মৌলিক সাহিত্য রচনাতেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রয়াসে ইসলাম ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য এবং মনীষীদের জীবনী অনুবাদে তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্রের অনুরক্ত ও যোগ্য উত্তরসূরী। ধর্ম সংস্কারের নব চেতনাবোধ যা গিরিশচন্দ্রের মানসভূমিকে আলোড়িত করেছিল, তা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উনিশ শতকী ধর্মীয় কর্মধারার প্রেরণায় উপ্ত ছিল। উনিশ শতকের রাজনৈতিক বিবর্তনে আধুনিক জীবন সচেতন ধর্মীয় সংস্কারের যে আন্দোলন বাঙালির জরাজীর্ণ কুসংস্কারাবদ্ধ ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, সে প্রবহমানতার এক নিরলস সেবক ছিলেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।

উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থানে বাঙালির জীবনবোধ গতানুগতিকতার পরিবর্তে নব্য আধুনিকতার স্পর্শ পায়। ইংরেজদের উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-কৃষ্টির প্রভাবে বাঙালি গণ্ডিবদ্ধ জীবন প্রণালীর বাইরে এক নবতর চেতনা লাভ করে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সম্যক পরিচয়ে বাংলায় তখন আত্ম-চেতনতার নতুন পর্ব শুরু হয়। মোঘল সাম্রাজ্যের প্রাসাদবন্দি জ্ঞানচর্চা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এসে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। বাঙালি পাশ্চাত্য ভাবধারাকে আত্মস্থ করে ধীরে ধীরে প্রগতিশীলতাকে ধারণ করতে থাকে। ফলে "মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও গতানুগতিক রীতির স্থলে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়।"[২] মুক্তবুদ্ধি চর্চার এ আন্দোলন কলকাতাভিত্তিক শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে তা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়কে ধারণ করে ব্যক্তি প্রতিভার স্ফূরণে বাঙালি জাতিসত্তা আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবিত হয়। মানবতাবাদে, সমাজ সংস্কারে, শিক্ষার বিকাশে, সাহিত্য সৃষ্টিতে, জাতীয়তাবোধের অভিব্যক্তিতে, জীবন চেতনার উন্নত বোধে বাংলায় নবজাগরণের অভ্যুদয় ঘটে। "য়্যুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলায় উনিশ শতকের শিল্পার্দশ, জীবনচেতনা ও নীতিবোধের সাদৃশ্য আছে বলেই একে সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে উনিশ শতকী রেনেসাঁস বলা হয়।"[৩] ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অব্যবহিত ঢেউ বাঙালির প্রথামুখীন চিন্তা চেতনার গতিপথ পরিবর্তনে যে স্রোতধারা সৃষ্টি করেছিল তাকে অনেকেই বাংলার রেনেসাঁসের স্বীকৃতি দিতে নারাজ। রেনেসাঁস নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা সমালোচনার অবকাশ রয়েছে। বাংলায় সত্যি সত্যি রেনেসাঁস ঘটেছিল কিনা তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'রেনেসাঁসের ধারায় নবতর চেতনার উন্মেষ' অধ্যায়ে। তবে এ কথা সত্য উনিশ শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য সংস্কৃতির পরিগ্রহণে বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি তথা জীবনযাপনে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। চির অভ্যস্ত

Dhaka University Institutional Repository

নিঃস্তরঙ্গ, শান্ত, সৌম্য, গ্রামীণ জীবনাচরণ বিপরীত স্রোতাভিমুখী ভাঙা গড়ায় বাঙালি উন্নততর সংস্কৃতিকে ধারণ করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। ঔপনিবেশিক যাঁতাকলে থেকেও বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে নতুনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালি উত্থান পর্বের এ সময়কে ড. সফিউদ্দিন আহমেদ ইকারোস আর প্রমিথিউসের আলোর মিছিলে উজ্জ্বল এক চিৎ-প্রকর্ষের যুগ বলেছেন।[৪] আর এ যুগের স্থপতি হলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি আত্ম-জিজ্ঞাসার তাগিদে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। "বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে রামমোহনই সেই মানুষ যিনি পুরানো বিশ্বাসের জড়তা থেকে জীবনকে উদ্ধার করার তাগিদ মর্মে মর্মে অনুভব করে বিদ্যা ও জ্ঞানের কর্ষণ দিয়ে জীবন ও সমাজের সংরচনা কর্মে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন।"[৫] আর এ পরিভ্রমণের প্রথম যাত্রা শুরু হয় ১৮০১ সালে ইংরেজদের এদেশে ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এদেশীয় মানুষকে শিক্ষিত করার কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে ইংরেজদের ছিল না। তাঁদের নিজস্ব কর্মচারীকে এদেশীয় ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যেই এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেছেন। সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ীকরণ এবং ইংরেজ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ছিল এ ব্যবস্থা প্রণয়নের মূল লক্ষ্য। শিক্ষা কার্যক্রমের প্রথমাবস্থায় ইউলিয়াম কেরী, রামরামবসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো পণ্ডিতব্যক্তিবর্গকে তাঁরা নিয়োগ দিয়েছিলেন। পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনে এ পণ্ডিতব্যক্তিবর্গ নিরলস অধ্যবসায়ে শিক্ষার প্রসারকে তরান্বিত করেন। ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ। প্রথমবস্থায় উদারপন্থী রামমোহন রায় এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৬] নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনিই প্রথম এগিয়ে এসেছেন। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য জ্ঞান, রীতি-নীতি ও চিন্তাধারার সাথে ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। একদিকে শিক্ষার প্রসার, গদ্যের প্রচলন, ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব, খ্রিস্টান প্রাদ্রীর প্রচার, অন্যদিকে সনাতনী ও প্রগতিশীল হিন্দুদের ঘাত-প্রতিঘাত, নগর কেন্দ্রিক জীবনে মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ জটিল ও বিচিত্র ঘটনা প্রবাহে বাঙালির সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা জটিলতর মাত্রিকতায় আত্মসমর্পণ করে। বাংলা অবগুণ্ঠিত গ্রাম্যবধূর আড়ষ্টতা ছেড়ে নবতর চেতনামুখর কর্মোদ্দীপ্ত নগর জীবনে পর্দাপণ করে। ধীরে ধীরে ভাঙ্গতে শুরু করে প্রাচীন অসারতার ভিত। এগিয়ে আসে কিছু নব্য শিক্ষিত উদারপন্থী বাঙালি। কিন্তু আধুনিক যুগের প্রারম্ভে বলা যায় যুগসন্ধিক্ষণের মাহেন্দ্র লগ্নে কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। উদারপন্থীদের সঙ্গে সঙ্গে সেসময় রক্ষণশীলরাও ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। বলা বাহুল্য, সেযুগে প্রগতিশীল উদারমনা ছিলেন হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন আর রক্ষণশীল উগ্রবাদীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। নব্যশিক্ষিত আধুনিক প্রজ্ঞা ও মননের অধিকারী প্রগতিশীলদের গঠনমূলক সমাজ সংস্কারকে তাঁরা সুনজরে দেখেননি। পশ্চাৎপদ ধর্মান্ধ হিন্দুরা ধর্মের দোহাই দিয়ে আধুনিকতা ও মানবতাবাদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই প্রগতিশীলদের সাথে রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থীদের সামাজিক দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য কোনো প্রতিবন্ধকতা উদারপন্থীদের মানসিক ঔদার্যকে দুর্বল করতে পারেনি। তাঁরা পাহাড়সম বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে, মৃত্যুর বজ্রনিনাদকে তুচ্ছ করে মানবতার সেবাতেই মনুষ্যত্বের জয়ধ্বজা উড়িয়েছেন। মানবতার সেবায় রক্ষণশীল কুসংকারাচ্ছন্ন অন্ধত্বের বিরুদ্ধে যারা প্রথম প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন, তাঁরা হলেন ইয়ং বেঙ্গল দল। ইয়ং বেঙ্গল হলো হিন্দু কলেজের ইউরেশিয়ান শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্র-সংগঠন। ডিরোজিও পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক প্রাপ্ত যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত মুক্তচিন্তার মানুষ। তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মুক্তচিন্তা শক্তি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিনিষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

মানবীয়বোধের উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছেন। তাঁরাই প্রথম হিন্দুধর্মের যাথার্থের বিরুদ্ধে সরাসরি বিচারশক্তি সম্পন্ন প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা গঠন করেন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'। পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোকে তাঁরাই প্রথম সমাজ সংস্কারের পক্ষে লড়াই করেন। তাঁরাই প্রথম সমাজ সচেতনতার লক্ষ্যে জাতপাত, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ রোধের অমানবিক দিকটি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। "তবুও তাঁরা সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অভিপ্রেত কিছু ঘটাতে পারেননি। এই ব্যর্থতার পেছনে তাঁদের ইংরেজপ্রীতি দায়ী ছিল। ব্রিটিশদের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা ছিল। আস্থা ছিল ইংরেজি শিক্ষায়। তাঁদের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান পশ্চিম থেকে পাওয়া। এটাই তাঁদেরকে ভারতীয় জনসাধারণ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।"[৭] শুধু যে ইংরেজ প্রীতিই দায়ী ছিল তা নয়, পশ্চাৎপদ হিন্দুরা তাঁদের যুগোপযোগী মনোভঙ্গিকেও মূল্যায়ন করতে পারেননি। সামাজিক বিদ্রোহ হিসেবে তাঁরা প্রকাশ্যে মদ্যপান করতেন, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করতেন ও মুক্ত কণ্ঠে নাস্তিকতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, যা প্রথাবদ্ধ সমাজ সমর্থন করতে পারেননি। তাঁরা বিতর্কিত হয়েছিলেন। অথচ সে সমাজে একজন ব্রাহ্মণ একশর বেশি বিয়ে করতেন, সমাজপতি ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বাঈজী নামে পতিতা রাখতেন। তাঁরা জলসাঘরে মদ্যপানে মত্ত থাকতেন। আবার তাঁরাই ছিলেন সে সমাজ ও ধর্মের হর্তাকর্তা। যারা আত্ম-স্বার্থের হীন কৌশলে সমাজকে শাসন করতেন, তাঁদেরকেই সে সমাজ সম্মান জানাত। আর যাঁরা তীক্ষ্ণ বোধ, শাণিত মেধা ও বিদগ্ধ প্রতিভার আত্ম-অহমবোধে তৎকালীন প্রথাবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থাকে কটাক্ষ করেছিলেন (ইয়ং বেঙ্গল দল) সমাজ তাঁদেরকেই বিচ্যুত করার চেষ্টা করেছিলেন, গঠন করেছিলেন সনাতনী সোসাইটি। যার ফলে অদম্য প্রেরণা নিয়ে সাধারণের হিত সাধনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেও অনেকটাই ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়েছিল তাঁদের সামাজিক আন্দোলন। তাই বলা যায়, "ব্রিটিশ আমলের রাজনৈতিক গতিধারার প্রাথমিক অবস্থায় ব্রিটিশ বনাম বাঙালি নয়, বরং বাঙালির অতি-রক্ষণশীল সমাজ বনাম উগ্র প্রগতিশীলদের বিরোধই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"[৮] তবুও রুগ্ন প্রথাবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে আধুনিকতার যে দ্যুতি তাঁরা ছড়িয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে তারই আলোয় আলোকিত হয়েছিল বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষ।

একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে আধুনিক জীবনযাত্রার আহ্বান, অন্যদিকে সনাতনীদের রক্ষণশীল মনোভাব, অতীতকে আঁকড়ে থাকার প্রবণতা বাঙালি চেতনায় দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সদর্থক ও নঞর্থক উভয় প্রভাবই বাঙালি জীবনে পড়েছিল। অবশ্য বিশ্লেষণের কালিক প্রক্রিয়ায় গভীর পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, সমাজ ও জীবনযাত্রার প্রতিটি পর্যায়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের সমন্বয় ঘটা স্বাভাবিক। ইংরেজ আমল শাসনে, শোষণে, লুণ্ঠনে বাংলাকে যেমন হৃতশ্রী করে দিয়েছে, তেমনি ঘটনা পরম্পরার অভিঘাতে বাঙালির চেতনাকে করেছে শাণিত, বুদ্ধিকে করেছে তীক্ষ্ণ, প্রতিভাকে করেছে দীপ্ত। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শকে অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যে সংযোজিত হয়েছে নতুন মাত্রা। বাংলা সাহিত্যে অন্তঃরঙ্গ ও বহিঃরঙ্গ বিনির্মাণে প্রথাবদ্ধ রীতিকে অস্বীকার করে নব নব কহুতানে মুখরিত হয়েছে। "য়রোপের রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, রেস্টোরেশন এবং আধুনিকতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উনিশ শতকের বাঙালী-জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে বিকশিত হতে আরম্ভ করল।"[৯] রাজা

Dhaka University Institutional Repository

রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যয়, প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ। তাঁদের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যের গতিপথ প্রতিনিয়ত রূপ রূপান্তরের বাঁক পেরিয়ে আধুনিকতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। বাঙালির চেতনা সমৃদ্ধ উনিশ শতকী আন্দোলন ক্রমশ জাতীয়তাবোধে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু সে আধুনিক উন্নতর চেতনাবোধ থেকে বৃহত্তর মুসলিম সমাজ নিজেকে বঞ্চিত করে রাখে। বলা যায়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি জীবনে যখন উত্থান-পতনের ঘটনাপুঞ্জে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল ভোরের প্রত্যাশায়, তখনও বাঙালি জাতির অর্ধাংশ অর্থাৎ মুসলমান হতাশায়, গ্লানিতে তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করে বাঙালি হিন্দু সমাজ যেখানে উন্নত চেতনায় শাশ্বত মানসলোকে উজ্জীবিত হয়ে উঠে, সেখানে চিন্তাধারার বিপরীত ভাববলয়ে আবর্তিত মুসলমানরা তাঁদের নিজস্ব চিন্তালোকে অবলুপ্ত থেকে অনগ্রসর জাতিতে পরিণত হয়। শুধুমাত্র ধর্মগত মৌলিক পার্থক্যের কারণে ভারতের দুই সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাঁদের চিন্তাধারা পরস্পর বিপরীতমুখী স্রোতে প্রবহমান হয়। হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ইংরেজি ভাবাদর্শে একাত্মতা ঘোষণা করে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা, চাকরী, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বলা যায় আর্থিক উন্নতি ও প্রতিপত্তিলাভের অধিকারী হয়। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ে নগর কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। অপরদিকে "মুসলমানদের একদেশদর্শী মনোভাবের দরুণ"[১০] এবং আভিজাত্যের অন্ধমোহে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিমুখ হয়ে পশ্চাৎপদ জীবনকে বেছে নেয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য মুসলমানদের জন্য শুধু রাজনৈতিক, অর্থনেতিক দুর্দশাই বয়ে আনেনি, ধর্মীয় বিপর্যয়ও ডেকে আনে। মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মক্তব মাদ্রাসাগুলো সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিপর্যস্ত এবং প্রায় বিলুপ্ত হয়ে তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হলো পাশ্চাত্য রীতির স্কুল কলেজ। ইংরেজি শিক্ষা হারাম বলে আলেমগণের ফতোয়ার কারণেই হোক কিংবা ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের ধর্মীয় উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অবজ্ঞা লক্ষ্য করেই হোক মুসলিম জনগণ ইংরেজি শিক্ষা পরিহার করে। মুসলমানদের মক্তব, মাদ্রাসাগুলোতে তখনো চিন্তার আধুনিকায়ন হয়নি, তখনো এসব শিক্ষালয়ে আরবি ও ফারসি ভাষার ধর্মশাস্ত্রই ছিল পাঠ্য। ফলে অফিস আদালতে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি প্রবর্তিত হওয়ায় তাঁরা সরকারী চাকরী থেকেও বঞ্চিত হয়। মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা আর হিন্দুদের অগ্রসরতা ভারতবর্ষের দুই জাতির মধ্যে বৈষম্যের জন্ম দেয়। এই বৈষম্যকে আরও প্রকটতর করে ইংরেজরা দুই জাতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। "ইংরেজ শাসকগণ শুরু থেকেই মুসলমানদের প্রতি ছিল উদাসীন এবং তাদেরকে সর্বদা অবিশ্বাস করে চলতেন।"[১১] তাঁদের ধারণা ছিল মুসলমানরা ইংরেজদের হাতে সদ্য ক্ষমতা হারিয়েছে, সুতরাং তাঁরা ইংরেজদের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মানসিকতা পোষণ করবে এবং সুযোগ পেলে তাঁদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করবে। এজন্য ইংরেজরা মুসলমানদের প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখত। ইংরেজদের মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ আর হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ মুসলমানদের মনে ক্ষোভের জন্ম দেয়। মুসলমানরা এসব নানাবিধ কারণে বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

জাগরণ পর্বে অর্ধ শতাব্দী পিছিয়ে পড়ে। মুসলমানরা যখন তাঁদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরে ইংরেজি শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে, তখন বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন মানবীয় চেতনাপুষ্ট, আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে পরিবর্তিত, বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধে পরিপূর্ণ। আর এ গৌরবময় অধ্যায়ের পুরোধা হলেন রাজা রামমোহন রায়, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁরা সংস্কারমুক্ত মন ও অনুসন্ধিৎসা, দার্শনিক সুলভ প্রজ্ঞা ও মানবিক মূল্যবোধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। রামমোহন রায় মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, ডিরোজিও প্রগতির উত্তরণে আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম-বোধের উদ্বোধনে ছাত্রদের মধ্যে সে আদর্শকেই রোপণ করেছেন। আর বিদ্যাসাগর সামাজিক সকল প্রতিবন্ধকতাকে হেয় জ্ঞান করে মানবতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

> “স্বতন্ত্র মানবিক কৌতূহলে উজ্জীবিত ‘আধুনিক’ মূল্যচেতনার সঙ্গে পূর্বাগত জ্ঞানগুণবাহিত ঐতিহ্যের সংঘাত সমন্বয়ে জর্জরিত উজ্জীবন যদি নব জাগরণের মৌল লক্ষ্য হয়, তাহলে রামমোহনের প্রবর্তনা সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক বাঙালির চেতনাকে সেই পথেই চালিত করতে চেয়েছিল; বিদ্যাসাগর তার প্রগতির মাত্রাকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন।”[১২]

বলা যায়, রামমোহনের কাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাল পর্যন্ত সময়টা ছিল নানা উত্থান-পতনে বাঙালির চেতনা আন্দোলিত হবার সময়। এসময়কে কেউ কেউ বাঙালি জীবনের সংস্কার পর্বও বলেছেন। যার মূল আলোচ্যসূচি ছিল মানবীয় মূল্যবোধ, স্বদেশপ্রেম, মুক্তচিন্তার বিকাশ এবং যার প্রাপ্তি ছিল ‘স্বাধীন মনুষ্য বুদ্ধির’ উত্তরণ।

খ. রাজনৈতিক পট পরিবর্তন : ইংরেজ শাসন

শৌর্যবীর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধিময় মুঘল সাম্রাজ্যের চারশ বছরের রাজত্ব দুর্বল হতে শুরু করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমল থেকে। বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুর পর (১৭০৭ সালের ৩ মার্চ)[১৩] থেকে মুঘল সাম্রাজ্যে পতনের করুণ রাগিনী ধ্বনিত হতে থাকে। আওরঙ্গজেব বীর পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। কিন্তু "তার ভিতরে যে গুণটির অভাব ছিল সেটি হল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি। তার ব্যক্তিত্ব নয়, বরং তার গৃহীত নীতিগুলি সাম্রাজ্যের পক্ষে কোনটাই উপযোগী বা উপকারী ছিল না।"[১৪] আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যনীতি সম্পর্কীয় নানা ভুল-ত্রুটি, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত জটিলতা এবং দক্ষ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিচক্ষণ প্রশাসকের অভাব মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। আওরঙ্গজেব উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তারপরও তিনি দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানা বিস্তারে উদ্যোগী হন। এতে তিনি প্রচুর শক্তি, সম্পদ এবং সময় ব্যয় করেন। কিছু কিছু রাজপুত রাজ্যের সঙ্গে আরঙ্গজেবের দ্বন্দ্বের পরিণাম মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মারাঠা বিরোধী নিষ্ফল অভিযান চালিয়েছেন। কিন্তু মারাঠাদের বশ্যতা স্বীকার করাতে তিনি ব্যর্থ হন। ২৫ বছরেরও অধিক সময় ধরে তিনি উত্তর ভারতে অনুপস্থিত ছিলেন। একদিকে মারাঠাদের আনুগত্য স্বীকার করাতে ব্যর্থতা, অন্যদিকে সেনাবাহিনীর সম্মানহানি, সেনাবাহিনীতে যোগ্য সেনাপতির অভাব, সামরিক সংস্কারে উদাসীনতা এবং আওরঙ্গজেবের দীর্ঘদিন অনুপস্থিতি সব মিলিয়ে মুঘল প্রশাসন দুর্বল হয়ে আসে। মুঘলদের সামরিক দুর্বলতার সুযোগেই আঞ্চলিক ও স্থানীয় আধিকারিকেরা কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে অস্বীকার করার স্পর্ধা দেখাতে শুরু করে এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ছোটখাট বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এমনকি দিল্লীর আশেপাশেই সৎনামী, জাট ও শিখদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। যদিও এসব বিদ্রোহের প্রথমাবস্থায় খুব বেশি সংখ্যক মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু ধীরে ধীরে তা শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। আওরঙ্গজেব এরকম নানা সমস্যা অমীমাংসিত রেখে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সংকট চরম আকার ধারণ করে এবং যুবরাজদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে সৃষ্ট উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে সমাপ্ত হয় এবং বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্ বিজয়ী হন। কিন্তু "দুর্ভাগ্যবশতঃ বাহাদুর শাহের স্বল্পকালীন রাজত্বের পরে কতগুলি অযোগ্য, দুর্বল প্রকৃতির ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ রাজাদের দীর্ঘ রাজত্ব ভারতবর্ষে কায়েম হয়েছিল।"[১৫] তাঁরা ভোগবিলাস নিয়ে এতটাই মত্ত ছিলেন যে, সাম্রাজ্যের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক কোনো ভাবনাই তাঁদের মনে স্থান পায়নি। এছাড়া মুঘল সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, নিজাম-উল্-মূল্ক্, আবদুস সামাদ খান, সফদর জং, জাকারিয়া খান, সাদাৎ খান, মুর্শিদকুলি খান এর মতো সুযোগ্য ক্ষমতাবান রাজণ্যবর্গরাও মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্দিনে উদাসীন থেকেছেন। তাঁরা সাম্রাজ্যে নেতৃত্ব দেয়ার বদলে নিজেদের ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন আসে। এ পরিবর্তন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

> "কেন্দ্রীয় শক্তি প্রাদেশিক সরকারগুলোর উপর ক্রমশঃই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাবে শুরু হয় আন্তঃপ্রদেশ দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রতিযোগিতা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক সরকারের অভ্যন্তরেও শুরু হয় ক্ষমতার কোন্দল। এ পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি আগের মত নির্লিপ্ত থাকতে পারেনি। তাদের মধ্যেও জাগে রাজনৈতিক অভিলাষ; যার পরিণতি পলাশী ও পরিশেষে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন।"[১৬]

অথচ শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষ্যেই ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসেছিল। ইংরেজ বণিকদের একটি ব্যবসায়ী সংগঠন ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ প্রদত্ত সনদের মাধ্যমে সৃষ্ট কোম্পানির নাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।[১৭] ১৫৯৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মাত্র আশিজন অংশীদার নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। পরের বছর ২৩ সেপ্টেম্বর ১৬০০ সালে রাণী এলিজাবেথ ভারত ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইংরেজ জাতির পক্ষে একচেটিয়া বাণিজ্য করার জন্য ১৫ বছরের একটি নবায়নযোগ্য চার্টার বা বাণিজ্য সনদ দান করেন। চার্টারে কোম্পানীর নাম ছিল The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies.[১৮] শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য যাত্রা। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের একটি বাণিজ্য জাহাজ সুরাটে পৌঁছায় কিন্তু পণ্য আদান প্রদান করতে পারেনি। পর্তুগীজরা তাঁদেরকে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। সে বছরই ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংল্যান্ডের প্রথম রাজা জেমস-এর সুপারিশ পত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে মুঘল প্রশাসন থেকে কোম্পানি সুরাটে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। এরপর পর্তুগীজকে পাল্টা শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা হয়।[১৯] ভারতে বাণিজ্য অধিকার লাভ করার পর ধনসম্পদে পরিপূর্ণ, অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত উর্বরভূমি সোনার বাংলার প্রতি তাদের শ্যেন দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার বিষয়ে ইংরেজরা তেমন সুবিধা লাভ করতে পারিনি। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে টমাস রো সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি রাজার পক্ষ থেকে সম্রাটকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারে সম্রাটকে সন্তুষ্ট করেন। টমাস রো এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট কোম্পানিকে সুবিধাজনক শর্তে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন।[২০] কিন্তু বাংলার বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে সম্রাট কর্তৃক অনুমতি বিশেষ কার্যকরী হয়নি। ১৬৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দেই বাংলাদেশে যথার্থভাবে ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। ১৬৩৩ সালে মহানদী বদ্বীপের হরিহরপুরে একটি ফ্যাক্টরি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। আর এ বাণিজ্যিক প্রসারের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছিল পলাশির পটভূমির ভিত্তি প্রস্তর–

"বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা মনে করা ভুল যে পলাশীর বিপর্যয় একটি মাত্র বিশ্বাসঘাতকতার ফল। যখন হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে (১৬৩৩ খৃ:) তখন হইতেই রচিত হইতে থাকে পলাশীর পটভূমি।"[২১]

Dhaka University Institutional Repository

১৬৫১ সালে ইংরেজরা হুগলীতে কুঠী স্থাপন করেন। এ কুঠি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলায় ব্যবসা প্রসারে ইংরেজরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে তাঁরা বাণিজ্য স্বার্থ ও রাজনৈতিক প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি করতে থাকেন। হুগলীতে কুঠি স্থাপন "বাংলায় ইংরেজ ও ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মাইল স্টোন।"[২২] ১৬৫১ সালেই বাংলার সুবাদার শাহজাদা সুজা বাৎসরিক মাত্র ৩০০০ টাকা রাজস্ব প্রদানের শর্তে ইংরেজদেরকে এদেশে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার দেন। অবাধ বাণিজ্য সুবিধায় তাঁদের ব্যবসা দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। তাঁরা নতুন নতুন কুঠি স্থাপন করতে থাকেন– কাসিম বাজার (১৬৫৮ খ্রি.), পাটনা (১৬৫৮ খ্রি.), ঢাকা (১৬৬৮ খ্রি.), রাজমহল ও মালদহ। ১৬৮০ সালের মধ্যে সমগ্র দেশে কোম্পানীর বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।[২৩] বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ইংরেজরা আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেন। তাঁদের দৌরাত্ম্যে বাংলার জনগণ ও বণিকরা নিজ দেশেই শোষিত হতে থাকে। অপরদিকে, কোম্পানির অভিযোগ ছিল সরকারী কর্মচারী কোম্পানির কর্মচারীদের অযথা হয়রানি করে এবং উৎপীড়নের মাধ্যমে উৎকোচ দিতে বাধ্য করে। প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজদের সাহস ও স্পর্ধা এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, যারা "১৬৬১ সালে একটি ক্ষুদ্র নৌকা আটক করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, ১৬৮৫ সালে তারাই মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তাদের জাহাজ আটক করে আর বন্দর জ্বালিয়ে দেয়।"[২৪]

ফলে ১৬৮৬ সালে ইঙ্গ মুঘল সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৬৮৯ সাল পর্যন্ত জলে স্থলে এই যুদ্ধ চলে। ১৬৯০ সালে কোম্পানি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি করে। সেই চুক্তি অনুসারে কোম্পানি সারাদেশে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা রাজস্বের বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। ১৬৯৮ সালে বাংলার নতুন সুবাদার আজিম-উস-মানকে মাত্র ষোল হাজার টাকা উপঢৌকন প্রদান করে তার বিনিময়ে ইংরেজরা বাৎসরিক ১২০০০ টাকা খাজনা দেয়ার লক্ষ্যে সুতানটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারি লাভ করে। ভারতবর্ষে বিদেশীদের বাণিজ্য স্থাপনকে মুঘল সম্রাট কখনোই সার্বভৌমত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ বা হুমকি মনে করেননি। কিন্তু কুটকৌশলী এবং সাম্রাজ্যলোভী ব্রিটিশরা প্রথম থেকেই ক্ষমতা দখলের দুরভিসন্ধি আঁটতে থাকে। সুতানটি, কলকাতা, গোবিন্দপুরে জমিদারি পত্তন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ। সে লক্ষ্যে তাঁরা ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ থেকে পৃথকভাবে বাংলার ইংরেজ বাণিজ্যকুঠিগুলোকে একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিলদের অধীনে স্থাপন করেন এবং ইংল্যান্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় ইউলিয়ামের নামানুসারে কলকাতায় ফোর্ট ইউলিয়াম নামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৭১৭ সালে ফররুখ শিয়া[২৫] কে কোম্পানি প্রচুর পুরস্কার দান করে, সেইসঙ্গে হ্যামিলটনের চিকিৎসায় সম্রাটের দূরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হলে তিনি ইংরেজদের উপর সন্তুষ্ট হন। বিনিময়ে ফররুখ শিয়ার ইংরেজদের সব অযৌক্তিক দাবি মেনে নিয়ে ইতিহাস খ্যাত রাজকীয় ফরমান প্রদান করেন। এ সনদের মাধ্যমে বিশেষ করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মুঘল সুবায় কোম্পানি শুল্কমুক্ত একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পায়। এটি ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক বিশেষ অর্জন। এর ফলে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির শুধু বাণিজ্যিক প্রসারই নয় বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। "১৭১৭ সালের ফরমান কোম্পানির ম্যাগনাকার্টা হিসেবে পরিচিত।"[২৬] যার মধ্য দিয়ে তেজোদীপ্ত গৌরবময় মুঘল সাম্রাজ্যের পরাক্রমশালী প্রতাপ

Dhaka University Institutional Repository

অনেকাংশেই বিলীন হয়ে যায় এবং ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বও দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত বাংলার শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রের শাসনব্যবস্থার মতো দুর্বল ছিল না। ১৭১৭ সালে ফররুখ শিয়ার কর্তৃক ইংরেজ বণিকদের দেয়া বাণিজ্য সুবিধাগুলো তাঁরা বঙ্গদেশে কার্যকর করতে পারেনি। সে সময় ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে "দীউয়ান মুর্শিদকুলী খান সুবা বাংলার প্রকৃত শায়ত্তশাসকে পরিণত হন।"[২৭] ফলে ফররুখ শিয়া কর্তৃক প্রণীত ফরমান বাংলায় কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি। তিনি কৌশলে ইংরেজদের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলেন। আলীবর্দি খানও এ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি ইংরেজ বাণিজ্য নীতিকে সুকৌশলে কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন এবং বাংলার নবাবকে মোটা অঙ্কের রাজস্ব দিতে বাধ্য করেছিলেন। ১৭৫৬ সালে আলীবর্দী খানের মুত্যর পর তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা বাংলার মসনদে বসেন। মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর যে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল, সে ষড়যন্ত্রের শিকার হন সিরাজউদ্দৌল্লা। মসনদের উত্তরাধিকার নিয়ে শওকত জং (পূর্ণিয়ার ফৌজদার) এবং ঘসেটি বেগম (আলীবর্দির কন্যা) দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। এমনকি রাজদরবারের গণ্যমান্য সভাসদরা পর্যন্ত অল্প বয়সী সিরাজের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও জেদী স্বভাবকে সুনজরে দেখেননি। কারণ তরুণ স্বাধীন নবাব দুরন্ত উদ্যমে নতুন করে ক্ষমতার বিন্যাস ঘটাতে শুরু করেছিলেন। এতে তাঁরা তাঁদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতায় সংকট অনুভব করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কারো কারো মনে মসনদ লাভের গোপন আকাঙ্ক্ষাও জাগে। ফলে রাজ-দরবারে শুরু হয় ঘৃণ্য চক্রান্ত ও দলাদলী। শক্তিশালী জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ইংরেজরা বুঝতে পারেন বাংলার শাসন ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে গেছে।[২৮] এ সুযোগে সুকৌশলী, হটকারী, উদ্ধত ইংরেজ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেয় এবং নবাবকে তাঁর প্রাপ্য রাজস্ব দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এছাড়া কলকাতার দুর্গকে আরও সুরক্ষিত করা, কলকাতার চারপাশে পরিখা নির্মাণ করা, নবাবের রাজ্য থেকে পলায়নকারী অনেক অবাঞ্চিত ব্যক্তিদের আশ্রয় প্রদান করা এসব কারণে নবাব ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে বদ্ধ পরিকর হন। কিন্তু নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তখন দালিলিক চুক্তিতে চূড়ান্ত। জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, ইয়ার লুৎফ খান, খাদিম হোসেন, উমিচাঁদ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য প্রধান ব্যাক্তিবর্গ শেঠ ভবনে ষড়যন্ত্রে বসেন। সভায় সিরাজউদ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করে মীর জাফরকে নতুন নবাব হিসেবে মসনদে বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন মীর জাফর ও রায়দুর্লভ এর নিষ্ক্রিয়তায় পলাশির প্রান্তরে যুদ্ধ নামক প্রহসনের কারণে লর্ড ক্লাইভের কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় ঘটে। এ পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার ইতিহাসের স্বাধীন সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর মীরজাফর বাংলার মসনদে বসেন কিন্তু সকল ক্ষমতার সর্বময় কর্তা ইংরেজই থেকে যায়। বাংলার নবাব ইংরেজদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। নবাবের হাতে থাকে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর ইংরেজ অধিকার করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা। ইংরেজদের শোষণ নীতির ফলে বাংলার কোষাগার শূন্য হয়ে পড়ে আর তাঁদের শাসনে বঞ্চনায় বাংলার জনগণের জীবনে নেমে আসে চরম দুঃখ দুর্দশা। ১৭৬৩ সালে মীর জাফরের রাজত্বে "দেশের সম্পদ লুণ্ঠনে কোম্পানীর কর্মচারী ও গোমস্তরা এমন পাশবিকতা প্রদর্শন করে, যেখানেই অর্থের আভাস সেখানেই শোষণ যন্ত্রের স্ক্রু এমন শক্তভাবে আঁটে, সাধারণ লোক থেকে আরম্ভ করে নবাব পর্যন্ত সবাইকে সেলামীর নামে এমন অত্যাচার উৎপীড়ন করে যে এদের অভাবনীয় বর্বরতা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।"[২৯] ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে স্বাধীনতাকামী শেষ নবাব মীর

কাশিমের পরাজয় এবং ১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেউয়ানী লাভ কোম্পানির বণিকবৃত্তির ছত্রছায়ায় ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভুশক্তির অভ্যুদয় ঘটে।

> "সপ্তাদশ শতাব্দীর মধ্য-নাগাদ ভাগ্যান্বেষী কতিপয় দরিদ্র ইংরেজ এদেশে এসেছিল বাণিজ্য ব্যপদেশে, – তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল– বিপুল ধনসম্পদ ও নৈসর্গিক ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ বাংলায় এসে দু'পয়সা কামাই করে 'গরিবি' হটানো। কিন্তু মাত্র এক শতকের ব্যবধানে এদেশের রাজন্যবর্গের একদা করুণাপ্রার্থী বণিকহস্ত শেষ পর্যন্ত প্রতাপশালী রাজদণ্ড ধারণের অধিকারী হয়েছিল।"[৩০]

আর এরই মধ্য দিয়ে বাংলায় রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার পট পরিবর্তন ঘটে। শুরু হয় ইংরেজ শাসন।[৩১] তারপর ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজদের দখলে আসে। শেষত ১৮০৩ খ্রীঃ বৃটিশ সেনাবাহিনী দিল্লী অধিকার করে এবং অহংকারী মুঘল সম্রাট এক বিদেশী শক্তির অনুগ্রহে সামান্য এক ভাতা ভোগীতে পরিণত হন।

গ. শিক্ষায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি

উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতি ও মিশনারীদের শিক্ষা সম্প্রসারণ মনোভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়। এর আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলায় যে শিক্ষা কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল তা একান্তই ভারতীয় নিজস্ব ভাব ও আঙ্গিকের রূপায়ণ। ভারতীয় প্রাথমিক জ্ঞানচর্চা ছিল মুখে মুখে এবং গুরুশিষ্য পরম্পরায়। সেসময় 'উপনয়ন'[৩২]এর পর একজন শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষা শুরু হত। তক্ষশিলা, নালন্দা, সোমপুর, ময়নামতি, ভাসুবিহারের মতো বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে বা সংঘারামে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, কৃষিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। পরবর্তী সময়ে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলায় পাঠশালা, মক্তব, টোল-চতুস্পাঠী, মাদ্রাসা পদ্ধতিতে শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিব্যাপ্তি ধর্মতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ইউরোপীয় মিশনারীরা প্রথম এদেশে শিক্ষা বিস্তারে প্রথম উদ্যেগী হন। চচুঁড়ায় প্রাদী রবার্ট মে 'বেল পদ্ধতিতে'[৩৩] নিজ বাটীতে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়তে থাকলে তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এভাবে বর্ধমানে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট এবং শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে কলকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে জগমোহন বসু একটি এবং মধ্য কলকাতায় ড্রামন্ত সাহেব ধর্মতলা একাডেমি নামে আর একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন।[৩৪] প্রসিদ্ধ শিক্ষক ডিরোজিও এই 'ধর্মতলার' ছাত্র ছিলেন। ১৮০০ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর মিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁদের লক্ষ্য ছিল দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে স্বদেশী ও বিদেশী উভয় ভাব ও ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান। একই বছর অর্থাৎ ১৮০০ সালের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে ইংরেজদের বেশ কিছু উদ্দেশ্য ছিল– কোম্পানির কর্মচারীরা ছিল নিতান্তই অর্ধশিক্ষিতের মতো। তাঁদের যেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না, তেমনি ছিল না মানবিকতা ও উদার নৈতিকবোধ। ফলে লাভ-লোভ-লালসা এই তিনটি ল'কারান্ত রিপুর প্রবল আকর্ষণ ছাড়া এ সমস্ত 'বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো' বিট্রন তরুণদের মনুষ্য বৃত্তির একান্তই অভাব ছিল।[৩৫] এসব কর্মচারীদের নিয়ম শৃঙ্খলার আওতাধীন করা এবং কাজে দক্ষ করে তোলাই ছিল লর্ড কর্ণওয়ালিশের মূল লক্ষ্য। শুধু ব্যবসায় প্রভূত সাফল্য নয়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতের ভাগ্য বিধাতা রূপে গড়ে তোলাই ছিল কোম্পানির অভিপ্রায়। এ সময় ১৭৯৮ সালের এপ্রিল মাসে গর্ভনর জেনারেল হয়ে বাংলায় আসেন লর্ড ওয়েলিসলি। তাঁর চিন্তায় বহুদিন ধরেই সিভিলিয়ানদের জন্য একটি ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। সেই সঙ্গে যোগ হলো গিলক্রাইস্টের তত্ত্বাবধানে শিক্ষানবীশ সিভিলিয়ানদের পর্যবেক্ষক জি. এইচ. বার্লো, জে. এইচ হ্যারিংটন, উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক, নীল বেনজামিন এডমনস্টোন এবং ব্ল্যাকিয়ার এর প্রতিবেদন। "কিন্তু প্রস্তাবিত বিদ্যায়তনকে শুধু ভাষা শিক্ষার ট্রেনিং কলেজে পরিণত না করে ইটনে-শিক্ষিত অভিজাতবংশীয় মারকুইন ওয়েলেসলি (১৭৬০-১৮৪২) এমন একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন যা গিলক্রাইস্টের সেমিনারের মতো শুধু দুটি-চারটি দেশীয় ভাষা শেখাবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা হবে য়ুরোপের বড়ো বড়ো কলেজের মতো একটি সর্বাবয়বসম্পন্ন

মহাবিদ্যালয়, যার প্রধান উদ্দেশ্য হবে ভারতে প্রেরিত (কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি) অপ্রাপ্তবয়স্ক জুনিয়ার সিভিলিয়ানদের য়ুরোপীয় কলেজের মতো নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলা। তার সঙ্গে চলবে ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় অভিজ্ঞতা সংগ্রহ।"[৩৬] ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের যদিও বাঙালিকে শিক্ষিত করার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না তবুও বাঙালির চিত্তকে আধুনিক শিক্ষার দিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এ কলেজের অবদান চির স্মরণীয়। এ কলেজের কর্মধারাকে আশ্রয় করেই প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব ও জ্ঞানের সম্মিলন ঘটে। পাশ্চাত্য ভাব ও আঙ্গিক আত্মস্থ করে শুরু হয় বাংলা গদ্যের নব যাত্রা। জুনিয়র অফিসারদের এ দেশীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য ১৮০১ সালের ৪ মে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয়। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পান উইলিয়াম কেরী। তাঁর তত্ত্বাবধানে এ কলেজে একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠে। উইলিয়াম কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পাণ্ডিত্য ও মনীষায় বাংলা গদ্যের প্রাথমিক রূপ দাঁড়ায়। পাঠ্যপুস্তকের অভাব পূরণের লক্ষ্যে উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন' (১৮০১), A Grammar of the Bengali Language (১৮০১), ইতিহাস মালা (১৮১২), রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলী (১৮০৮), প্রবোধ-ইন্দ্রকা (১৮৩৩), গোলকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০২), রামকিশোর তর্কচূড়ামনির বঙ্গানুবাদ 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), কালিণীচরণ মিত্রের 'ঈশপের গল্পাবলী' (১৮০৩), চণ্ডীচরণ মুনশীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়শ্য চরিত্রম' (১৮০৫) প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্রাথমিক গদ্যের শরীর নির্মাণে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। রাজা রামমোহন রায় বাংলা গদ্যকে আধুনিকীকরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান এবং বিদ্যাসাগর এ গদ্যকে পরিশীলিত সাহিত্যিক গদ্যে রূপ দেন। এরপর ধীরে ধীরে বিচিত্র পথ পরিক্রমায় বাংলা গদ্য পরিণত রূপ পায়–

> "কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক রামরাম বসু, মুত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ নতুন বাঙালী গদ্য লেখক গোষ্ঠীর পরে বাংলা গদ্যের সত্যিকার পথিকৃৎ ছিলেন রামমোহন রায়। বাংলা গদ্যের আধুনিকীকরণে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় তিনি বিবিধ সামাজিক সমস্যা নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার ও সেকেলে রীতি নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিকাশমান বাংলা গদ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অবধি অনুসৃত হয়েছিল। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী বিশেষ করে অক্ষয় কুমার দত্ত ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পঞ্চাশের দশকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে (তাঁর শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ধর্ম সংস্কার সম্বন্ধীয় রচনাবলী ও বাদানুবাদ এবং অন্যান্য রচনা মারফত) বাংলা গদ্য তার ভাবগম্ভীর সমৃদ্ধ রূপ পায়। এই ধারাটিকে পূর্ণ পরিণত ও আধুনিক চিন্তাচিহ্নিত রূপ দান করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর অজস্র উপন্যাস ও প্রবন্ধ-রচনার মধ্য দিয়ে –উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে।"[৩৭]

পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে বাঙালি চিত্ত চিরকালীন আড়ষ্টতা ভেঙ্গে নব আলোর আবাহনে জাগতে শুরু করে। এ জাগরণের পেছনে যে সকল বাঙালি মনীষী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁকে আধুনিক বাংলার প্রথম চিন্তানায়ক বলা হয়। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ফলে তাঁর চিন্তা চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছিল প্রথাবিরোধী ও অগতানুগতিক। তিনি তাঁর উদার, যুক্তিনিষ্ঠ মানসালোকে এক মানবিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষে তিনি সমমনা কিছু মানুষের সমন্বয়ে ১৮১৫ সালে গড়ে তুললেন ‘আত্মীয় সভা’। এ সভার সভ্যরা ছিলেন তৎকালীন সমাজের ‘অভিজাত ও নয়া মধ্যবিত্ত উদারতাবাদী’[৩৮] মানুষ। বেদান্তানুযায়ী একব্রহ্মের উপাসনা এবং পৌত্তলিকতা থেকে দূরে থাকা ছাড়াও সময়োপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও গঠনমূলক তর্কে বিতর্কে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিই ছিল এ সভার উদ্দেশ্য। রাজা রামমোহন রায় তাঁর আধুনিক জ্ঞান, চিন্তা, দর্শন ও জীবনবোধে বাঙালি জাতিকে সকল প্রকার অন্ধত্ব, দীনতা এবং সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে প্রগতির উত্তরণে একাত্ম করতে চেয়েছেন। আর এজন্য তাঁর কাম্য ছিল “প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা এবং কালজীর্ণ জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে কালোপযোগী জ্ঞানচর্চা”[৩৯]। এ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার রদবদলে কোম্পানি উদার ছিল না। প্রতীচ্য প্রভাবিত জীবন চেতনার আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হওয়ার অনুরোধ নিয়ে তিনি স্যার এডোয়ার্ড হাইড ইস্ট এর সাথে দেখা করেন। এ কাজ ছিল অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। তিনি দেশের বিত্তবানদের সাহায্য চাইলেন। কিন্তু দেশের বিত্তবান শ্রেণির অনেকেই রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রয়াসকে তাঁদের স্বার্থের প্রতিকূল কর্মকাণ্ড মনে করতেন। সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তিবর্গই যখন রামমোহন যুক্ত থাকলে একাজে তাঁদের অপরগতা জানালেন, তখন তিনি সানন্দে হিন্দু কলেজ সংস্থাপন কমিটি থেকে সভ্যপদ ত্যাগ করেন। মহাপুরুষোচিত উদার কণ্ঠে তিনি বলেন– ““আমি কমিটিতে থাকিলে যদি কলেজের লেশমাত্রও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমি সে সম্মানের প্রয়াসী নই।””[৪০] পরিশেষে বিত্তবানদের অর্থ সাহায্যে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হল।

আধুনিক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে তিনি ১৮২২ সালে ‘অ্যাংলো ইন্ডিয়ন স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আজীবন সাধনা ছিল বাঙালিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাঁদের জীবন হতে ধর্মীয় অন্ধত্ব, সামাজিক কুসংস্কার এবং আচার সর্বস্ব মোহত্ব বিদূরিত করে শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত চেতনার অধিকারী করা। কিন্তু যখন দেখলেন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ না করে লর্ড আমহার্স্ট সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই মান্ধাতার আমলের পশ্চাৎপদ জ্ঞানবিদ্যার চর্বিতচর্বণকেই সমর্থন করছেন, তখন তিনি মর্মাহত হলেন এবং তাঁর মাতৃভূমিকে আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার আয়োজনের বিরুদ্ধে গভর্নর জেনারেলের কাছে কঠোর প্রতিবাদ জানান। ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি দেশবাসীর কল্যাণার্থে উদারপন্থী স্বাধীনচিন্তাভিমুখী মানবীয় মূল্যবোধে শাশ্বত আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন।[৪১] প্রাচীন মধ্যযুগের আড়ষ্টতা থেকে বাঙালিকে মুক্ত করতে হলে আধুনিক শিক্ষার বিকল্প নেই। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইংরেজদের সঙ্গে টিকে থাকতে হলে প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্তে

আনতে হবে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে না জানলে, আধুনিক সংস্কারমুক্ত চিন্তা-চেতনায় অবগাহন করতে না পারলে বাঙালির মুক্তি নেই। এই গভীরবোধ তাঁর সমসাময়িক যুগে এমনকি 'আত্মীয় সভা'র কারো মনেও এত তীব্রভাবে জেগে উঠেনি। শিক্ষা বিস্তারে রাজা রামমোহন রায় এক আপোষহীন চেতনার নাম। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে মনি বাগচির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরা বলতে পারি,

> "রামমোহন কেবল একটি স্কুল স্থাপন, হেয়ার সাহেব ও ডাফ সাহেবকে নানা প্রকার সাহায্য করে ও ইউসটেস কেরিকে স্কুল স্থাপনের জন্য জমি দিয়ে বা ভারত সরকারের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে দুই চারটি মেমোরান্ডা দাখিল করেই আপন কর্তব্য শেষ করেননি। তাঁর চিন্তা এ বিষয়ে এত জাগ্রত ছিল যে, এটাই তাঁর ধ্যান- ধারণা হয়ে উঠেছিল বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। রামমোহনের নিকট শিক্ষা বিলাসের বস্তু ছিল না। রামমোহন জানতেন যে, অধঃপতিত জাতিকে পুনরায় আপন পর্যায়ে স্থাপন করতে গেলে প্রতীচ্যে শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। ইংরেজদের সঙ্গে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে হলে তাঁদের ন্যায় প্রতীচ্যের বিজ্ঞানকে আয়ত্তে আনতে হবে। শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের যে অনুরাগ, তাঁর মূলে ছিল জাতির জীবন রক্ষা –এই তাগিদ।"[৪২]

শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অগ্রসরতাও ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। বাংলার নারী শিক্ষাহীনতায় পশ্চাৎপদ, সহস্রাব্দের জরাজীর্ণতায় আবদ্ধ। তিনি উপলব্ধি করলেন শিক্ষা ব্যতীত নারীর উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই একটি উন্নত জাতি গঠনে নারী শিক্ষাকেও তিনি সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। ১৮১৮-১৯ খ্রি. তাঁর লেখা 'প্রবর্তক নিবর্তন সম্বাদ' পুস্তকে ছোট একটি লাইনে নারী শিক্ষার কথা ব্যক্ত করেন।

মিশনারীরা বাংলায় শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন চুঁচুড়ার পাদ্রী রবার্ট মে, বর্ধমানের ক্যাপ্টেন জেমস্ স্টুয়ার্ট, শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড। বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগে এ মহান ব্যক্তিবর্গরাই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। এরপর ১৮১৭ সালে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তাঁরা আরও দুটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' ও 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি'। 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' এর উদ্দেশ্য ছিল পাঠ্য পুস্তক রচনা ও তার প্রচার আর 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি'র উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় শিক্ষার উন্নতি ও আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে শ্রীরামপুরে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপিত হয়।

১৮১৭ সালে বাংলায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ১৮২৬ সালে এ কলেজের শিক্ষক হয়ে আসেন ডিরোজিও। সংস্কারমুক্ত মানসিকতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তিনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তি এবং স্বাধীন ভাবনার অধিকারী ডিরোজিও বাংলার শিক্ষা পদ্ধতিতে আনেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তিনি ছাত্রদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেন তীব্র জ্ঞানানুসন্ধিৎসা। তাঁর শিক্ষার পদ্ধতি ছিল অভিনব। তিনি যেকোনো বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে ছাত্রদের স্বাধীন

চিন্তার সুযোগ দিতেন এবং এর ভেতর থেকে মূল বৈজ্ঞানিক যুক্তির পথটির সন্ধান দিয়ে তাঁদের সাহায্য করতেন। তাঁর মতে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় আত্মশক্তির উদ্বোধনেই মুক্তি নিহিত। তিনি স্বাধীন মনোবৃত্তি ও আন্তর্জাতিক চিন্তা চেতনার সমন্বয়ে গঠিত দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ববোধ ছাত্রদের মধ্যে জাগাতে চেয়েছেন। তিনি মাত্র চার বছর শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর এই স্বল্পকালীন অধ্যাপনা জীবনে পাঠ্যবইয়ের বাইরে মুক্তচিন্তার যে রসদ যুগিয়েছিলেন, তা-ই পরবর্তীকালে নবজাগরণের জন্ম দিয়েছিল। বলা যায়, "রামমোহন রায় সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালির মানসলোকের বরফপিণ্ডে নবজাগরণের আলোক সম্পাত করলেও তিনি সে বরফপিণ্ডকে গলিয়ে তেমন কোনো প্রবাহের প্লাবন সৃষ্টি করতে পারেননি। এ অর্থে ডিরোজিও প্রথম বাঙালির চিত্তালোকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আধুনিক অর্থে দেশপ্রেম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনে বাংলার রেনেসাঁর প্রবর্তক। এখানেই তিনি যথার্থভাবে আধুনিকতার অগ্রদূত ও যুগ প্রবর্তক।"[৪৩] ডিরোজিও দ্বারা অনুপ্রাণিত ছাত্ররা জ্ঞান বিজ্ঞানের গভীর অনুশীলনে হয়ে উঠে মুক্তবুদ্ধির ধারক। মিথ্যা, জড়ত্ব, অন্তঃসারশূন্য প্রথাবদ্ধ সামাজিক অচলায়তনের বেড়ি তাঁরা ভাঙতে চেয়েছেন। তাঁরা প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্মের যাথার্থ্যের প্রশ্ন তুলেন এবং নাস্তিকতার ঘোষণা দেন। সংকীর্ণতার আবরণ ছিন্ন করে তাঁরাই প্রথম ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সমাজ সংস্কারের পক্ষে আন্দোলন সৃষ্টি করেন। হিন্দু কলেজের প্রগতিপন্থী ছাত্ররা (যারা 'ইয়ং বেঙ্গল নামে' পরিচিত ছিলেন) শিক্ষাকে আধুনিকমুখী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'। তাঁরাই **১৮৩১** সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে বাংলায় আধুনিক জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করেন। 'বিজ্ঞান সেবধি' (১৮৩২) পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রবন্ধে তাঁরা বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে স্বাগত জানান।

ডিরোজিও তাঁর অসামান্য প্রতিভার দ্যুতিতে আত্মজিজ্ঞাসার উদ্বোধনে সে সময় বাংলায় শিক্ষা বিপ্লব ঘটিয়েছেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ সত্যনিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী শিক্ষাকে বাস্তবনির্ভর জীবনমুখীচেতনায় পরিগ্রহ করে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় সমাজ বিপ্লবকে তরান্বিত করেছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোলাপ ঘোষ, রামতনু লাহিড়ি, প্যারীচাদ মিত্র, গোবিন্দ্রচন্দ্র বসাক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রাধানাথ সিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, দিগম্বর মিত্র প্রমুখ ছিলেন ডিরোজিওর সাক্ষাৎ শিষ্য আর কিশোরীচাঁদ মিত্র, মধুসূদন দত্ত, রাজ নারায়ন বসু, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ছিলেন তাঁর ভাবশিষ্য। মেধা মননে স্বীয় প্রতিভায় পরবর্তী সময়ে জাতীয় জীবনে এরাই রেখে গেছেন অনন্য অবদান।[৪৪] ডিরোজিও শুধু শ্রেণি কক্ষেই নয়, কখনো কখনো নিজ বাস গৃহেও ছাত্রদের নিয়ে বসতেন। তাঁদের অন্তরজগৎ ও অর্ন্তদৃষ্টিকে বহির্মুখী করে স্বাধীন চিন্তা স্পৃহা জাগাতে চেয়েছেন। দেশ ও জাতি গঠনে ডিরোজিওর এ অবদান সম্পর্কে শ্রী ভূদেব চৌধুরী বলেছেন-

> "ডিরোজিও কেবল হিন্দু কলেজের একজন নিষ্ঠা ও প্রতিভাবান অধ্যাপকই ছিলেন না। তিন ছিলেন সেদিনকার উদীয়মান বাংলার অতি-দীপ্ত একটি অগ্নিশিখা। সমকালীন বাংলার সমাজ বিপ্লবের ইতিহাসে তিনি রামমোহন বিদাসাগরেরই সগোত্র; আধুনিক বাংলা কাব্যের সৃজনলোকে মধুসূদনের পূর্বসরী এবং পথ প্রদর্শক।"[৪৫]

১৮৩০ এর দশকে জাতীয়তাবোধের অভিব্যক্তিতে, সমাজ সচেতনতায়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে, মানবিক বোধ সৃষ্টিতে আধুনিক শিক্ষার প্রসার যেন সে সময়কার প্রগতিশীল গণ্যমান্য মানুষের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। রাধাকান্তদেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আধুনিক বাংলা শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসেন। ১৮৪০ এর দশকে বাঙালির শিক্ষাচিন্তার অগ্রদূত হিসেবে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। শিক্ষা প্রসার ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ইয়ংবেঙ্গলের সীমাবদ্ধ কর্মপ্রয়াসকে তিনি সামাজিক ব্যাপ্তি দেন। ১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাথে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। 'বেতাল পঞ্চ বিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস', প্রাথমিক শিক্ষার জন্য রচনা করেন 'বর্ণ পরিচয়' ও 'বোধদয়' প্রভৃতি গ্রন্থ। গদ্য ছন্দের সুমধুর লালিত্য তাঁর রচনাতেই প্রথম ধরা পড়ে। শিক্ষা প্রসারে তিনি ছিলেন এক আপোষহীন সৈনিক। "বিদ্যাসাগর নিজেই বই লিখেছিলেন, নিজেই ছাপছিলেন, নিজেই বিক্রি করছিলেন, নিজেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছিলেন ঝড়ের গতিতে, কি পড়ানো হবে তার নির্দেশিকা তৈরী করছিলেন এবং নিজেই পড়াচ্ছিলেন ক্লাসে দাঁড়িয়ে– শিক্ষাব্যবস্থার পুরো চক্রটাই তিনি আবর্তন করছিলেন একা একা।"[৪৬] ১৮৪৬ সালের ৬ এপ্রিল তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। এ কলেজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এখানে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার ছিল। তিনি সে সংকীর্ণ প্রথাকে রুদ্ধ করে দেন। শিক্ষাক্ষেত্রে জাতপাতের ভেদাভেদ তুচ্ছ জ্ঞান করে অব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীদের জন্য তিনি সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। সেইসঙ্গে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যাতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে সাথে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে তার ব্যবস্থাও তিনি করলেন। শিক্ষা সাধনায় তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে বলেন,

> "এদেশের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার এবং বিদেশের নতুন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানসম্পদ আহরণ ক'রে বাংলাশিক্ষার, বাংলাভাষার এবং বাংলাসাহিত্যের পাকাপোক্ত বনিয়াদ রচনা করা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কেবল ইংরেজিবিদ্যা শিখে যাঁরা আধাফিরিঙ্গি হবেন, অথবা প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যা শিখে টুলোপণ্ডিত হবেন, তাঁরা কেউ এ কাজের যোগ্য হতে পারবেন না। সংস্কৃত কলেজটিকে তাই বিদ্যাসাগর সেকালের টোল-চতুষ্পাঠী করতে চাননি, আবার তাঁর সংলগ্ন হিন্দু কলেজের মতো 'দেশী সাহেব' তৈরীর কারখানাও করতে চাননি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিদ্যার সত্যকারের মিলনতীর্থ হোক, এই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা এবং সবচেয়ে রঙীন স্বপ্ন ছিল।"[৪৭]

বিদ্যাসাগর মূলত সমাজ সংস্কারক এবং শিক্ষা সংস্কারক। শিক্ষার উন্নততর মানবীয় বোধগুলোর সুন্দর বিকাশে প্রথাবদ্ধ আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে চিত্তসুদ্ধি সম্ভব। তাঁর শিক্ষা সংস্কারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল চিত্তসুদ্ধির মাধ্যমে মানবমুক্তির আবাহন। প্রচলিত Tradition এর ধার তিনি ধারেননি। তাঁর কাছে মনুষ্যত্ব বোধই চরম সত্য। দেশ, সমাজ এবং মানুষকে ভালোবাসাই পরম ধর্ম। কুসংস্কার, অন্ধত্ব, মোহত্ব, জড়ত্ব থেকে সমাজকে মুক্ত করার সাধনায় তিনি ছিলেন অটল। বহুবিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, নারীশিক্ষা প্রচারের

মধ্য দিয়ে তিনি বহুবছরে জীর্ণ শীর্ণ প্রথাবদ্ধ কুসংস্কারকে আঘাত করেছেন। নারীশিক্ষা প্রচারের যে উদ্যোগ মিশনারী নিয়েছিলেন, রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তায় সে শিক্ষা অঙ্কুরিত হয়েছিল। 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামক নারী সমিতির প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে নারীশিক্ষার যে গতি প্রবহমান হয়েছিল, তা-ই যেন স্বয়ংসম্পূর্ণতা পেল বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি বেথুনকে সহায়তা করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের মধ্যে হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া এ চারটি জেলায় মোট পয়ঁতাল্লিশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটাতে গিয়ে তিনি রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থীদের হামলার শিকার হন। কিন্তু কোনো প্রতিকূলতা তাঁর গতিপথকে রুদ্ধ করতে পারেনি। সমাজ সংস্কারে, শিক্ষা সংস্কারে তিনি ক্লান্তিহীন নির্ভীক এক প্রবাদ পুরুষ।

উনিশ শতকের শিক্ষায় বৈপ্লবিক অবদানে সে সময়কার এসোসিয়েশন এবং সাময়িক পত্রের ভূমিকা অনন্য। 'সমাচার দর্পণ': (১৮১৮) 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) ; 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১); 'বঙ্গদূত' (১৮২৯); 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১); 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১) প্রভৃতি সাময়িক পত্র জ্ঞানবিজ্ঞান, যুক্তি তর্কের শিক্ষা-দীক্ষা, চিঠি-প্রত্যুত্তর, রক্ষণশীল-গোঁড়াপন্থীদের মতবাদ ইত্যাদি প্রচারের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের বাঙালির জ্ঞান আহরণের অভিলাষকে করেছে সমৃদ্ধ।

ঘ. সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে আধুনিকতার প্রসার

উনিশ শতকের সূচনালগ্নে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা নব ভাবাদর্শে আধুনিক রূপ পায়। শিক্ষিত বাঙালি পশ্চিমা চিন্তা-ভাবনা ও যৌক্তিকতাকে গ্রহণ করে সমসাময়িক সমাজের বদ্ধতা, জড়তার মূলে কুঠারাঘাত করে মানবীয় বোধের সম্মিলনে আধুনিকতাকে মনে প্রাণে স্বাগত জানায়। বাংলার আধুনিকতা ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরই পরোক্ষ প্রতিফলন। যদিও তা বাংলায় পৌঁছেছিল কয়েক শতাব্দী পরে। পনের শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ফলে সৃষ্ট আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী বলেন,

> "১. মানব মুক্তি বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Emancipation of the Individul) ২. জাতীয় রাষ্ট্র (National states) ৩. রেনেসাঁস বা জাগৃতি (Ranaissance) ৪. রিফরম্যাশন বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন (Reformation) ৫. ভৌগোলিক আবিষ্কার (Geographical discoveries) এই কয়েকটি ঘটনা ও এগুলির প্রভাব মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগের পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে এসব কয়টি ঘটনাই রেনেসাঁস বা জাগৃতির সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। সুতরাং রেনেসাঁসের মাধ্যমে মধ্যযুগ আধুনিক যুগ রূপ পাইয়াছে। ইহা বলা বাহুল্য।"[৪৮]

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চেতনাবোধ বাংলার নবজাগরণকে অনেকাংশেই তরান্বিত করেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবিকবোধ, যুক্তিবাদ, ঐতিহ্য উদ্ধার, আত্মচেতনা ও আত্মপ্রসার, সমাজচেতনা, ধর্মীয় সংস্কার, স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বাঙালির চেতনাসঞ্জাত উপলব্ধিময় অভিব্যক্তিকে আত্মপ্রত্যয়ী করেছে এবং বাংলার সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে ঘটিয়েছে নব উত্থান। সমাজ জীবন আর সাহিত্য দুটোর পারস্পারিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সমাজ জীবনের শৈল্পিক প্রতিফলনেই রচিত হয় সাহিত্য। সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্ব আর জীবন বিকশিত হয় ক্রমবর্ধমান সামাজিক রীতিনীতির ছায়াতলে। সমাজ ব্যবস্থা যেখানে রুগ্ন অন্তঃসারশূন্য কঙ্কাল মাত্র, সাহিত্য সেখানে নির্জীব চেতনা ও প্রাণহীন ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। আধুনিক যুগের পূর্বে বাংলার সাধারণ জীবন ছিল কৃষি নির্ভর গ্রামীণ জীবন। বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রায় ধর্মবোধে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন তাঁরা। সেজন্যই সেসময়ে রচিত সাহিত্যে শুধু ধর্মীয় চর্বিতচর্বণই প্রাধান্য পেয়েছে। ইংরেজ আগমনের পর বাঙালির জীবনযাত্রায় বহুমাত্রিকতা যোগ হয়। ধীরে ধীরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। আধুনিক চিন্তা-চেতনায় বাঙালি আড়-মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠে, আবিষ্কার করতে শুরু করে আত্মশক্তিকে। বলা য়ায়, "ঊনবিংশ শতক বিপুল পরিমাণ মননশীল ও সাড়া জাগানো কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব এবং বিদেশী শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে যাবার চেতনা থেকে শুরু হয় নতুন করে জেগে উঠার পর্ব।"[৪৯] ইউরোপীয় মিশনারী, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং কিছু ধনিক শিক্ষানুরাগী বাঙালির শিক্ষা প্রসারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে কলকাতায় একটি সাংস্কৃতিক

পরিমণ্ডল গড়ে উঠে। ১৮১৫ সালে রাজা রামমোহন রায়-এর তত্ত্বাবধানে কিছু বিদগ্ধ জ্ঞান পিপাসু গুণীজনের সমন্বয়ে গড়ে উঠে 'আত্মীয় সভা'[৫০]। রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ ও মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত তাঁদের আলোচনা, চিন্তাভাবনা এবং আদর্শ মুদ্রিত ফরমান রূপে শিক্ষিত সমাজকে দ্রুত আন্দোলিত করে এবং তাঁদের সনাতনী চিন্তার বাঁক পরিবর্তন করে। উইলিয়াম কেরীর গদ্যের প্রসার রামমোহনের সংস্কার চিন্তার সহায়ক হয়ে বাঙালির মধ্যযুগীয় ভাবনার ভিতকে ভাঙতে শুরু করে। ধর্মীয় আচার সর্বস্ব অসংগতিগুলো উঠে আসে জন সমক্ষে। সত্য ও সুন্দরের স্বচ্ছতায় জীবন জগৎকে প্রত্যক্ষ করার নিরপেক্ষ মনোভঙ্গির জন্ম হয়। বাঙালি মানবিকবোধে উজ্জীবিত হয়। সাহিত্যেও মানবতার জয়ধ্বনি ওঠে। আকাশবিহারী কল্পলোকের আরাধনা থেকে কবি সাহিত্যিকরা নেমে আসেন মর্ত্যভূমিতে। তাঁদের আজন্ম লালিত অলৌকিক দেব-দেবীর সংস্কার মানবিকতায় আত্মসমর্পণ করে। সমাজ বাস্তবতা স্বমহিমায় সাহিত্যে আপন স্থান করে নেয়। প্রথমাবস্থায় কোলকাতাকে ঘিরে পরিবর্তনের এ দীপশিখা জ্বলে উঠলেও ধীরে ধীরে তা শহর থেকে শহরতলীকে ছাপিয়ে দূর দূরান্তে তার রশ্মিরেখা ছড়িয়ে দেয়। ফলে জীবনমুখী ভাবনা পল্লী সাহিত্যেও কৌতূহল সৃষ্টি করে।[৫১]
বাঙালির প্রথাবদ্ধ জীবনধারা উন্নয়নের এবং সাহিত্যে জীবনমুখী গতি সঞ্চালনের পুরোহিত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর চিন্তার বিকাশে মুদ্রণযন্ত্র এক অভূতপূর্ব কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এর ফলে তাঁর চিন্তাগুলো অতি দ্রুত প্রসারিত হয়ে বাঙালির গতানুগতিক চিন্তার জগতে আমূল পরিবর্তন আনে। তাঁর মানবিক মূল্যবোধ, সংস্কারমুক্ত মন ও অনুসন্ধিৎসা এবং দার্শনিক সুলভ প্রজ্ঞার জন্য অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে আধুনিক ভারতের ভবিষ্যৎ-স্রষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি একাধারে সমাজ সংস্কারক, ধর্ম সংস্কারক, শিক্ষানুরাগী ও দেশপ্রেমিক। বলা যায়, "আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য, জুরির বিচার প্রবর্তনের জন্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য, ভারতীয় স্ত্রী লোকের অধিকার সংরক্ষণের জন্য এবং সর্বোপরি ভারতীয়দের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়"[৫২] প্রভৃতি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার ছিল তাঁর আজীবনের অভিপ্রায়। মানব কল্যাণকে পরম সত্য জ্ঞানে প্রগতির সম্ভাবনাময় দ্বার উন্মোচনে তিনি নিরলস সাধনা করেছেন। নির্ভীক সৈনিকের মতো মানবতা দীপ্ত আলোতে ধর্ম ও সমাজের সকল প্রকার অন্ধকারকে তিনি দূর করতে চেয়েছেন। তাঁর মনন ছিল সম্ভাবনাময় ভোরের সূর্যালোকে স্নাত, কর্মপ্রয়াস ছিল দুর্নিবার আর প্রকাশভঙ্গি ছিল শৈল্পিক ঔচিত্যবোধে মার্জিত। মানবমুক্তির প্রেরণায় প্রগতিশীলতার সারস্বত আন্দোলনে তাঁর সৃষ্ট গদ্যসাহিত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমাজ সচেতনায় মুখর হয়েছে। যদিও তাঁর রচনাগুলো উদ্দেশ্যমূলক (সমাজ সংস্কার, ধর্ম সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনেই রচিত), তবুও আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রাথমিক অগ্রযাত্রায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।
রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অপব্যবস্থা উপলব্ধি করে মর্মপীড়া অনুভব করলেন। তিনি দেখলেন পুরো সমাজটাই অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সমাজের সর্বময় কর্তা হয়ে বসে আছেন অজ্ঞ, লোভী, চরিত্রহীন ব্রাহ্মণরা আর তাঁদেরই অনুশাসনে চলতে বাধ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাঁদের ক্ষমতালিপ্সা ও দাপটের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষই হতে লাগলেন বলির পশু। নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার হীনকৌশলে তাঁরা নানা প্রথার সৃষ্টি করলেন– জাতিভেদ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বাধ্যতামূলক বৈধব্য প্রথা। তৎকালীন শিক্ষাহীন বর্বর সমাজপতিদের মধ্যে নীতিবোধ বা

মূল্যবোধ বলে কিছু ছিল না। তাঁদের মানবতা বর্জিত ধর্মীয় নিয়ম-নীতির ফলে সমাজ জীবন হয়ে পড়েছিল অনেকটাই স্থবির। শুধু ধর্মীয় অন্ধত্বের কারণেই সতীদাহের মতো নির্মম, নিষ্ঠুর প্রথাও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের সমাজে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় আগ্রাসনের কারণে সে সমাজ যে কি পর্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হয়েছিল তার বিবরণ মদনমোহন গরাই এর 'রামমোহন : সময়–জীবন-সাধনা' গ্রন্থে পাওয়া যায়–

> "মানুষের জীবনকে ধর্মের নামে নৃশংসভাবে বলি দেওয়া সেদিনের সমাজে ছিল অতি সাধারণ ঘটনা। গঙ্গাবক্ষে, সাগরে, জগন্নাথের রথের নিচে সর্বত্রই এই আত্মহননের দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত প্রথার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল সতীদাহ এবং সবচেয়ে বেশি প্রচলনও ছিল সতীদাহ। একটি সুস্থ, সবল ও জীবন্ত মানুষকে একটি মৃত মানুষের সঙ্গে এক চিতায় তুলে পুড়িয়ে মারার মত নিদারুণ নৃশংসতার কথা আজ আমরা চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু একদিন ছিল, খুব বেশি দূরে নয়, দেড়শ বৎসর আগেও যখন ভাগিরথীর তীরে এমনি করে একদিন চিতা সাজানো হত। সদ্য বিধবাকে আলতা-সিঁদুরে সাজিয়ে তোলা হত চিতায়; তারপর যখন আগুন উঠত জ্বলে, তখন পাছে প্রাণের মায়ায় সেই বিধবা ধর্মকার্যে বিঘ্ন ঘটিয়ে বসে, তাই চিতার পাশে দণ্ডায়মান হিতাকাঙ্ক্ষীরা বাঁশের লাঠির নির্দয় প্রহারে দূর করে দিত তার সকল ভয়-যন্ত্রণা; সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর আর হাজার হাজার কণ্ঠের হরিধ্বনির পৈশাচিক উল্লাসে চাপা পড়ে যেত এক অসহায় সদ্যবিধবার বেঁচে থাকার অন্তিম প্রার্থনা। শুধু সেই চিতাগ্নিতেই এক নিরুপায় নারীর সঙ্গে প্রতিবার নতুন করে পুড়ত হিন্দুর মনুষ্যত্ব।"[৫৩]

ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় বিধিব্যবস্থার কঠোর অনুশাসনে সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ শাণিত বুদ্ধির কারণে তাঁদের সামাজিক অনাচারকে উপলব্ধি করতে পারলেও সমাজ বিচ্যুত হবার ভয়ে তা মেনে নিতেন। ফলে অজ্ঞ, মূর্খ, ক্ষমতালোভী ব্রাহ্মণরা সমাজে একাধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। রাজা রামমোহনই প্রথম ব্রাহ্মণদের এসব অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। যুক্তি ও বিচারের মানদণ্ডে দাঁড় করিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনি দ্বারা তাঁদেরকে তীব্র আক্রমণ চালালেন। হিন্দুসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বহুবিবাহ, বাল্যবিহ এবং সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথাকে তিনি সমাজ থেকে বিদূরিত করতে চাইলেন। তিনি শাস্ত্রীয় ধর্মের উর্ধ্বে মানবিকতাকে স্থান দিয়েছিলেন। যেখানেই মানবতা লংঘিত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে সেখানেই তাঁর কলম গর্জে উঠেছে। তিনি গভীর মর্মবেদনায় প্রত্যক্ষ করলেন ভারতীয় সমাজে নারীদের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, মানুষ হিসেবে আত্মবোধে বেঁচে থাকার কোনো অধিকারও নেই। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় তাঁরা একান্তই অবহেলিত, নিগৃহীত ও অবরুদ্ধ। যদিও হিন্দুধর্মে নারীর নানারকম স্তুতিগান গাওয়া হতো, নারীকে দুর্গা, সরস্বতী, কালী, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবী হিসেবে পূজা করা হতো কিন্তু এ ছিল অধ্যাত্ম জগতের কাল্পনিক আরোপিত রূপ। বাস্তবে নারীর জীবন ছিল বিভীষিকাময়। প্রাচীন, মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্যে, শাস্ত্রে এবং প্রথাগত জীবনে আমরা দেখতে পাই নারীরা ছিল টাইপ চরিত্র। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, অধিকার সচেতনতা এবং অনুভূতির প্রখরতা কোনোটাই তাঁদের ছিল না।

সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় অবরুদ্ধ নারীরা সহস্র বছর ধরে মানসিক দাসত্বে করেছে কালাতিপাত। এমনকি সতীদাহের মতো নির্মম প্রথাকে মেনে নিয়ে তাঁরা হাসিমুখে চিতায় আরোহন করত এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে পুরুষতান্ত্রিক অশুভ আধিপত্যকে মেনে নিত। এমনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ আনুগত্যের কারণে নারীরা ছিল অধিকার বঞ্চিত এবং লাঞ্ছিত। রাজা রামমোহন রায় নারীদের এহেন দুরবস্থা থেকে রক্ষার অভিপ্রায়ে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টায় সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রামমোহনের মতে সতীদাহ ছিল নারী নির্যাতনের চরম অবস্থা। যা অত্যন্ত অমানবিক ও বর্বরোচিত। তিনি হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্র ও শ্রুতি-স্মৃতির আলোচনা করে যুক্তি-তর্কের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে, সতীদাহ শাস্ত্রানুমোদিত কোনো প্রথা নয় বরং একটি লোকাচার মাত্র। 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' এবং 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' রচনায় কাল্পনিক সংলাপের মাধ্যমে যুক্তি খণ্ডন করে এর ভ্রান্ততা প্রমাণ করেন। প্রবর্ত্তকের সংলাপের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের অন্ধ আচার সর্বস্বতা তুলে ধরেন আর নিবর্ত্তকের যুক্তিনিষ্ঠ সংলাপের মাধ্যমে সেই অন্ধতাকে দূর করার প্রয়াস চালান–

> **প্রবর্ত্তক:** এরূপ সহমরণে ও অনুমরণে পাপই হউক কিম্বা যাহা হউক আমরা এ ব্যবহারকে নিবৃর্ত্ত করিতে দিব না ইহার নিবৃত্তি হইলে হঠাৎ লৌকিক এক আশঙ্কা আছে যে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া বিধবা অবস্থায় রহিলে তাহার ব্যভিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু সহমরণ করিলে এ আশঙ্কা থাকে না জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই নিঃশঙ্ক হইয়া থাকেন এবং পতিও যদি জীবৎকালে জানিতে পারে তবে তাহারো মনে স্ত্রীঘটিত কলঙ্কের কোনো চিন্তা হয় না ইতি।
>
> **নিবর্ত্তক:** কেবল ভাবি আশঙ্কাকে দূর করিবার নিমিত্তে এরূপ স্ত্রীবধে পাপ জানিয়াও নির্দ্দয় হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক প্রবর্ত্ত হইতেছ তবে ইহাতে আমরা কি করিতে পারি কিন্তু [২০] ব্যভিচারের আশঙ্কা পতি বর্ত্তমান থাকিতেই বা কোন্ না আছে বিশেষত পতি দূরদেশে বহুকাল থাকিলে ঐ আশঙ্কার সম্ভাবনা কেন না থাকে অতএব সে আশঙ্কা নিবৃত্তির উপায় কি করিয়াছ।[৫৪]

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সতীদাহ নিবারণে তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। শাস্ত্র-বাক্যাদির খণ্ডন করে তিনি জনমত গঠন করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' রচনাটি ইংরেজিতেও প্রকাশিত হয়। ফলে সতীদাহের ভয়াবহতা সম্পর্কে ইংরেজরাও ধারণা লাভ করেন। এসময় বাংলার কার্যভার গ্রহণ করেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। লর্ড বেন্টিঙ্কের আন্তরিক সহযোগিতায় রামমোহনের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন (সতীদাহ রদ) বাস্তবতায় রূপ পায়। সহস্রাব্দ ধরে প্রচলিত অচলায়তন ভেঙ্গে বাংলার নারীকে তিনি এক ভয়াবহ বিভীষিকা থেকে মুক্তি দেন। এখানেই তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টা থেমে যায়নি। তিনি হিন্দুসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এমনকি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে

স্ত্রীলোকের অধিকার বিষয়েও আন্দোলন করেছেন। তাঁর এসব আন্দোলনের মূলে ছিল দেশ, জাতি তথা মানবতাবাদ।

১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ বাঙালির নব্য ধান-ধারণা বিকাশে এবং বাঙালি সমাজ জীবনে আধুনিকতা আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় এককথায়, মুক্তচিন্তার পাদপীঠ ছিল হিন্দু কলেজ। এ কলেজের শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হলেন পাশ্চাত্য জ্ঞানের অধিকারী যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তার এক প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আধুনিক, সংস্কারমুক্ত, স্বাধীন চেতনার যৌক্তিক বিকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের অন্ধবিশ্বাস, বিচারহীনতা, অযৌক্তিক পক্ষপাত মুক্ত নৈর্ব্যক্তিক স্বচ্ছতায় আত্ম-সচেতন জিজ্ঞাসু মনোবৃত্তি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ হীন বিশ্বাস অন্ধতারই নামান্তর। তিনি তাঁর ছাত্রদের অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন। জ্ঞানসন্ধিৎসার এক দুর্বার আকর্ষণে ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী। ডিরোজিও সম্পর্কে শ্রী ভূদেব চৌধুরী বলেন, “উনিশ শতকের বাঙালি জীবনে আধুনিকতার প্রস্তুতি যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ ছিল হিন্দু কলেজ। আর এ কালের পাঠক আত্মশ্লাঘার সঙ্গে স্মরণ করবে, সেই ঐতিহাসিক স্তম্ভের শ্রেষ্ঠ স্থপতি ছিলেন একজন যথার্থ ভারতীয় তরুণ শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।”[৫৫]

ডিরোজিওর শিষ্যরা সমাজে নব্যবেঙ্গল বা ‘ইয়ংবেঙ্গল’ নামে পরিচিতি পায়। তবে ‘ইয়ংবেঙ্গল’ নিয়ে একটু বিতর্ক আছে। অমিত দে তাঁর ‘বাংলার নবচেতনার দুই অগ্রপথিক ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ার’ প্রবন্ধে বলেন, “ইয়ংবেঙ্গল কথাটি সম্ভবত মাৎসিনির ইয়ং ইতালীর অনুকরণে নেওয়া। ইয়ংবেঙ্গলে কেবল ডিরোজিয়ান বা ডিরোজিওর অনুগামীদের কথা ভাবলে ভুল হবে। ডাফ-এর মতে ইয়ংবেঙ্গল বলতে বোঝাতো প্রাচ্যের এক নূতন গোষ্ঠীর মানুষের কথা যারা বিশ্বাস, জ্ঞান ও জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে পুরাতনের স্থানে নূতনকে আহ্বান করেছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে রামমোহন রায়কেও কখনো কখনো ইয়ংবেঙ্গলের নেতা হিসেবে দেখা হয়েছে।”[৫৬] বির্তক যাই থাকুক উনিশ শতকের প্রগতিশীলতার আন্দোলনে ডিরোজিওর শিষ্যরাই ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁদের উদার মানবতা, সনাতনী প্রথা ভাঙার তৎপরতা, পাশ্চাত্য রীতিনীতি গ্রহণ করার মানসিকতা তৎকালীন প্রথাবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁরা সমাজে বিতর্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু কোনো প্রতিকূলতাই তাঁদের অপ্রতিরোধ্য আত্মবিশ্বাসকে প্রতিহত করতে পারেনি। সমাজের স্থানুত্ব, অচলত্বের বেড়ি ভেঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন এবং ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কারে জ্ঞানের পরিক্রমাকে স্বাগত জানান। জ্ঞান চর্চা এবং বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও প্রতিকার কল্পে তাঁরা ‘জ্ঞানোপার্জিকা’ সভা বা ‘SOCITY FOR THE ACQUISTION OF GENERAL KNOWLEDGE’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সভার সভ্যগণের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদন দত্ত সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক আন্দোলনে অনন্য

অবদান রেখেছেন। মুক্তবুদ্ধি চর্চা, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ, নারী অধিকার সচেতনতা, স্বদেশপ্রেম, মানবতাবাদ প্রভৃতির রূপায়ণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনে তাঁরা সমাজ ও সাহিত্যে নব ভাবনার জোয়ার আনেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর আধুনিকতাঋদ্ধ সুচিন্তিত চেতনার প্রায়োগিক দক্ষতায়। এ জন্যই তাঁকে ইউরোপীয় রেনেসাঁর মানসপুত্র বলা হয়।[৫৭]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। তিনি ডিরোজিওর সরাসরি শিষ্য ছিলেন না। কিন্তু ডিরোজিওর নব্যচেতনার স্ফূরণ ও কর্মস্পৃহাকে তিনি ধারণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছিল তাঁর তীক্ষ্ণ প্রতিভার অসহ্য অস্থিরতা। প্রাচীনত্ব, স্থবিরত্ব তাঁর ইপ্সিত নয়। প্রাণের প্রখরতায়, প্রতিভার অস্থির উন্মাদনায় আত্মশক্তির উদ্বোধনে তিনি প্লাবিত করতে চান সমগ্র বিশ্বকে। এ পথযাত্রায় কোনো প্রতিবন্ধকতা তাঁর কাম্য নয়। যখনই কোনো বাধা এসেছে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রতিহত করেছেন। " তিনি জাতি-ধর্ম ত্যাগ করে, পরিচিত আবেষ্টনীর মায়াডোর, মা-বাবার স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে এগিয়ে চললেন বড় হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায়। বড় তাঁকে হতেই হবে, অনেক উর্ধ্বে তাঁকে আরোহন করতে হবে। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্র মধুসূদন বলেছেন, I must soar up and up."[৫৮] তাঁর ভেতরে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বীয় প্রতিভায় ইংরেজি সাহিত্যে আপন স্থান করে নেবেন। কিন্তু বিপুল আকাঙ্ক্ষা, বিপুল স্বপ্নের শীর্ষদেশ তিনি ছুঁতে পারেননি। তিনি ফিরে এলেন অনেকটা ব্যর্থ হয়েই। এ ব্যর্থতাই বাংলা সাহিত্যে হয়ে উঠল 'শাপে বর'। ভার্সাই নগরীতে অবস্থান কালে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ উপলব্ধি করলেন এবং বাংলা সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি ঘটালেন এক নব্য বিপ্লব। তিনি সচেতনভাবে প্রাচ্য পটভূমিতে পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের ভাব ও আঙ্গিকগত রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। পাশ্চাত্য জীবন জিজ্ঞাসায় ভারতবর্ষের সনাতনী কাব্য সাধনার মূলে আঘাত হেনে তিনি কাব্যের ভাব ও আঙ্গিকে আমূল পরিবর্তন আনেন এবং বাংলা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে প্রচণ্ড গতির সঞ্চার করেন। তাঁর কাব্যেই প্রথম মানবতাবাদ, স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, স্বতন্ত্র প্রকৃতিচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারী অধিকার ঘোষিত হয়েছে। তিনিই প্রথম হাজার বছরের পয়ার ছন্দের বেড়ি থেকে মুক্তি দিয়ে বাংলা কাব্যে নিয়ে এলেন প্রবহমানতা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনে বাংলা সাহিত্যকে করে তুললেন একান্তই আধুনিক। এজন্যই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদগাতা বলা হয়।

দুর্লভ জ্ঞান সাধনায়, স্বভাবসিদ্ধ সততায়, অসামান্য ব্যক্তিত্বে, মানবমুক্তির অন্তরজাত প্রেরণায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন যথার্থ মানুষ। ধর্মবোধের বহু উর্ধ্বে তিনি মানবীয় মূল্যবোধকে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায়, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। ধর্মীয় অন্তঃসারশূন্যতা সম্ভবত তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তা যে আধুনিক জীবন ও জগতের অনুপযোগী সেটাও বুঝতে পেরেছিলেন। আচরিক ধর্ম যা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে সমাজ জীবন বিচ্ছৃঙ্খল করেছে তাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। সমাজ তথা সমাজের মানুষের মধ্যে বিরাজমান গোঁড়ামি, অন্ধত্ব বিদূরিত করে মানবীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত আধুনিক সভ্যতার প্রত্যাশী ছিলেন তিনি।

সংস্কার চিন্তায় তিনি রামমোহনেরই উত্তরসূরি। রামমোহন সতীদাহবিলোপের মধ্য দিয়ে সংস্কার প্রচেষ্টার যে যাত্রা শুরু করেছিলেন বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ, অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন ও স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সমাজ সংস্কারে তা পূর্ণতা পায়। অদম্য কর্মোদ্যম, অজেয় সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি বাঙালিকে পাশ্চাত্য মুক্তির আলোয় উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। সমাজ জীবনের স্থবিরতায় তিনি মানবমুক্তির গতিময় আরোপিত রূপ কল্পনা করেছেন। "বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ছিলেন মূলত সমাজ সংস্কারক। বিদ্যাসাগর সমাজের নিপীড়িত ও লাঞ্ছিতদের মুক্তির জন্য আজীবন আন্দোলন করিয়া গিয়াছিলেন, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার দান অপরিসীম।"[৫৯] শিক্ষার অসংগতি, সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, নারীর দুর্দশা, মানবীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় মোদ্দাকথা জাতির সংকটাপন্ন অবস্থায় বিদ্যাসাগরের সুস্থির জীবনচেতনা স্থির থাকতে পারেনি। শাস্ত্রীয় যুক্তির সঙ্গে মানবীয় আবেদনের সম্মিলনে তিনি দেশ ও জাতিকে প্রথাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। সম্ভাব্য সকল বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তিনি মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সংস্কার ভাবনায় তিনি এক আপোষহীন সৈনিক। সংস্কার প্রচেষ্টায় শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষাই মানুষের মধ্যে উন্নতবোধের জন্ম দিতে পারে। 'শিক্ষা সবার অধিকার' এ মনোভাবকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য তিনি আজীবন সাধনা করেছেন। পাঠ্য পুস্তকের অভাব মেটানোর লক্ষ্যে তিনি গদ্য রচনায় ব্রতী হন। বিভিন্ন অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে যেমন শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর হাতেই নির্মিত হয় গদ্য সাহিত্যের অনন্য রচনা শৈলী। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রভাব', 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষরক প্রস্তাব', 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' এসব সমাজ সংস্কার প্রক্রিয়ায় তাঁর আধুনিক মনোভাবের নানন্দিক প্রকাশ ঘটেছে।

রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও বিদ্যাসাগরের কর্মস্পৃহায় পাশ্চাত্য আধুনিকতা বাঙালির আরাধ্য হয়ে উঠে। কাল প্রবাহে অত্যন্ত মন্থর গতিতে হলেও বাঙালি সাহিত্য ও সমাজ আধুনিকতার প্রাণ স্পর্শে জেগে উঠে। শ্রী ভূদেব চৌধুরী বলেন, "য়ুরোপীয় চেতনার প্রাণস্পর্শে ভারতবর্ষীয়তার নব সঞ্জীবনই আসলে উনিশ শতকের সমাজ বিপ্লবের যথার্থ স্বরূপ। বাংলার প্রথম তরুণ দল ডিরোজিওর মধ্যে সেই প্রাণের স্পর্শ পেয়েছিল; রামমোহন রায় আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দিয়েছিলেন নব সঞ্জীবনমন্ত্র। প্রতিভার এ ত্রিবেণী সঙ্গমে বাংলার শিক্ষিত নাগরিক চেতনার অবগাহনের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে কৈশোর বন্ধনের মুক্তি ঘটেছিল।"[৬০] পরবর্তী সময়ে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, প্রমথ চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ সাহিত্যিকের সাহিত্যচর্চায় ক্রম বিকাশমান আধুনিকতা বিচিত্র পথে পরিণত রূপ পায়। রামমোহন রায়, ডিরোজিও, মধুসূদন এবং বিদ্যাসাগরের জ্ঞানান্বেষণ, সত্যদৃষ্টি আত্মোৎসারিত জীবন জিজ্ঞাসা, মানব মুক্তির আরাধনা এবং মননশীল সাহিত্য সাধনার অনিবার্য পরিণতিতে বাংলার সাহিত্য ও সমাজ জীবন আধুনিকতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

ঙ. ধর্মসংস্কার ও মানবীয় মূল্যবোধ

উনিশ শতকী নবজাগরণে বাংলায় শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ সংস্কারের অনুষঙ্গে পরিলক্ষিত মানবীয় মূল্যবোধের বিপর্যয়ে অনিবার্যরূপে ধর্ম সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও আচার সর্বস্ব ধ্যান ধারণা প্রতিভার বিকাশকে রুদ্ধ করে এককেন্দ্রিক অন্ধত্বে সীমাবদ্ধ করে। একটি নির্দিষ্ট সংকীর্ণ গণ্ডিতেই মানুষের বোধ-বুদ্ধি আবর্তিত হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে অলৌকিক ভীতিতে মানুষের মনে জন্ম নেয় মেনে নেয়ার এক অদ্ভুত প্রবণতা। ভারতীয় সমাজে যেসব অনাচার ও অবজ্ঞামূলক বৈষম্য বাসা বেঁধে আছে তা আবহমানকাল ধরে ধর্মীয় ছায়াতলেই বেড়ে উঠছিল। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ প্রকট আকার ধারণ করে। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মণ্যবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে মানবীয় মূল্যবোধকে উচ্চকিত করেন। মনীষী হরপ্রসাদ রামমোহনের যুগকে ‘Age of transition বা ‘পরিবর্তনের সময়’ বলেছেন।[৬১] একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাব, আধুনিকতা ও মানবতাবাদের প্রসার, অন্যদিকে মিশনারীদের ধর্ম প্রচারে দৌরাত্ম্য ও ব্রাহ্মণদের সামাজিক অনাচার ও ব্যভিচারে মানবতার অবক্ষয় রাজা রামমোহনের চেতনাকে আন্দোলিত করেছে। ধর্ম সংস্কারের প্রেরণা তিনি লাভ করেছেন কু-সংস্কারমুক্ত আধুনিক সমাজ গঠনের প্রেরণা থেকে। “রামমোহন সমকালীন হিন্দু ধর্মের বিকৃত আচার অনুষ্ঠানকে হিন্দুদের ঐহিক উন্নতির পথে বাধা মনে করেছেন, এবং ধর্মসংস্কারের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান সম্ভব হবে বলেই যেন ধর্ম সংস্কারের কাজে অগ্রসর হয়েছেন।”[৬২] মুক্ত উদার আন্তর্জাতিক মানবতাবোধে তাঁর ধর্মচিন্তা বিকশিত হয়েছে। তাঁর অন্তরে ছিল এক বিশুদ্ধ ধর্মবোধ। সে ধর্মবোধ জাতি-বর্ণ-দেশ-কাল ভেদে সর্বকালীন মানবের। আচরিক ধর্মবোধে যেখানেই মানবতা দলিত হয়েছে, সেখানেই তিনি ধর্ম সংস্কারে মনোনিবেশ করেছেন। তিনি জ্ঞানের গভীর অধ্যবসায় আর তপস্যামগ্ন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন ধর্ম হলো প্রতিটি মানুষের নিজস্ব বিশ্বাসবোধ। তিনি কখনো কারো সে বিশ্বাসবোধে আঘাত করেননি। সকলের বিশ্বাসের ওপর ছিল তাঁর সমান ভক্তি ও আস্থা। তাঁর কাছে সকল ধর্মের প্রত্যেক মানুষ অনন্য। রামমোহন রায় তাঁর অক্লান্ত সাধনায় অর্জিত সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, সাহসিকতা, সহনশীলতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে সমাজ এবং ধর্ম সংস্কারে মানবীয় বোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি বিশেষ কোনো জাতি বা শ্রেণিভুক্ত মানুষের কথা ভাবেননি। “তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসায় তিনি মানুষ বলতে প্রত্যেক মানুষ, প্রতি স্ব তথা প্রাতিস্বিককেই বুঝেছিলেন।”[৬৩] শৈশব থেকে পৌত্তলিকতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। স্বধর্মের পৌত্তলিক পূজা ও গ্লানিকর যাগ-যজ্ঞাদি ও জটিল আচার আচরণ উপলব্ধি করে পীড়া অনুভব করেছেন। সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, জগন্নাথের চাকার নিচে মৃত্যুবরণ, চড়কের বীভৎসতা ও কদর্য সঙ, দুর্গা পূজার সময় মদ মাংস ও মেয়ে মানুষ নিয়ে ফূর্তি করা, অস্পৃশ্যতা, কৌলিন্য প্রথা প্রভৃতি হিন্দুধর্মের আচরিত রীতি-নীতির সঙ্গে মনুষ্যত্বের কোনো যোগ ছিল না। পরবর্তী সময়ে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র আলোচনা করে ধর্মীয় অনুশাসন ও ঐতিহ্যকে বুদ্ধিভিত্তিক যৌক্তিকতায় পর্যবেশিত করতে চেয়েছেন। বুদ্ধির অনুশীলনকে তিনি মনুষ্যবৃত্তির সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি ‘তুহফাৎ উল মুওয়াহিদীন’ এ বলেছেন-

“প্রত্যেক মানুষকে যে ঈশ্বর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছেন, তার মধ্যে এই ভাব নিহিত যে অন্য নিম্নস্তরের জীবের মতো স্ব-জাতীয়ের দৃষ্টান্ত এর চরম অনুকরণ করা উচিত নয়। পরন্তু নিজের বুদ্ধি ও অর্জিত জ্ঞান দিয়ে ভালোমন্দ এরূপ বিচার করা চাই যাতে ঈশ্বর দত্ত এই মহামূল্য দান যেন অকেজো না করে ফেলা হয়।”[৬৪]

হিন্দু-মুসলমান-ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্ম তিনি অনুশীলন করেছেন। ফলে সর্বধর্মের সমন্বয়ে বেদের অনুসরণে তিনি একেশ্বরবাদে আস্থা রেখেছেন। আর এ কাজের প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন অল্প বয়স থেকে আহৃত মনের ভেতরের এক গভীর বোধ থেকে। সে বোধকে এডাম বলেছেন- ‘a deep inwrought conviction early acquired’[৬৫] ১৮১৫ সালে তিনি ‘আত্মীয় সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সভায় সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি আলোচনার পাশাপাশি বেদপাঠ, ব্যাখ্যা, শাস্ত্র আলোচনা ও ব্রক্ষসংগীত হতো। ১৮২৮ সালে ব্রাক্ষসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনো ধর্ম সভা নয়, কিছু প্রগতিশীল নব্য ধনিক শ্রেণি মানুষের আলোচনা সভা ছিল এটি। সামাজিক, রাজনৈতিক অপরাপর বিষয়ের মতো ধর্মও ছিল এ সভার একটি আলোচ্য বিষয় মাত্র। রামমোহন কোন নতুন ধর্ম প্রণয়ন করেননি, কিংবা ধর্মবেত্তা হিসেবে আবির্ভূত হওয়াও তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। ধর্মীয় কুসংস্কার যা মানবতাকে নিষ্পেষিত করছে, যার সঙ্গে চিন্তা ও বুদ্ধির কোনো সংযোগ নেই, যা মানুষকে একমুখীন অন্ধত্বে স্থবির করে রাখছে, রামমোহন তাকে অযৌক্তিক মনে করেছেন। তিনি ব্রাক্ষসভার মাধ্যমে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ধর্ম সাধনার অধিকারকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন। তিনি এমন এক সভা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, যেখানে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী কোনো প্রতিকূলতা ছাড়াই নিজ নিজ উপাসনা করতে পারবে। তিনি ধর্মটাকে উহ্য রেখে মানবতারই সেবার দ্বার উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন,

“বস্তুতঃ রামমোহন কোনদিনই একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করেন নাই–হিন্দু মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইহুদী সকলেই এই উপাসনায় যোগ দিতেন। রামমোহন তাঁহার লিখিত দলিলেও এইরূপ নির্দেশ দিয়া যান যে, যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিবেন তাঁহারই জন্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্বিশেষে এই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। তবে এখানে কোন সাম্প্রদায়িক নামে ভগবানের উপাসনা হইতে পারিবে না, কোন প্রকার চিত্র বা প্রতিমূর্তি ব্যবহৃত হইবে না, প্রাণিহিংসা হইবে না, পানভোজন হইবে না, এবং কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হইবে না। যাহাতে পরমেশ্বরের প্রসার হয় এবং প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হয়, সেই আদর্শের অনুযায়ী উপদেশ বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে। এই আদর্শের পরিপন্থী কোন অনুষ্ঠান এই মন্দিরে হইতে পারিবে না।”[৬৬]

রামমোহন কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা না করলেও প্রচলিত ধর্মের ওপর তিনি কুঠারাঘাত চালিয়েছেন। তিনি যুক্তিবাদ, চিন্তার স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে প্রাধান্য দিয়ে প্রচলিত ধর্মকে সংস্কার করতে চেয়েছেন। রামমোহনের এই ধর্ম সংস্কার প্রয়াস পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত রূপে আত্মপ্রকাশ করে দেবেন্দ্রনাথের হাতে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মের "এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র যাহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, সেই পরব্রহ্মের অস্তিত্বে ও এই জগতের তৎকৃত নিয়ন্তৃত্বে অচল বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁহার পূজা কর, ইহাই ব্রাহ্মধর্মের প্রথম উপদেশ, ইহাই ইহার মূলমন্ত্র"[৬৭] প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্মে পরিবর্তিত হলেও দেবেন্দ্রনাথ মূলত মানবীয় মূল্যবোধকেই সমুন্নত রেখেছেন। তবে একথা স্বীকার্য, তিনি ছিলেন তপস্যামগ্ন সত্যদ্রষ্টা এক ঋষি। জাগতিক ভাবনার চেয়ে অধ্যাত্ম-ভক্তিতেই তিনি নিমগ্ন থাকতেন বেশি।

উনিশ শতকে হিন্দু কলেজে ধর্মকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। রামমোহনের যুগ শেষ এবং বিদ্যাসাগরের যুগ শুরুর মধ্যবর্তী সময়টা ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলী ইয়ংবেঙ্গলদের সংস্কার উন্মাদনার যুগ। ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক, মুক্তচিন্তা, উদার মনোভাব, বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তিবাদী চেতনা, কুসংস্কারমুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষার তীব্র উন্মাদনা সে সময়ের ধর্মীয় ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। ডিরাজিও তাঁর ছাত্রদের গোঁড়া আপ্তবাক্যবাদীতে পরিণত করতে চাননি। তিনি ঈশ্বরের পক্ষে ও বিপক্ষে মুক্ত আলোচনায় ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। তিনি তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখাতেন। স্বাধীন চিন্তার বিকাশে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি হয়ে উঠেছিল আলোকিত। রামমোহন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেই ধর্ম সংস্কার করেছেন। এখানে তাঁর দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতা লক্ষণীয়। তিনি ঈশ্বরের সাধনা করেছেন, আজীবন পৈতা পরেছেন। তিনি ধর্ম নয়, ধর্মের জবরদস্তিপ্রিয়তা ও ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোকে সংস্কার করতে চেয়েছেন। পৃথিবীর সকল ধর্মের মূলে রয়েছে মানুষের কল্যাণ, মানুষের সেবা। রামমোহন মূলের ধর্মকে লালন করেছেন মানবতার সেবার মাধ্যমে। কিন্তু যুক্তি তর্কের যৌক্তিক ব্যাখ্যায় ইয়ংবেঙ্গলের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত ছিল আরও বহুদূর। মুক্তচিন্তার স্বকীয়তায় যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতায় তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন এবং সামাজিক অনাচারে হিন্দু ধর্মের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। তাঁরা " পৈতে ত্যাগ করলেন, পোপ-ড্রাইডেনের কাব্য জায়গা নিল গায়ত্রীর; বিভিন্ন মন্ত্রের প্যারডি তৈরি হল; স্বার্থলোভী গুরু-পুরোহিতের ওপর এল ঘৃণা, হিন্দু ধর্মনিষিদ্ধ আহারে হল রুচি। সবমিলিয়ে হিন্দু কলেজে এল এক নতুন যুগ, যাকে প্রায় সমকালীন একটি পত্রিকায় the Derozian period of the College বলে অভিহিত করা হয়।"[৬৮] কোনো প্রথাগত ধর্ম নয় মানবতাই ছিল তাঁদের একমাত্র ধর্ম। ডিরোজিওপন্থীরা পুরোনো প্রথা, সংস্কার, আচার ঐতিহ্য সবকিছুকেই আক্রমণ করে মানবতাকে উচ্চকিত করতে চেয়েছেন। ইয়ংবেঙ্গল ধর্ম মহীরুহকে সমূলে উৎপাটনের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা রক্ষণশীলদের তোপের মুখে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে মানবধর্মের যে আধুনিক বোধ তাঁরা জন্ম দিয়েছেন (যা আত্মস্থ করা হয়তো এযুগের আধুনিক মানুষের অনেকের পক্ষে এখনো সম্ভব হয়নি), মানবিকতার যে ক্ষণিকাভাস ছড়িয়েছেন তাই পরবর্তী সময়ে হিন্দুধর্ম

সংস্কারে মানবিক আবেদন সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা রেখেছে। রামমোহনের ধর্মসংস্কার, ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর ধর্ম সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসু মনোভাবের উন্মাদনা সময়ের দক্ষতায় আরও পরিমার্জিত, শান্ত, সৌম্য রূপে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার চেতনায় প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগরের সময়ের সমাজ ছিল ধর্মান্ধ সমাজ। ধর্মের নামে মানুষ মানুষকে দূরে ঠেলে দিত। উঁচু শ্রেণির হিন্দু নিচু শ্রেণির হিন্দুর হাতে অন্ন খেলে জাত যাওয়ার মতো ধর্মীয় অনুশাসন উনিশ শতকের বাংলায় প্রচলিত ছিল। নারীরা ধর্মীয় অনুশাসনে অবরুদ্ধ ছিল। তাঁরা তখনকার সমাজে ছিল একান্তই ভোগ্যপণ্য। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ ছিল না। সামাজিক প্রথা হিসেবে তাদের গৌরীদান করা হতো। কৌলিন্য প্রথায় এক ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর শত নারী বিধবা হতো। ধর্মীয় বিধানের দোহাই দিয়ে পুরুষেরা ব্যভিচারে লিপ্ত হতো এবং বাইজীর ঘরে মদ্য, নৃত্য, গীতে মগ্ন থাকত। ধর্মীয় লেবাসে সমাজপতিরা নিজ স্বার্থে সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে শোষণ করত। বিদ্যাসাগর মানবতাবাদী মানুষ। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মেধা ও দক্ষতায় সমাজ সংস্কারের আড়ালে তিনি ধর্ম সংস্কারই করেছেন। "অবরুদ্ধ ও অন্ধকারময় হিন্দুসমাজে ঈশ্বরচন্দ্রের কার্যকলাপের প্রধান লক্ষ্য ছিল– আধুনিক শিক্ষার বিস্তার– বিশেষ করে নারী সমাজের শিক্ষা, নারী সমাজকে চরম অবমাননাকর ও অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাকে আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠা করা এবং তার জন্য বিধবার পুনর্বিবাহ প্রথা প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ, সমাজের দুঃস্থ মানুষদের সাহায্য ও সেবা করা এবং সমস্ত রকম ধর্মীয় ও সামাজিক কুপ্রথা ও যুক্তিহীন বিশ্বাসপরায়ণতা ও অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা।"[৬৯] বিদ্যাসাগর মানবতার ধর্মই পরম ধর্ম বলে জ্ঞান করেছেন। মানবতাকে তিনি শাস্ত্রীয় ধর্মের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তিনি আজীবন শাস্ত্রীয় ধর্ম ও ঈশ্বর ভাবনাকে এড়িয়ে চলেছেন। কোনো ধর্মানুষ্ঠান বা পূজা অর্চনায় তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেননি। নিজস্ব ধর্মমত নয়, তিনি তাঁর মায়ের ধর্মমত প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমার মা বলিতেন, যে দেবতা আমি নিজ হাতে গড়িলাম, সে আমাকে উদ্ধার করিবে কেমন করে? বাঁশ, খড়, দড়ি, মাটিতে ঠাকুর ঘরে পূজা করে কি ধর্ম হয়।"[৭০] বিদ্যাসাগর যদিও নিজের ধর্মমত ব্যক্ত করেননি কিন্তু তাঁর মায়ের ধর্মমতের মধ্য দিয়ে যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণ ঘটেছে তাতে আমরা তাঁর নিজস্ব ধর্মমতেরই আভাস পাই। তাঁর সময়ে ধর্ম সংস্কার নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলছিল, তিনি সেদিকে কোনো মনোযোগই দেননি। প্রথাবদ্ধ ধর্মীয় অনুশাসন তিনি মানেননি। শুদ্ধ বুদ্ধি চর্চার মধ্য দিয়ে মানবতার সেবাই ছিল তাঁর একমাত্র ধর্ম। ব্রাহ্মণ্যবাদ, নারীর পশ্চাৎপদতা, জাত-পাতের বিভেদে তিনি মনঃপীড়া অনুভব করেছেন, তাই শাস্ত্রীয় যুক্তি খণ্ডন করে সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেছেন। বিদ্যাসাগরের অনন্য অবদান শিক্ষা বিস্তারে প্রথা বিরোধী অবস্থান। ধর্মীয় দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণরা প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত শিক্ষায় একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করে এসেছে। বিদ্যাসাগর সেই অন্ধ আভিজাত্যে আঘাত করে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার দ্বার অব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করেন এবং প্রথা বিরোধী হয়ে ব্রাহ্মণদের জন্যও ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন করেন। ধর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করে তিনি মানবতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ভারতবর্ষে ধর্মে এবং সমাজে নারীরা সবচেয়ে অবহেলিত ও উপেক্ষিত জাতি। তাঁরা অন্দর মহলে অবরুদ্ধ, অধিকার হীনতায় নিষ্পেষিত, বাল্যবিবাহে অপরিণত, বা বৈধব্যে মনোব্যথিত, কৌলিন্য প্রথায় নির্যাতিত, শিক্ষা বঞ্চিত এবং সহমরণে চিতায় আরোহিত। এসব নারীদের প্রতি বিদ্যাসাগরের ছিল গভীর মমত্ববোধ ও সহানুভূতি। তাঁর চরিত্রের মানবতা সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলেন,

> "আমাদের এই মানুষের সমাজের দেবতার চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ মানুষ।... মানুষের পক্ষে এ সমাজে দেবতায় রূপান্তরিত হওয়া যত সহজ, মানুষ হওয়া তত সহজ নয়। আজও আমাদের সমাজে, বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বিপ্রহরকালে, অতিমানুষ ও মানবদেবতার মধ্যে দেবত্বের বিকাশ যত স্বল্পায়াসে হয়, সামাজিক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ আদৌ সেভাবে হয় না। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে, আমাদের এই সমাজে তাই যখন দেখতে পাই বিদ্যাসাগরের মতন একজন মানুষ পর্বতের মতন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, কোনো অতিমানবিক অলৌকিক শক্তির জোরে নয়, সম্পূর্ণ নিজের মানবিক শক্তির জোরে, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।"[৭১]

বিদ্যাসাগর স্বভাবজাত অন্তরলালিত মানবতায় সমাজ থেকে বিদূরিত করতে চেয়েছেন সনাতনী অন্ধত্ব আর জাতিকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন আধুনিক শিক্ষার মানবীয় মূল্যবোধে। নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁকে নানাবিধ বাধা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সে সময়ে নারীসমাজে শিক্ষা গ্রহণের বিরূপ মনোভাব প্রত্যক্ষ করা যায় জনৈক নারীর এ উক্তিতে– "ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখা-পড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন যে, লেখাপড়া যদি স্ত্রী-লোক করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।"[৭২] ধর্মান্ধ কুসংস্কারপ্রিয় অজ্ঞ নারীকে আধুনিক জীবনবোধে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছেন। তিনি নারী মঙ্গলার্থে পুরুষের বহুবিবাহ রোধ করেছেন এবং বাল্য বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। এমনকি নিজ পুত্রের সঙ্গে বিধবার বিবাহ দিয়েছেন। বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে সেকালে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত ছিল। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করে দেখিয়েছেন বিধবা বিবাহ মানবকল্যাণে প্রয়োজন–

> "পরাশর কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে তিন বিধি দিতেছেন, বিবাহ, ব্রহ্মচর্য, সহগমন। তন্মধ্যে রাজকীয় আদেশক্রমে, সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিধবাদিগের দুইমাত্র পথ আছে, বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য, ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা হয় ব্রহ্মচর্য করিবেক। কলিযুগে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই, লোকহিতৈষী, ভগবান, পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়েছেন। সে যাহা হউক, স্বামীর অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য

ঘটিলে, স্ত্রী লোকের পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, কলিযুগে, সেই সেই অবস্থায়, বিধবার পুনর্বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য কর্ম বলিয়া অবধারিত হইতেছে।"[৭৩]

বিদ্যাসাগরের মানবতাবোধ প্রথাবদ্ধতা ভেঙ্গে ধর্মীয় কুসংস্কারে আঘাত করেছে। যদিও ধর্ম সংস্কার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। পূর্বেই বলেছি তিনি শাস্ত্রীয় ধর্মের ধার ধারেননি। কিন্তু মানবতার অবক্ষয়ে তাঁর অন্তরাত্মাজাত তাগিদ সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় প্রচলিত ধর্মকেই আঘাত করেছে।

উনিশ শতকের বাংলায় মিশনারিদের খ্রিস্টধর্ম প্রচার, ব্রাহ্মদের একেশ্বরবাদী চেতনার আলোড়ন, প্রকাশ্যে ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সরাসরি বিদ্রূপ ও কটাক্ষ এবং বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারে শাস্ত্রীয় যুক্তিতে ধর্মীয় অনুশাসনের ভঙ্গুর অবস্থায় হিন্দু ধর্ম যখন কোণঠাসা হয়ে (অস্তিত্ব সংকটে) পড়ে, তখন সর্বধর্মের সমন্বয়ে মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ঘটিয়েছেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। অধ্যাপক ডি. এস. শর্মা তাঁর Hinduism Through The Ages গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন,

"আধুনিককালে ভারতবর্ষে যতগুলি ধর্মমত উদ্ভূত হয়েছে, তাদের মধ্যে অন্য আর কোন ধর্মমত নেই যা অতীতের প্রতি এতটা অনুগত এবং ভবিষ্যতের জন্য এত সম্ভাবনাময়, –যা আমাদের জাতীয় চেনতার মধ্যে এত বদ্ধমূল এবং তথাপি দৃষ্টিভঙ্গিতে অতি উদার এবং সার্বজনীন...।

শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন তাঁর স্বকীয় তপস্যার মহিমায় হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় অনুপম ব্যক্তিত্ব। কারণ, তাঁর শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য অতি সামান্য হলেও তিনি নিজস্ব তপস্যার বলে সমস্ত ধর্মের সত্যেরই অনুভব ও উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর নিজস্ব প্রমাণের দ্বারা হিন্দু–শাস্ত্রসমূহের সত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"[৭৪]

রামকৃষ্ণ বহুদেববাদ, প্রতিমাপূজা, গুরুপূজাসহ পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে সমর্থন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে পৌরাণিক দেবদেবী এক ঈশ্বরের বিবিধ গুণের প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর ধর্মমতে বৈদান্তের অদ্বৈতবাদ পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাঁর জীবন ও উপদেশাবলীর ক্ষেত্রে ঐ দর্শন সত্তাকে সম্পৃক্ত করেছেন। বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন এবং মুক্তির উপায় হিসেবে মনুষ্য সেবার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।[৭৫] জগতের প্রতিটি সৃষ্টি, প্রতিটি জীবের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব। জীবসেবায় অন্তরোপলব্ধির গভীরতম অনুভবে ঈশ্বরের দর্শন মিলে। তাই তিনি তাঁর ভক্তদের কাছে বার বার শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র[৭৬] কথা ব্যক্ত করেছেন। যার প্রতিধ্বনি তাঁর অন্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও আমরা পাই। স্বামীজী বলেছেন, "জীবে প্রেম করে যে জন সে জন সেবিছে ঈশ্বর।"

নব্য হিন্দুবাদের প্রবক্তা রামকৃষ্ণ অতি উচ্চ মার্গের আধ্যাত্মিকতার অধিকারী ছিলেন। ঈশ্বরোপলব্ধি এবং ঈশ্বরের বিচিত্ররূপ অনুভবে বিচিত্র সাধন পদ্ধতি অবলম্বনে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। তিনিই ধর্ম সাধনায় প্রথম ব্যক্তি যিনি কালী উপাসনা করেছেন আবার খ্রিস্টান ও মুসলিম পদ্ধতিতে ধর্মোপাসনা করে বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র রূপ-রস আস্বাদ করেছেন। তিনি তাঁর ভক্তদের বলতেন "জানিবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ"[৭৭] রামকৃষ্ণ সকল ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সর্বধর্ম সমন্বয়ের অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন সকল ধর্মে মানবসত্তার একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর উপলব্ধি। ধর্মমত পথ ভিন্ন হলেও সকলেই এক ও অভিন্ন ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের প্রত্যাশী। তাঁর এ সার্বজনীন ধর্মচিন্তা উদার মানবতাবাদেরই পরিচায়ক। স্বামী স্বাহানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ মনুষ্যজীবনে আধ্যাত্মিক অনুভবকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এটাই জীবনের মূল লক্ষ্য। তিনি ক্রিয়াকাণ্ড, যাগযজ্ঞ, ও দার্শনিক মতামতের ভাবনা থেকে আসল বস্তুকে পৃথক করে দেখিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি সব ধর্মমতের সত্যতাকে স্বীকার করেছেন। এর দ্বারা তিনি ধর্মকে উদার করেছেন– তাদের ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গিকে প্রসারিত করেছেন।"[৭৮]

মানবতাবাদকে সমুজ্জ্বল রেখে সনাতন হিন্দু ধর্মে নতুনত্ব সংযোজনে এক বিস্ময়কর প্রতিভার নাম বিবেকানন্দ। তিনি রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদে বিশ্বাসী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন। একদিকে পাশ্চাত্য আধুনিক জীবনবোধ ও মানবিক প্রেরণা, অন্যদিকে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বোধিত হয়ে বিবেকানন্দ নব্য বেদান্তের উদ্ভব ঘটিয়ে নব্য হিন্দুবাদের প্রবর্তন করেন। নব্য হিন্দু ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল সনাতনী অবয়বেই হিন্দু ধর্ম ও সমাজের গৌরবান্বিতকরণ এবং ভারতীয় সংস্কারক ও উইরোপীয় মিশনারিদের বৈরীভাবাপন্ন সমালোচনার বিরোধিতা করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।[৭৯] বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের পুনর্ব্যাখ্যাত ধর্মকে একটি মাতৃধর্মরূপে প্রকাশ করেন এবং হিন্দু ধর্মের বহু সংখ্যক সম্প্রদায় ও মতবাদের মধ্যে এক নতুন ঐক্য আনয়নের প্রয়াস পান। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে ধর্মসভায় (Parliament Of Religions) 'যত মত তত পথ' তুলে ধরে সর্বধর্মের সমন্বয়ের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের অতীত ঐতিহ্য, গৌরব ও সম্মান বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। তাঁর মতে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে নিহিত। হিন্দু ধর্ম অজেয় এবং ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার সঙ্গে তুলনীয় এ কথা তিনি বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে ব্যক্ত করেছেন-

> "তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো ওটা কল্পনা, ভারতেও বল আছে, মান আছে-এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।"[৮০]

ভারতীয় সভ্যতাকে স্বামীজী আর্য সভ্যতা বলেছেন এবং হিন্দু শাস্ত্রসমূহকে পরমসত্য বলে মনে করেছেন।

“ঐ যে ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেছেন যে, আর্যরা হ’তে থেকে উড়ে এসে ভারতের ‘বুনো’দের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন–ও-সব আহাম্মকের কথা... ... কোন্ বেদে, কোন্ সুক্তে, কোথায় দেখেছে যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি? আর রামায়ণ পড়া তো হয়নি, খামকা এক বৃহৎ গল্প – রামায়ণের উপর– কেন বানাচ্ছ?”[৮১]

আজকের যুগে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত সত্যকে তিনি স্বীকার করেননি। খ্রীস্টপূর্ব ১৭৫০ সাল বা তার কিছুটা পরে আর্যদের ভারতবর্ষে আগমন ঘটে। আর্য জাতি এদেশে আসার পূর্বে ভারতবর্ষ ছিল একটি সভ্যজাতির আবাসস্থল। আর্যরা সিন্ধু সভ্যতার মানুষের চেয়ে পশ্চাৎপদ হলেও তারা দ্রুতগামী অশ্ব এবং অশ্বচালিত রথ বাহিত হয়ে লৌহ নির্মিত বর্ম এবং নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের পরাজিত করে তাদের দ্রাবিড় সভ্যতা ধ্বংস করে।[৮২] পরবর্তী সময়ে আর্যরা ভারতের নগর সভ্যতার ধারণার সাথে গ্রাম সভ্যতার সমন্বয়ে নতুন সভ্যতার জন্ম দেয়। ঐতিহাসিক এ সত্যকে স্বামীজী আহম্মকদের কথা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। বিবেকানন্দ ছিলেন মূলত ধ্যানস্থ আধ্যাত্মিক সাধক। ভক্তিরঞ্জন দৃষ্টিতে তিনি হিন্দুধর্ম ও দেবদেবীর সর্বজয়ী, সর্বব্যাপী শক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। নিরপেক্ষ ভাব বলয়ে তাঁর জীবনবোধ আবর্তিত হয়নি। তাই তাঁর চেতনায় বাস্তব সত্য গৌণ, উপনিষদের আধ্যাত্ম্য ভাবনাই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। বিদ্যাসাগর যেখানে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে আজীবন সংগ্রাম করেছেন, সেখানে তিনি শাস্ত্রীয় বিধির পক্ষে ছিলেন। বাল্যবিবাহ সমর্থনে তিনি বলেন-

“কখনো কখনো আমাদের মধ্যে বাল্যবিবাহও হয়। কেন? কারণ আমাদের বর্ণ এই বিধান দিয়াছে, বিয়ে যদি দিতে হয়, ছেলে মেয়ের মধ্যে প্রেমবোধ জাগার আগে তাদের মত না নিয়েই বাল্যকালে তাদের বিবাহ দেওয়া উচিত। বেশী বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকলে তারা আপন আপন পছন্দমত প্রেমাস্পদকে বেছে নেবে। তার ফলে বিপদ ঘটতে পারে। তাই বর্ণ বলে, এটা বন্ধ করা উচিত।”[৮৩]

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বলেন,

“আমি ভারতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু বিধবাদের প্রতি যেরূপ নির্যাতনের কথা প্রচার করা হইতেছে, ঐরূপ একটিও দেখিতে পাই নাই।”[৮৪]

শাস্ত্রীয় অনুশাসন সমর্থনে বিবেকানন্দ কখনো কখনো Aggersive Hinduism[৮৫] প্রচার করেছেন। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিবেকানন্দের অনন্যতা হলো হিন্দু ধর্মে মানবতার প্রতিষ্ঠা। রামকৃষ্ণের মতোই তিনি বেদান্তে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। “বুভুক্ষু মানুষ, নির্যাতিত মানুষ,

নিরক্ষর মানুষ এবং পীড়িত মানুষ, পুরুষ, স্ত্রী, ধর্মপ্রাণ মানুষ কিংবা পাপ মলিন মানুষ যে কোন মানুষ ছিল তাঁর কাছে মুখোশ পরা নারায়ণ"[৮৬] সুতরাং মানব সেবা মানেই তার কাছে নারায়ণ সেবা। আর এ বোধ জাগ্রত হয় ১৮৯১ সালের উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ভারতের তীর্থযাত্রায় এদেশবাসীর শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন-

> "দেশ ভ্রমণের ফলে স্বামীজী ঘনিষ্ঠভাবে দেশের সকল শ্রেণির লোকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইলেন। উৎপীড়িত, অসহায় ভারতবাসী জনসাধারণের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতাজনিত কুসংস্কার এবং ধনীর ধর্মজ্ঞানহীনতা, বিলাস ব্যসন প্রভৃতি ছায়াচিত্রের মত তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত হইল। তিনি দেখিলেন, রাজা মহারাজা এবং উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবে নিজেদের অতীত সংস্কৃতি ও গৌরব বিস্মৃত হইয়াছে এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি উভয়ই বিসর্জন দিয়াছে। ইহার ফলে স্বামীজীর জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল।"[৮৭]

তিনি হতদরিদ্র ভারতবাসীর কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। নির্যাতিত, নিপীড়িত, হতভাগ্য মানুষের শিক্ষা ও অন্ন সংস্থান বাস্তবায়নে তিনি ব্রতী হয়েছেন। আধ্যাত্ম্যবাদী এ ধ্যানী পুরুষ শেষ জীবনে মানব সেবায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি নারীশিক্ষা, নারী মর্যাদার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জাতিভেদে নিম্ন বর্ণের অস্পৃশ্যতাকে মেনে নেননি। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সবই তাঁর কাছে পূজনীয়। মানবতার অবক্ষয়ে তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠেছে। হিন্দু ধর্মে এ মানবতা প্রতিষ্ঠাই আধুনিক হিন্দুধর্মের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে।

চ. রেনেসাঁসের ধারায় নবতর চেতনার উন্মেষ

শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা- চেতনা, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তনে উনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট বাংলার জাগরণ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। তবু এ জাগরণকে কেন্দ্র করে যে বাক-বিতণ্ডার জন্ম হয়েছে তাঁর মূল আলেচ্যসূচি 'রেনেসাঁস'। কেউ কেউ ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণকে বাংলার 'রেনেসাঁস' বলেছেন। আবার কারো কারো মতে, ভারতবর্ষ তথা বাংলায় আদৌ কোনো রেনেসাঁস ঘটেনি; পাশ্চাত্য ভাবধারার নব আলোয় বাংলার ঘুম ভেঙ্গেছিলো মাত্র।

রেনেসাঁস কী; কীভাবে রেনেসাঁসের সূত্রপাত; রেনেসাঁসের বিকাশ; বাংলায় রেনেসাঁস ঘটেছিল কিনা; না ঘটলে বাংলার জাগরণের সঙ্গে ইতালির রেনেসাঁস কীভাবে সম্পর্কিত প্রভৃতি আলোচনার মাধ্যমে উনিশ শতকী বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক অভ্যুদয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারি–

জীবন ও জগৎ সম্পর্কীয় নব দৃষ্টিভঙ্গি পনেরো-ষোল শতকের ইতালিতে এনেছিলো এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সমাজ পরিবর্তনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নয়; এ বিপ্লব ঘটেছিল ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলাসহ সংস্কৃতির বিচিত্র পথে। সমাজ পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক এ প্রক্রিয়াকে ফরাসি ঐতিহাসিক জুল মিশেলে ১৮৫৫ সালে তাঁর 'ফ্রান্সের ইতিহাস' গ্রন্থে নাম দিয়েছেন 'রেনেসন্স' বা পুনর্জন্ম।[৮৮] পুনর্জন্ম শব্দটি একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পুনর্জন্ম শব্দটির অর্থ পুণরায় জন্ম। অর্থাৎ আগের বা প্রথমবারের জন্মকে এখানে স্বীকার করা হচ্ছে। তাহলে দেখা যায়, ইতালিতে পনের-ষোল শতকে যে বিপ্লব ঘটেছিল তা তার ভিত্তি ভূমির অতীত প্রেরণা থেকে উৎসারিত হয়েছে।

প্রাচীন গ্রীস ও রোম ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রযুক্তি-দর্শন, স্থাপত্য-শিল্পকলা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাদপীঠ। সে সময়টাকে বলা হয় ধ্রুপদী যুগ। প্রাচীন কালের সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে পাঁচটিই ছিলো সেই সময়ে গ্রীসের ভাস্কর এবং স্থপতির সৃষ্টি। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে কবি হোমারের 'ইলিয়াড' আর 'অডিসি' মহাকাব্য। প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সেই সময়েই। অ্যাস্কাইলাস (খ্রিপূ ৫২৫?-৪৫৬), সফোক্লিস (খ্রিপূ ৪৯৬?-৪০৬), ইউরিপেদিস (খ্রিপূ ৪৮০?-৪০৬) এবং এরিস্তোফেনিসের (খ্রিপূ ৪৪৮?-৩৮০) মতো সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে প্রাচীন গ্রীসে। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পাঁচ দার্শনিক– প্রোতাগরাস (আনু খ্রিপূ ৪৯০-খ্রিপূ ৪২০), সক্রেটিস (খ্রিপূ ৪৭০-৩৯৯), প্লেটো (খ্রিপূ ৪২৭-৩৪৭), এরিস্টটল (খ্রিপূ ৩৮৪-৩২২) এবং এপিকিউরাস (খ্রিপূ ৩৪১-২৭০)। প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিলেন পেথাগরাস (মৃত আনু খ্রিপূ ৪৯৭), ইউক্লিদ (খ্রিপূ ৩০০) আর্কেমেদিস (খ্রিপূ ২৮৭-২১২)। সে যুগে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পী ইক্তিনোস (খ্রিপূ পঞ্চম শতাব্দী), কালিক্রাতাস (খ্রিপূ পঞ্চম শতাব্দী), ফিদিয়াস (আনু খ্রিপূ ৪৮০- খ্রিপূ ৪৩০) ছিলেন জগৎ বিখ্যাত।[৮৯] অন্যদিকে, রোম একনায়ক শাসিত রাস্ট্র ব্যবস্থায় সামরিক শক্তিতে প্রবল ক্ষমতা অর্জন করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৪৬ সালে গ্রীস রোমের আধিপত্য স্বীকার করে নেয়। সূচনা হয় গ্রেকো-রোমান যুগের। গ্রীস ও রোমের জীবনবাদী ধর্মবোধ, উন্নত মানবিকতা, জীবন সম্পর্কীয় শৈল্পিকচেতনা পরস্পরের জন্য ছিল আর্শীবাদ স্বরূপ। ফলে উন্নতর সভ্যতা, উন্নতর সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমের খ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে।

কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মের আবির্ভাব এবং প্রসারের ফলে গ্রীস ও রোমের স্বাভাবিক শৈল্পিক বিকাশ ব্যাহত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ভাটা পড়ে। মানবমুখীন, ইহলৌকিক ও প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় পারলৌকিক ধর্মীয় বিধিবিধান। মানুষ অদৃষ্টবাদী জীবনবিমুখ কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়। "খোদ গ্রীসেই গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। প্লেটোর মতো দার্শনিক, হোমারের মতো কবি হারিয়ে যান। তাঁদের সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত গ্রীসে নয়, রক্ষা পায় বাইজেন্টাইন এবং আরব পণ্ডিতদের কাছে। গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন মধ্যযুগের প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। পৃষ্ঠপোষণার অভাবে ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাহিত্য এবং চিত্রকলার চর্চা ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং এসবের বিচার করা হয় নতুন যুগের পশ্চাদ্‌মুখী মূল্যবোধের পরিপেক্ষিতে। ফলে ধর্ম নিরপেক্ষ-, ইহলোক- এবং মানবিক-সৌন্দর্যভিত্তিক শিল্পকর্ম জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে।"[৯০] যে গ্রীক সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-স্থাপত্য-শিল্পকলায় উন্নত সংস্কৃতিকে লালন করে সভ্যতার চরমতর বিকাশকে ধারণ করেছিলো মাত্র কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে তা অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস শুরু হয়েছিলো ধ্রুপদী যুগের সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের পুণরুদ্ধার দিয়ে। হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতগণ তাঁদের গবেষণা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে ধ্রুপদী যুগের সৃষ্টিকে পুণরায় উদ্ধার করতে শুরু করেন। এখানেই তাঁরা তাঁদের কার্যকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ধ্রুপদী জ্ঞান এবং উন্নতবোধের মাধ্যমে তাঁরা মধ্যযুগীয় মূল্যবোধকে আলোকিত করতে থাকেন। ধ্রুপদী পণ্ডিতদের রচনা উদ্ধার, ধ্রুপদী ভাষা চর্চা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাঁদের রচনা সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়ার মহান দায়িত্ব হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতরা পালন করেছিলেন। ফলে খুব ধীরে ধীরে চার শতাব্দী ধরে মানুষের মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ পরিবর্তিত হতে থাকে। ধর্মভাবনায় আবার আসে জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, ভেঙ্গে যায় মধ্যযুগীয় প্রথাবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থা, মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সাহিত্য তথা সৃষ্টিকর্ম ঈশ্বর ভাবালুপতা ছেড়ে বাস্তবতায় নিমগ্ন হয়, প্রকৃতি হয়ে উঠে সৌন্দর্যের প্রতীক, দর্শন চর্চায় জীবনবোধে সমৃদ্ধি আসে, অতীত ঐতিহ্য আবিষ্কারের সাথে যোগ হয় বহির্বিশ্ব আবিষ্কার– সব মিলিয়ে ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনায়, জীবনযাপনে, ধর্মভাবে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সৃজনশীলতার পথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক এ পরিবর্তন ইউরোপীয় রেনেসাঁস নামে খ্যাত। ইতালির স্বাধীন-নগর রাষ্ট্রগুলোতে বিশেষ করে ফ্লোরেন্সে রেনেসাঁসের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। পরবর্তী সময়ে তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাংলায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার অবারিত হয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁর ঢেউ বাংলার অঙ্গনকেও প্লাবিত করে। বাঙালির নিস্তরঙ্গ গতানুগতিক প্রথাবদ্ধ জীবনে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। চিন্তা-চেতনে, মেধা-মননে নব্য শিক্ষিত বাঙালি নতুনকে ধারণ করে অতীত ঐতিহ্য সন্ধানী হয়। এখানে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমত; ইউরোপের মধ্যযুগীয় অন্ধকার বিদূরিত করার অভিপ্রায়ে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তা মূলত গ্রীসের ধ্রুপদী সাহিত্য-সংস্কৃতিজাত প্রেরণা থেকে এসেছিল। আর বাংলায় অতীত অভিমুখে যাত্রার প্রেরণা ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে ধারাবাহিকভাবে আসেনি। সাম্রাজ্য সুদৃঢ়করণের অভিযাত্রায় ইংরেজরাই প্রথম অতীত ঐতিহ্য সন্ধানী হয়ে উঠেছিলো। দ্বিতীয়ত; ইউরোপে

রেনেসাঁস এনেছিলেন ইউরোপীয় পণ্ডিত ও গবেষক হিউম্যানিস্ট দল। আর বাংলার জাগরণের পেছনে কোনো বাঙালি ব্যক্তি নন; ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি, সে যুগে প্রতিষ্ঠিত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মানবতাবাদী কয়েকজন ইংরেজ ছিলেন সক্রিয়। তৃতীয়ত; ধ্রুপদী যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, শিল্পবোধ সমগ্র ইউরোপের চেতনায় পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু বাংলায় পরিবর্তন এসেছিল আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণির কিছু নাগরিক জীবনে। চতুর্থত; রেনেসাঁসের ব্যাপকতায় ইউরোপের শিল্পকলায় যে যুগান্তর ঘটেছিল বাংলার শিল্প চর্চায় তেমনটা দেখা যায়নি। সুতরাং সামগ্রিক অর্থে রেনেসাঁসের প্রতিফলন বাংলায় ঘটেনি। তবে ইউরোপীয় বিজ্ঞান-মনস্বকতা, জীবন-দর্শন, যুক্তিবাদ, জীবনজিজ্ঞাসা-আত্মজিজ্ঞাসায় ব্যক্তি-সাতন্ত্র্যের উদ্বোধন, স্বদেশপ্রেম, মানবিকতা প্রভৃতির আত্তীকরণে বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটেছে তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

এ প্রসঙ্গে সফিউদ্দিন আহমদ 'তাঁর ডিরোজিও : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলেন,

> "ইউরোপীয় রেনেসাঁর যে বিশালতা ও ব্যাপকতা, চিত্তমুক্তি ও আত্মমুক্তির যে গভীরতা ও বিস্তৃতি এবং সাহিত্য শিল্প ও দর্শনের, জীবনবোধ ও অসাম্প্রদায়িক মানব সম্প্রীতির যে উদারতার উজ্জ্বল উচ্চারণ সমগ্র বিশ্বকে আন্দোলিত করেছে, সমগ্র পৃথিবীকে পাল্টিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশে উনিশ শতকের নবজাগরণে তা এসেছে অনেকটাই খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধতায়। অর্থাৎ ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানের ফলে, গ্রীক–রোমক শিল্প, সাহিত্য, দর্শনের প্রভাবে এবং নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, ভৌগোলিক আবিষ্কার ও শিল্প বিপ্লবের ফলে বিশ্বপ্লাবী যে উদার মুক্তির উল্লাস, মানব মহিমার যে ভাস্বর প্রভাব উনিশ শতকের জাগরণ সেভাবে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী দার্শনিক ও আত্মিক এবং বৈজ্ঞানিক, বৌদ্ধিক ও মনন জাগরণে ছড়িয়ে পড়েনি। তবে খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে হলেও আমাদের অবশ্যি স্বীকার করতে হবে যে–
>
> জ্ঞানবিজ্ঞান ও মানবচৈতন্যে, সাহিত্য-শিল্প ও দর্শনে, প্রতিবাদী ও বিবেকী চেতনায় এবং মানবিকতাবোধ ও আধুনিকতার উৎসারণে এ যুগ যথার্থই বাঙালির চিত্তজাগরণ ও আত্মজাগরণের যুগ এবং এ যুগ প্রকৃতপক্ষেই বাংলা ও বাঙালির নবজাগরণের যুগ।"[৯১]

বাংলার নবজাগরণের পথযাত্রা ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কিছু প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুরু হলেও বাস্তবিক এর বিকাশ ঘটেছিল বাঙালিরই হাতে। "রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এমন কয়েকজন মানুষ দেশে জন্মেছেন যাঁদের বলা যেতে পারে রেনেসাঁস যুগের মানুষ। এঁরা না হলে রেনেসাঁস হতো না, রেনেসাঁস না হলে এঁরা হতেন না।"[৯২]রেনেসাঁসের ভাব, চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে এদেশে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন ইংরেজরা। সুতরাং বাংলার জাগরণের ক্ষেত্রে বাঙালির পাশাপাশি বিদেশীদের অবদানকেও স্বীকার করতে হয়। অবশ্য বাঙালির একল্যাণে নয়, বাঙালিকে আধুনিক করার মানসেও নয়, ভারতে সাম্রাজ্য আগ্রাসনকে সুদৃঢ় করার লক্ষে ইংরেজরাই খুঁজে নিয়েছিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ। কখনো ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য, কখনো স্বজাতিকে বাংলায় শিক্ষিত করার প্রয়োজনে, কখনো কৌতূহল নিবারণের অভিপ্রায়ে তাঁরা যেসব কর্মপ্রয়াস

চালিয়েছিলেন, তাতেই ধীরে ধীরে বাঙালি লালন করতে শুরু করে আধুনিক বোধ। এর পদযাত্রা শুরু হয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে উইলিয়াম জোন্সের নেতৃত্বে তিরিশ জন উচ্চশিক্ষিত ইংরেজকে নিয়ে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি।[৬৩] এ সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, স্থাপত্য প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করা। দীর্ঘদিন গবেষণার পর উইলিয়াম জোন্স ভাষা সংক্রান্ত এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। বিভিন্ন সূত্র ও তথ্যের সমন্বয়ে তিনি দেখালেন যে, বাংলা সহ উত্তর ভারতীয় ভাষা সমূহ সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত। আর সংস্কৃত ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। শুধু উইলিয়াম জোন্স নয়, অন্য পণ্ডিতদের গবেষণায়ও প্রাচীন ভারত সম্পর্কে অজানা অনেক তথ্য উঠে আসে। এশিয়াটিক সোসাইটির কল্যাণে ভারতবর্ষের ধ্রুপদী সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শন, ঐতিহ্য, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি আবিষ্কারে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি গুণীজন সংস্কৃত সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে অনুবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকেন।

১৮০০ সালে সিভিলিয়ানদের এ দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এ কলেজে নিয়োজিত অধ্যাপকবৃন্দ শিক্ষার উপযোগী পাঠ্য পুস্তক ও অভিধান রচনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। ফলে তাঁরা প্রাচীন ভারতের ভাষা ও ধ্রুপদী সাহিত্যের দ্বারস্থ হন। এভাবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য তাঁর আপন মহিমার স্বগৌরব ঘোষণা করে। এ সময় কলকাতায় আসেন বহুভাষাবিদ রাজা রামমোহন রায়। সংস্কৃত ছাড়াও আরবি, ফারসি, হিন্দি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় তিনি দক্ষ ছিলেন। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। সূফী সাধক ও যুক্তিবাদী মুতাজিলা দর্শনকেও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব তাঁর মনে একেশ্বরবাদের জন্ম দিয়েছিল। ‘তুহফাতুল মোয়াহেদীন’ (১৮০৩), ‘বেদান্ত গ্রন্থ’ (১৮১৫), ‘কেনোপনিষৎ’ (১৮১৬), ‘ঈশোপনিষৎ’ (১৮১৬), ‘কঠোপনিষৎ’ (১৮১৭), ‘মাণ্ডুক্যোপনিষৎ’ (১৮১৭), ‘গায়ত্রীর অর্থ’ (১৮১৮), ‘মণ্ডুকোপনিষৎ’ (১৮১৯) প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি একেশ্বরবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে রচনা করেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা তাঁর তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্র বেদ ও উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে যুক্তির মাধ্যমে তাদের বিরোধিতার জবাব দেন। তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারায় অবগাহন করেছেন। যুক্তিবাদ, উদার মানবিকতা তাঁর চেতনাকে করেছে শাণিত। ১৮১৫ সালে তিনি কলকাতার ধনিকশ্রেণিকে নিয়ে স্থাপন করেন ‘আত্মীয় সভা’। বেদান্ত আলোচনার পাশাপাশি এখানে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি আলোচনার আসর বসত। প্রাচীন শাস্ত্রের পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্মের সংস্কার শুধু নয়; তিনি ধর্মীয় অনাচারে বিপর্যস্ত সামাজিক জীবনে মানবিকতার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রকট অত্যাচারে নিষ্পেষিত মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করা ছিল তাঁর সমাজ সংস্কারের মর্মকথা। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় তিনি বাঙালি চিত্তে মানবতা, উদারতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে প্রথাবদ্ধ সমাজ অবরুদ্ধতাকেই আঘাত করেছেন। এজন্য তাঁকে বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ বলা হয়।

১৮১৭ সালে এদেশীয়দের উদ্যোগে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। অল্পসময়ের মধ্যেই এ কলেজ বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাদপীঠ হয়ে উঠে। মুক্ত বুদ্ধি চর্চার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে এ কলেজের

শিক্ষক হয়ে আসেন ডিরোজিও। তিনি নিজে ছিলেন ইউরোপীয় বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী। টমাস পেইন, হিউম, গিবনের চিন্তা তাঁকে সংশয়বাদী করে তুলেছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহ্য তাঁর মধ্যে জন্ম দিয়েছিলো স্বাজাত্যবোধ।[১৪] ডিরোজিও মনে প্রাণে ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন। এদেশের পরাধীনতা, যুক্তিহীনতা, সামাজিক অন্ধতা তাঁকে পীড়িত করেছিলো। তিনি তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মুক্ত আলোচনা করতেন এবং তাঁদেরকেও মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ যোগাতেন। ঠিক একই কাজ করেছিলেন আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস। সক্রেটিস দর্শনচর্চার মাধ্যমে তাঁর ছাত্রদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে মুক্তচিন্তার আলোয় ব্যাপকতা দিয়েছিলেন আর উনবিংশ শতাব্দীতে এসে তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মনে মুক্তচিন্তার জাগরণ ঘটিয়েছেন। যা বাংলার নব জাগরণকে তরান্বিত করেছে বহুগুণ।

ডিরোজিওর ছাত্ররা (ইয়ংবেঙ্গল দল) আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নির্জীব বাঙালির চিন্তার ভিতকে নাড়িয়ে দিলেন। গতানুগতিক জীবনভাবনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তাঁরা সমাজের ভেতরের জরাজীর্ণতাকে সাফ করতে চাইলেন। তাঁরা বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে, প্রত্রিকা প্রকাশে, সভা-সমিতির বক্তব্যে বাংলায় প্রগতিশীলতার বিপ্লব ঘটাতে চাইলেন। কিন্তু তাঁদের ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ, ব্রাহ্মণ্য বিদ্বেষ, সামাজিক বিদ্রোহ, অধিকার সচেতনতা, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বদেশপ্রেম, মানবতাবোধ প্রভৃতি সে সমাজ সুনজরে দেখেনি। বলা যায়, তাঁদের প্রগতিশীলতাকে বোঝার কিংবা ধারণ করার মতো মানসিকতাই সে সমাজের গড়ে উঠেনি। ইয়ংবেঙ্গল দল প্রগতি সংক্রান্ত যে উচ্চবোধ লালন করতেন তা কখনো কখনো বর্তমানের আধুনিকতাকে ছাপিয়ে যায়। আর উত্তরাধুনিকতার উচ্চবোধকে সে যুগের পশ্চাৎপদ বাঙালি সমাজ ধারণ করতে সক্ষম হবে না এটাই স্বাভাবিক।

ডিরোজিওর ভাবশিষ্য মধুসূদন ইউরোপীয় রেনেসাঁসকে আত্তীকরণ করে বাংলা সাহিত্যের অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে তাঁর কাব্যে প্রথম ঘোষিত হয় মানবতার জয়গান। স্বদেশপ্রেম, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, প্রকৃতি চেতনা, নারী অধিকার সচেতনতা ও ছন্দের বিচিত্র নিরীক্ষায় তিনি কাব্যের ভাব ও আঙ্গিকে বহুমাত্রিকতা যোগ করেন। এজন্য বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মানসপুত্র বলা হয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বদৌলতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সূত্র ধরেই ঘটিয়েছেন বাংলার জাগরণ।

প্রাচীন গ্রীসে ধ্বনিত হয়েছিল মানবতার জয়গান। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম প্রসারের ফলে জীবনমুখী মানবিকবোধ আত্ম-সমর্পণ করে ঈশ্বর সাধনায়। ধর্মের কঠোর বিধিবিধান ও আনুষ্ঠানিকতার কাছে ইহজাগতিক চেতনা পরাজিত হয়। রেনেসাঁসের ফলে ইউরোপীয় চেতনায় মানবিক বোধ আবার ফিরে আসে স্বগৌরবে। বাংলার প্রাচীন মধ্যযুগ জুড়ে ছিল দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন ও অলৌকিক শক্তির বিবরণ। জীবন-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ধর্মীয় বিধিবিধানে ছিল অবরুদ্ধ। কখনো কখনো কবি সাহিত্যিকদের মনে মানবীয়বোধ দেখা দিলেও তা ছিল দূর্বল আলোর ক্ষীণ রশ্মির মতো। উনিশ শতকে বাংলার সমাজজীবনে, সাহিত্যে, ধর্মবোধে রেনেসাঁসীয় অনুপ্রেরণায় মানবিক চেতনা আপন স্থান করে নেয়। আকাশবিহারী কল্পলোক থেকে মানুষের

চিন্তা নেমে আসে মাটির পৃথিবীর জাগতিক ধুলো-বালিতে। পারলৌকিক অধ্যাত্ম ভাবনা জীবনমুখী ভাবনায় রূপান্তরিত হয়। মানুষের কল্যাণে ধর্ম। ধর্মের মূল বাণীকে সামনে রেখে রিফর্মেশন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। সাহিত্যেও উচ্চকিত হলো মানবের মাহাত্ম্য। জীবনের আনন্দ-বেদনা, জটিলতা এমনকি মানবমনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সাহিত্যে রূপ পেল। সাহিত্যের বিচিত্র পথ-পরিক্রমায়– কবিতা (গীতিকবিতা, খণ্ডকবিতা, সনেট, মহাকাব্য, ছড়া প্রভৃতি), নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধে জীবন বর্ণনই মুখ্য হয়ে উঠল। সমাজ সংস্কারে মানবাধিকার প্রাধান্য পেল। উনিশ শতকের মানবিক পুরুষ বিদ্যাসাগর সামাজ সংস্কারে, শিক্ষা বিস্তারে, নারীর অধিকার প্রদানে, প্রতিভার পৃষ্ঠপোষকতায় এক প্রথিতযশা শিল্পী।

আধুনিক চেতনার প্রবহমানতায় বাঙালির মনে স্বদেশপ্রেম দানা বেঁধেছে। উনিশ শতকের আগে স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে বাঙালির তেমন কোনো ধারণাই ছিল না। সে প্রয়োজনও তাঁদের ছিল না। বাংলায় রাজতন্ত্র কায়েম থাকায় দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব রাজা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা বদল হয়েছে কিন্তু সাধারণের জীবনে চরম আনন্দ বা সংকট কখনোই আসেনি। যার ফলে স্বদেশপ্রেম তাঁদের জীবনে কখনো অঙ্গীভূত হয়নি। যে রাজাই এসেছেন পাল, সেন, মোঘল, ইংরেজ তাঁরা মেনে নিয়েছেন। এমনকি উনিশ শতকের প্রারম্ভে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী, নন্দকিশোর বসু, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, ব্রজমোহন মজুমদার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনকি ইয়ংবেঙ্গল দল যারা বাংলার এনলাইমেন্টের দায়িত্বে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সবাই ইংরেজ প্রভুভক্তিকে নিয়েছিলেন স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে। হয়তো এর পেছনে কারণ ছিল মুসলমানদের সুদীর্ঘ শাসন। মাইকেলের কাব্যেই প্রথম স্বদেশ প্রেমের উদাত্ত বাণী ঘোষিত হয়। বাল্মীকির রামায়ণের পরস্ত্রী হরণকারী রাবণ মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যে এসে দেশপ্রেমিক রাবণে পরিণত হলো। মধুসূদনের রাবণ চরিত্র বিনির্মাণ উনিশ শতকের বাঙালি চেতনার ধ্রুপদী স্বাক্ষর। রাবণ এদেশীয় অনার্য রাজা আর রাম বহিরাগত এবং পরদেশ আক্রমণকারী। রামের চরিত্রে ইংরেজ চরিত্রেরই প্রতিফলন ঘটেছে। রাবণের বলিষ্ঠ উচ্চারণ–

> "জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে
> যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক তারে!"[৯৫]

এ বোধ বাঙালির জীবনে অভিনব। একথা সত্য, প্রথম জীবনে মাইকেলেরও ইংরেজ মুগ্ধতা ছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, উনিশ শতকের প্রথম অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত আধুনিক অর্থে স্বদেশপ্রেম হয়তো জোরালো ভাবে কেউই অনুভব করেননি, কিংবা বাংলার মানস গঠনের জন্য তাঁরা কিছুটা সময় নিয়েছিলেন। একে শস্য রোপণের আগে আগাছা পরিষ্কার ও ক্ষেত্র প্রস্তুতি পর্ব বলা যেতে পারে। তবে ইয়ংবেঙ্গলের স্বাদেশিক চেতনা, মাইকেলের কাব্যের স্বদেশপ্রেম, বঙ্কিমের উপন্যাসে উচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে অনন্য ভূমিকা রেখেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য– অতীত ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সমন্বয়, রিফর্মেশন, এনলাইটমেন্ট, স্বদেশপ্রেম, মানবীয়বোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অধিকার সচেতনতা,

প্রকৃতিচেতনা উনিশ শতকের বাংলায় যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-বিজ্ঞান-ভাস্কর্য প্রভৃতি দিক থেকে বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে ঘটে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এদিক থেকে বাংলার জাগরণকে 'বাংলার রেনেসাঁস' বললে অত্যুক্তি হয় না। 'রেনেসাঁস' শব্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণকে বড় করে না দেখে এর ব্যাপ্তিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করলে 'রেনেসাঁস' সম্পর্কিত তর্ক বিতর্কের অবসান হতে পারে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বিকাশ ঘটেছিল প্রায় চারশ বছর ধরে। মধ্যযুগের তমসাচ্ছন্নতা থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণে তাঁরা প্রাচীন গ্রীস বা ধ্রুপদী যুগের সমৃদ্ধির কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। কারণ খ্রিস্টধর্মের প্রসারের ফলে সৃষ্ট মধ্যযুগের কারণে ধ্রুপদী যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের একটি বিচ্ছেদ বা ডিসকন্টিনিউটি ঘটেছিল। কিন্তু বাংলায় কোনো বিচ্ছেদ বা ডিসকন্টিনিউটি ঘটেনি। প্রাচীন-মধ্য যুগের চিন্তা-চেতনাকেই আমরা ধারাবাহিক ভাবে আধুনিক যুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত লালন করে এসেছি। আধুনিক যুগে এসে আমরা বরং একটি নতুন ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি যা আমাদের প্রাচীন-মধ্য যুগের নিস্তরঙ্গ ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সুতরাং 'রেনেসাঁস' শাব্দিক অর্থে পুর্নজন্ম হওয়ার সুযোগ বাংলায় ছিল না। কিন্তু একটি নব ভাবধারার হাত ধরে মাত্র একশ বছরে বাংলায় যে অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটেছিল তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

তথ্যসূত্র

১. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত; *বাংলা পিডিয়া;* খণ্ড-৩; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০১৩; পৃ.-১৭৪।

২, ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য; *বাংলাদেশের ইতিহাস;* নওরোজ কিতাবিস্তান; ৫, বাংলা বাজার; ঢাকা-১১০০; সপ্তম সং- নভেম্বর-১৯৯৮; পৃ.-৪২৬।

৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য;* বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ; প্রথম সংস্করণ-১৯৫৯; পরিশিষ্ট-৪৯১।

৪. ড. সফিউদ্দিন আহমদ; *বাংলা সাহিত্যের কাল ও কালান্তর;* প্রকাশ- জুন ১৯৯৮; পৃ.-১৫৩।

৫. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়; *রেনেসাঁসের আলোয় বঙ্গদর্শন;* কথা প্রকাশ; প্রথম প্রকাশঃ একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩; পৃ.-৮২।

৬. মোহাম্মদ হান্নান; *বাঙালির ইতিহাস;* আগামী প্রকাশনী কর্তৃক প্রথম বর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২; পৃ.-১১৮।

৭. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়; *পলাশি থেকে পার্টিশন;* প্রথম ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান মুদ্রণঃ ২০০৯; পৃ.-১৮১।

৮. মোহাম্মদ হান্নান; প্রাগুক্ত; পৃ.-১১৯।

৯. ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত;* মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড; ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট; পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ-১৯৯৫; পৃ- ২৭৮।

১০. রশীদ আল ফারুকী; *বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ;* বাংলা একাডেমি; ঢাকা; প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ ; পৃ.- ১৪১।

১১. মো. আবদুল্লাহ আল-মাসুম; *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার;* বাংলা একাডেমি ঢাকা; প্রথম প্রকাশ-জুন ২০০৮; পৃ.-৫৫।

১২, শ্রীভূদেব চৌধুরী; *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়);* পরিবর্তিত প্রথম দে.জ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর-১৯৮৪; পৃ.-৫।

১৩. হারুন-অর-রশীদ; বাঙালী ও বাংলাদেশ ০-২০০৫; হাসিনা প্রকাশনা ঢাকা; বর্ধিত সংস্করণ-ফেব্রুয়ারি ২০০৮; পৃ.-১৫১।

১৪. বিপানচন্দ্র ; *আধুনিক ভারতের ইতিহাস;* অনুবাদ-কৃষ্ণেন্দু রায়; ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড ২০০৯; প্রথম প্রকাশ- ২০১২; পৃ.- ১৫।

১৫. ঐ; পৃ.- ১৪।

১৬. সিরাজুল ইসলাম; *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা; দ্বিতীয় মুদ্রণ- নভেম্বর ১৯৮৯; পৃ.-১৪।

১৭. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত; বাংলা পিডিয়া; খণ্ড-১; প্রাগুক্ত; পৃ.-৪৪৭।

১৮. সিরাজুল ইসলাম; বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো; প্রাগুক্ত; পাদটীকা অংশ; পৃ.-১।

১৯. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত; বাংলা পিডিয়া; খণ্ড-১; প্রাগুক্ত; পৃ.-৪৪৭।

২০. হারুন-অর-রশীদ; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৩৫।

২১. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য; প্রাগুক্ত; পৃ.- ৩৭৩।

২২. সিরাজুল ইসলাম; বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠমো; প্রাগুক্ত; পৃ.-৫।

২৩. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য; প্রাগুক্ত; পৃ.-৩৭৩।

২৪. উদ্ধৃত; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক; *বাংলার ইতিহাস: ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব;* বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রথম পুনর্মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৯; পৃ.-৬৪।

২৫. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত; বাংলা পিডিয়া; খণ্ড-৬; প্রাগুক্ত; পৃ.-১০৯।

ফররুখ শিয়া (১৭১৩-১৯) মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্র-পৌত্র। তিনি তাঁর চাচা জান্দাহার শাহকে (১৭১২-১৩) পরাভূত করে দিল্লীর সিংহাসন আরোহন করেন। তিনি আজিম-উস-শান এর পুত্র। আজিম-উস- শান বাংলা, বিহার ও উরিষ্যার সুবাহদার ছিলেন।

২৬. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ; *ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসন);* গ্লোব লাইব্রেরি (প্রাঃ) লিমিটেড ঃ ঢাকা ও বরিশাল; পুর্নমুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৯১; পৃ.- ৪৮৫।

২৭. সিরাজুল ইসলাম; *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১; ১ম খণ্ড রাজনৈতিক ইতিহাস;* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; দ্বিতীয় প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০০০; পৃ.-২।

২৮. *শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়; পলাশি থেকে পার্টিশান আধুনিক ভারতের ইতিহাস;* প্রাগুক্ত; পৃ.-১৯।

২৯. সিরাজুল ইসলাম; *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো;* প্রাগুক্ত; পৃ.-৫৫-৫৬।

৩০. কাবেদুল ইসলাম; *ইংরেজ আমলে বাংলার* প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস ১৭৬৫-১৯৪৭; অ্যাডর্ন পাবলিকেশন; প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১০; পৃ.-৭।

৩১. হারুন-অর-রশিদ; *বাঙালী ও বাংলাদেশ ০-২০০৫;* হাসিনা প্রকাশনা, ঢাকা; বর্ধিত সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮; পৃ.-২১০।

১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কোম্পানির সনদ আইন (Charter Act) নবায়ন করা হয়। এ সনদ আইনে ভারতের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কার সাধন করে। এটি প্রথম বারের মত কোম্পানির ভারতীয় ভূ-খণ্ডের জন্য কলকাতায় সর্বভারতীয় আইন প্রণয়নকারী সংস্থার সৃষ্ট করে,এর মাধ্যমে বোম্বে ও মাদ্রাজের সরকারের আইন প্রণয়ণ সংক্রান্ত ক্ষমতা রদ করা হয়। নতুন চার্টার আইনের মাধ্যমে ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম বিলুপ্ত করে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব ঘোষণা (Diclaration of British Sovereign) করা হয়।

৩২. প্রবীর মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত; *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা;* প্রথম খণ্ড : প্রথম ভাগ; দীপায়ন; ২ কেশব সেন স্ট্রিট; কোলকাতা-৭০০০০৯; দ্বিতীয় মুদ্রণ-জানুয়ারি ২০১৩; প্রথম অধ্যায়; পৃ.-৪।

"'উপনয়ন' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'গুরুর কাছে শিক্ষার জন্য আসা'। মনুস্মৃতির মেধাতিথি ভাষ্য অনুসারে যে সংস্কার দ্বারা 'উপ'= সমীপে অর্থাৎ আচার্যের সমীপে 'নীয়তে'= বালকটি নীত হয়, তাই উপনয়ন। পি. ভি. কানে 'উপনয়ন' শব্দটির দু'টি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, প্রথমত, আচার্যের কাছে (শিক্ষার্থী) বালকটিকে নিয়ে আসা এবং দ্বিতীয়ত, যে আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বালকটিকে আচার্যের কাছে আনা হয়। কানের মতে, প্রথম ব্যাখ্যাটিই প্রকৃত (Original) এবং পরে যখন উপনয়নের সঙ্গে অজস্র আচার-অনুষ্ঠান যুক্ত হল তখনই দ্বিতীয়টির উৎপত্তি।"

৩৩. হারুন-অর-রশিদ; প্রাগুক্ত ; পৃ.-১৮৮।

'বেল পদ্ধতি'তে স্কুলের উচ্চ শ্রেণির ছাত্ররা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিম্ন শ্রেণির ছাত্রদের পড়াতো। এ পদ্ধতিকে 'মনিটোরিয়াল' পদ্ধতিও বলা হয়। এর প্রবর্তক অ্যান্ড্রু বেল। তাঁর নামানুসারে এ ধরনের শিক্ষার নামকরণ করা হয় বেল পদ্ধতি।

৩৪. শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার; *বাংলা দেশের ইতিহাস;* তৃতীয় খণ্ড, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; চতুর্থ সংস্করণ- ১৯৯৬; পৃ.-১১৮।

৩৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; পঞ্চম খণ্ড; মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড; প্রথম সংস্করণ– ১৯৮৫; পৃ.-৫৯৬।

৩৬. ঐ; পৃ.-৫৯৫।

৩৭. কো. আন্তোনভা ও অন্যান্য; ভারতবর্ষে ইতিহাস; প্রগতি প্রকাশন, মস্কো; দ্বিতীয় সংস্ককণ- ১৯৮৬; পৃ.-৪৪৬-৪৪৭।

৩৮. সুশোভন সরকার; বাংলার রেনেসাঁস; দীপায়ন, কলকাতা; পঞ্চম সংস্করণ-নভেম্বর ২০১১; পৃ.-১৬।

৩৯. সুরঞ্জিত দাশগুপ্ত; রামমোহন: ব্যক্তিতন্ত্র ও বিশ্বতন্ত্র; সংস্কার (জনচেতনা নাগরিক কল্যাণ সমিতির প্রকাশনা সংস্থা) কোলকাতা; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৩; পৃ.- ৬৩।

৪০. উদ্ধৃত; শ্রী অনীলচন্দ্র ঘোষ এম.এ.; রাজর্ষি রামমোহন; প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরি, কোলকাতা; বর্তমান সংস্করণ : জুন ২০১২; পৃ.-৪৫।

৪১. সুরঞ্জিত দাশগুপ্ত; প্রাগুক্ত; পৃ.- ৬৫।

৪২, উদ্ধৃত; ডক্টর এম. মতিউর রহমান; *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ উনিশ শতক;* প্রথম অবসর প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১৩; পৃ.-২২৮।

৪৩. ৬.সফিউদ্দিন আহমদ; *ডিরোজিও: জীবন ও সাহিত্য;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ–জুন ১৯৯৫; পৃ.– ২৩।

৪৪. স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত; *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি;* পুস্তক বিপণি, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০০৩; পৃ.-১০৪।

৪৫. শ্রীভূদেব চৌধুরী; *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা;* (২য় পর্যায়); দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পুনর্মুদ্রণ- এপ্রিল ১৯৯৫; পৃ.-৬৪।

৪৬. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়; *রেনেসাঁসের আলোয় বঙ্গ দর্শন;* কথা প্রকাশ; বাংলাবাজার, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ- একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩; পৃ.-৬৬।

৪৭. বিনয় ঘোষ; *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ;* প্রথম ওরিয়েন্ট ব্লাকসোয়ান সংস্করণ- ২০১১; ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; পৃ.-১৮৮-১৮৯।

৪৮. ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী; *আধুনিক ইওরোপ;* পরিমার্জিত সংস্করণ- অক্টোবর, ১৯৮৩; কলকাতা-৭০০০৭৩; পৃ:-৭।

৪৯. বিপান চন্দ্র; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৩৫।

৫০. সুরঞ্জিত দাশগুপ্ত; প্রাগুক্ত; পৃ.-৫৬।

আত্মীয় সভা: রামমোহনের তত্ত্বাবধানে ধর্ম বিষয়ক আলোচনাদি করার উদ্দেশ্যে গঠিত সভা। আত্মীয় সভার বৈঠক বসত তাঁর মানিকতলার বিশাল বাড়িতে। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ মুনশি, বৃন্দাবন মিত্র, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীশঙ্কর ঘোষাল, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দ কুমার বসু আত্মীয় সভার নিয়মিত সদস্য ছিলেন। এঁরা সবাই যে রামমোহনের মতের অনুগামী ছিলেন তা নয়, কেউ কেউ তাঁর মতের বিরোধীও ছিলেন। পক্ষ-বিপক্ষ আলোচনায় 'আত্মীয় সভার' বৈঠকগুলো হয়ে উঠত আকর্ষনীয়। শুধু ধর্মালোচনাই নয় দেশের পরিস্থিতি ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এখানে আলোচনা হত।

৫১. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; প্রাগুক্ত; পৃ.-১২।

৫২, স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৬৩।

৫৩. উদ্ধৃত; ডক্টর এম. মতিউর রহমান; প্রাগুক্ত; পৃ.-২২৪।

৫৪. ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ এম-এ, ডি-ফিল, ডি-লিট সম্পাদিত *রামমোহন রচনাবলী;* হরফ প্রকাশনী; কলকাতা; তৃতীয় মুদ্রণ–১৩ মার্চ ১৯৯৮; পৃ.-১৭৪।

৫৫. শ্রী ভূদেব চৌধুরী; প্রাগুক্ত ; পৃ.-৬৩।

৫৬. অভিজিত রায় সম্পাদিত; *তিন শতকের ডিরোজিও চর্চার ধারা;* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা; প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১০; পৃ.-১৩৮।

৫৭. সফিউদ্দিন আহমদ; *ইয়ংবেঙ্গল মুভমেন্ট ও ডিরেজিও;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৯; পৃ.-১৫।

৫৮. মোবাশ্বের আলী; *মধুসূদন ও নবজাগৃতি*; মুক্তধারা, ঢাকা-১১০০; চতুর্থ সংস্করণ– ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭; পৃ.-৪৬-৪৭।

৫৯. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য; প্রাগুক্ত; পৃ.-৪৩০।

৬০. শ্রী ভূদেব চৌধুরী ; প্রাগুক্ত; পৃ.-৭১।

৬১. উদ্ধৃত; অসিতকুমার ভট্টাচার্য; *অক্ষয়কুমার দত্ত এবং উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজ চিন্তা*; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী; গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২; প্রথম প্রকাশ- ২০০৭; পৃ.–১৫।

৬২. অলোক রায়; *উনিশ শতক;* প্রমা পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১২; ৫৭/২ই, কলেজ স্ট্রিট; কলকাতা ৭০০০৭৩; পৃ.-৩২।

৬৩. সুরজিৎ দাশগুপ্ত; *রামমোহন: ব্যক্তিতন্ত্র ও বিশ্বতন্ত্র;* প্রাগুক্ত; পৃ.-৬০।

৬৪. রাজা রামমোহন রায়; তুহফাৎ উল মুত্তয়াহিদীন, অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; কলকাতা-১৯৪৯; পৃ.- ২৭।

৬৫. গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ; রাজা রামমোহন রায় (জীবন চরিতের নতূন খসড়া), অরুণা প্রকাশন সংস্করণ- জুলাই, ২০১০; রঞ্জিত সেন; সম্পাদকীয় পৃ.-ষোল।

৬৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার; বাংলাদেশের ইতিহাস; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৬৬।

৬৭. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত; সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র; দ্বিতীয় খণ্ড; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; কলিকাতা; প্রথম প্রকাশ- আগস্ট, ১৯৬৩; পৃ.-৩৮৩-৩৮৪।

৬৮. উদ্ধৃত; স্বপন বসু; বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস; পুস্তক বিপণি; ২৭ বেনিয়াটোলা লেন; কলকাতা-৯; পঞ্চম সংস্করণ-জানুয়ারি, ২০১৪; পৃ.-২০।

৬৯. সুকোমল সেন; ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড; ষষ্ঠ মুদ্রণ : জুলাই, ২০১০; পৃ.-১৯৯।

৭০. সফিউদ্দিন আহমদ; ডিরেজিও : জীবন ও সাহিত্য; প্রাগুক্ত; পৃ.-৭।

৭১. বিনয় ঘোষ; বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ; প্রাগুক্ত; পৃ.-৩৭১।

৭২. প্রবীর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত; প্রাগুক্ত; স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক; পৃ.-৪।

৭৩. তীর্থপতি দত্ত সম্পাদিত; বিদ্যাসাগর রচনাবলী; প্রথম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ মে, ১৯৯৭; বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব; পৃ.-৭০০।

৭৪. উদ্ধৃত; স্বামী স্বাহানন্দ; বেদান্ত ও রামকৃষ্ণ; ভাষান্তর; ড.সচ্চিদানন্দ ধর; রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার; কলকাতা ৭০০ ০২৯; প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর, ২০১২; পৃ.-৩৯৩।

৭৫. দেবব্রত ঘোষ সম্পাদিত; স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নবজাগৃতি; ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট; কলকাতা ৭০০০৭৩; প্রথম প্রকাশ- ১২ জানুয়ারি ২০১৩; পৃ.-৬১।

৭৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত; পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ; অখণ্ড সংস্করণ; মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ; কলকাতা-৭০০ ০৭৩; দ্বাবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৯; পৃ.- ৫১৭।

৭৭. উদ্ধৃত; রমেশচন্দ্র মজুমদার; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৯৯।

৭৮. স্বামী স্বাহানন্দ; প্রাগুক্ত; পৃ.-৩৯৮।

৭৯. দেবব্রত ঘোষ সম্পাদিত; স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নবজাগৃতি; প্রাগুক্ত; পৃ.-৫৮।

৮০. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনুবাদিত ও সম্পাদিত; বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র; প্রথম খণ্ড; কামিনী প্রকাশালয়; কলকাতা; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য; কামিনী সংস্করণ– বৈশাখ, ১৪১৭; পৃ.-২।

৮১. ঐ; পৃ.-৪৩-৪৪।

৮২. সুকোমল সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৯-২০।

৮৩. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনুবাদিত ও সম্পাদিত; প্রাগুক্ত; দ্বিতীয় খণ্ড; পঞ্চম প্রকাশ–মাঘ, ১৪১৮;পৃ.-৫৩৭।

৮৪. উদ্ধৃত; সুকোমল সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.-২১৬।

৮৫. স্বপনবসু, ইন্দ্রজিত চৌধুরী সম্পাদিত; প্রাগুক্ত; রামাকান্ত চক্রবর্তী; *তিন সংস্কারক*; পুস্তক বিপণি; ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯; প্রথম প্রকাশ-২৯ নভেম্বর ২০০৩; পৃ.-১৮০। বিবেকানন্দের aggressive Hinduism' এর তত্ত্ব সমর্থন করে ঋষি অরবিন্দ লেখেছেন–When therefore it is said that India shall rise ,it is the sanatan Dharma that shall rise. when it is said that India shall be great, it is the Sanatan Dharma that shall be great.When it is said that India shall expand and extend itself, it is the Sanatan Dharma that shall expand and extend itself over the world.It is for the dharma and by the dharma that India exists.'(Wm Theodore de Barry, ed, *sources of Indian Tradition,*

৮৬. বিদ্যুৎবিকাশ দে; *বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে বিবেকানন্দের ধর্মবোধ;* বুক ওয়াল্ড; ১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা- ৭৯৯০০১; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি-২০১৩; পৃ.-৩৪।

৮৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার; প্রাগুক্ত; পৃ.-২১৯।

৮৮. গোলাম মুরশিদ; *রেনেসন্স বাংলার রেনেসন্স;* অবসর প্রকাশনা সংস্থা; সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০; প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১৫; পৃ.-১৫।

৮৯. ঐ; পৃ.-১৭।

৯০. ঐ; পৃ.-৩৩।

৯১. সফিউদ্দিন আহমদ; *ডিরোজিও: জীবন ও সাহিত্য;* প্রাগুক্ত; পৃ.-১-২।

৯২, অন্নদাশঙ্কর রায়; *বাংলার রেনেসাঁস;* দ্বিতীয় মুদ্রণ- এপ্রিল ২০০৪; পৃ.-২০।

৯৩. অরুণকুমার বসু সম্পাদিত; *সারস্বত;* বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮; পৃ.-১২৪।

৯৪. নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত; *উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক;* দীপিকা বসু; উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ ও যুগচেতনা; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী; কলকাতা; তৃতীয় মুদ্রণ-২০০৯; পৃ.-১০৬।

৯৫. অধ্যাপক শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত; *মেঘনাদবধ কাব্য;* পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৭; মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ; কলিকাতা-৭০০০৭৩; পৃ.-৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় : জীবনকথা

ক. বংশ পরিচয় ও জন্ম

গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৩৫ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসের (বৈশাখ ১৯৪২) কোনো এক মঙ্গলবারে ঢাকা জেলার তৎকালীন নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রূপগঞ্জ থানার মহেশ্বরদী পরগণার পাঁচদোনা গ্রামের বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁরা জাতিতে ছিলেন বৈদ্য আর ধর্মাচরণে শাক্ত। পিতা মাধবরাম সেন ও মাতা জয়কালী দেবীর তিনপুত্র তিন কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। গিরিশচন্দ্রের বড়দাদা ঈশ্বরচন্দ্র রায় ব্যবসার প্রয়োজনে ঢাকায় অবস্থান করতেন। ছোটদাদা হরচন্দ্র রায় পৈতৃক ব্যবসা 'আয়র্ব্বেদীয় চিকিৎসা' অবলম্বন করে ময়মনসিংহে থাকতেন। হরচন্দ্রের 'সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য ও বিশেষ কবিত্ব' ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তিনি অনেকগুলো কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র ছোটদাদার স্মৃতির স্মরণে কাব্যগ্রন্থ 'কৃষ্ণলীলা' প্রকাশ করেন। এছাড়া সংস্কৃতে তিনি ব্রহ্মস্তোত্রও রচনা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জীবনে হরচন্দ্রের প্রভাব ছিল অত্যন্ত নিবিড়।

বিখ্যাত দেওয়ান বাড়ির সন্তান ছিলেন ভাই গিরিশচন্দ্র। মানে-যশে, সমৃদ্ধিতে-খ্যাতিতে, জনকল্যাণে ও আত্মগৌরবে দেওয়ান পরিবার ছিল এক কিংবদন্তির নাম। প্রিয়বালা গুপ্তার আত্ম-জীবন 'স্মৃতিমঞ্জুষা'র বর্ণনাতে দেওয়ান বাড়ির শানশওকত ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটেছে। দেওয়ান বাড়ির পথের পাশে বিরাট দীঘি ছিল। দীঘি এতই বড় ছিল যে, দীঘির এপার থেকে ওপারের মানুষ চেনা যেত না। দীঘির পূর্বদিক ঘেঁষে উঠেছিল রকমারি দ্বিতল দালান, কোঠাবাড়ি, পঞ্চরত্ন-দোলমঞ্চ, দুর্গাবাড়ি, শিবালয়, দেবমন্দির প্রভৃতি। দোল দুর্গোৎসব, বারোমাসে তের পার্বণে দেওয়ান বাড়ির সিংহ দরজা উন্মুক্ত থাকত।[২] দেওয়ানরা ছিলেন তিন ভাই। বড় সন্তোষ নারায়ণ রায়, মধ্যম দর্পনারায়ণ রায়, ছোট ইন্দ্রনারায়ণ রায়। এরা তিনজনই মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনজনের নামে পাঁচদোনায় প্রাসাদসম তিনটি বাড়ি তৈরী করা হয়েছিল। বড়বাড়ি, মধ্যমবাড়ি, ছোটবাড়ি। গিরিশচন্দ্র ছিলেন ছোটবাড়ি অর্থাৎ ইন্দ্রনারায়ণের বংশধর। মধ্যম বাড়িটিই দর্পনারায়ণের নামে দেওয়ান বাড়ি নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। গিরিশ সেনের পরবর্তী পুরুষ রনজিৎ কুমার সেন বলেন, দর্পনারায়ণ সেন ছিলেন নবাবের Domestic Affairs এর দেওয়ান অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।[৩] তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিতেই দেওয়ান বাড়ির নাম- যশ-খ্যাতি।

পাঁচদোনার দেওয়ান পরিবার মুর্শিদকুলী খাঁর অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক সংস্কার নীতির স্বর্ণফসল। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ প্রশাসনিক কাজে বহিরাগতের নিয়োগের পরিবর্তে সরকারি উচ্চপদে স্থানীয় বাঙালি হিন্দু মুসলমান নিয়োগনীতি গ্রহণ করেন। সেসময় মুসলমানদের পাশাপাশি উচ্চ বর্গীয় হিন্দুরাও ফারসি চর্চা শুরু করেন। ফারসি ও বাংলা চর্চায় পারঙ্গম হয়ে হিন্দুরাও সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দর্পনারায়ণ রায় সম্ভবত সে সময়েই সুবা বাংলার সরকারি পদে কর্মরত ছিলেন। নরসিংদীর প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ তাঁর 'মহেশ্বরদীর ইতিহাস' গ্রন্থে এ বিষয়ের আভাস দিয়েছেন। "মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে তিনি ঢাকা শহরে কাজে যোগদান করেন। পার্শি ও বাংলা ভাষায় শিক্ষিত দর্পনারায়ণ ১৯/২০ বৎসর বয়সে সরকারী কাজে উন্নতি প্রদর্শন করেন। পরে মুর্শিদাবাদ রাজধানীতে স্থানান্তরিত হন।"[৪] একথার

যথার্থতা আমরা গিরিশচন্দ্রের 'আত্ম-জীবনী'তেও পাই। গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর 'আত্ম-জীবন'-এর পাদটীকায় একটি জীর্ণ দলিলের কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে দর্পনারায়ণ রায় ও তাঁর পরবর্তী দুই পুরুষের স্বাক্ষর ছিল। ভূমি সম্বন্ধীয় দলিলটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১১৬৭ (১৭৬০সালে)বঙ্গাব্দে। তিনি বলেন, তখন দর্পনারায়ণের সম্ভবত বার্ধক্য অবস্থা।[৫] ১৭৬০ সালে যদি দর্পনারায়ণের বার্ধক্য অবস্থা হয়, তাহলে মুর্শিদকুলী খাঁর (১৭১৭-১৭২৭খ্রি.) সময়ে তিনি ১৯/২০ বছরের যুবক হবেন এটাই স্বাভাবিক । নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি) সময়েই তাঁর কর্মজীবনের সাফল্য সূচিত হয়। এ সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁদের কৌলিক পদবী ছিল 'সেন' এবং মোঘল সুবাদারের কাছ থেকে তিনি 'রায়' উপাধি লাভ করেন। সেই থেকে তাঁরা 'সেন', 'রায়' কিংবা 'সেন রায়' উপাধি ব্যবহার করতেন।

গিরিশচন্দ্র অবশ্য 'সেন' উপাধিই ব্যবহার করতেন। দেওয়ান বংশের আধিপত্য এবং সম্মান দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত বিনীত চিত্তে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 'আত্ম-জীবন'-এ তাঁকে স্মরণ করেছেন। দর্পনারায়ণ ছিলেন অত্যন্ত মহানুভব ও দয়ালু মানুষ। জনকল্যাণকর নানাবিধ কাজ করে তিনি স্বদেশে অতিশয় প্রসিদ্ধ হন। মহৎ, উদার, পরোপকারী ব্যক্তি হিসেবে লোকে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল দেওয়ান বংশের গৌরব ও সম্মান।[৬] বংশের গৌরব ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিক স্মারকরূপে দেওয়ান বাড়িতে ফারসি চর্চা হতো। উত্তরকালে এরা পারস্যভাষাবিদ হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। গিরিশচন্দ্রের পিতামহ মুনশী রামমোহন রায় পারস্য ভাষাবিজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের অন্যতর উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর তিনপুত্র মুনশী রাধানাথ রায়, মাধবরাম রায়, গঙ্গাপ্রসাদ রায় তাঁর এই তিন পুত্রের জন্মই মুর্শিদাবাদে। পারস্য ভাষায় তাঁরাও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। গিরিশচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষদের ফারসি চর্চা সম্পর্কে বলেন,

> "পিতামহ রামমোহন রায় পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। আমার পিতামহ, পিতা ও পিতৃব্য সকলেই সুলেখক (খোশ্ নবিস) ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য রাধানাথ রায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পারস্য লিপির আদর্শের (তালিমের) অনুকরণে সুন্দর লিখিবার জন্য দেশ দেশান্তরের লোক তাহা গ্রহণ করিত। সাধারণতঃ পারস্য বর্ণমালা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। "শেকস্ত" ও "নোস্তালিক"। পিতামহদেব ও পিতৃব্য রাধানাথ রায় শেকস্ত লেখক ছিলেন, তাঁহাদের অক্ষরাবলী মুক্তাবলীর ন্যায় নয়নরঞ্জন সুন্দর ছিল। পিতৃদেব এবং পিতৃব্য গঙ্গাপ্রসাদ রায় নোস্তালিক অক্ষরে লিখিতেন । তাঁহাদের দুইজনের এবং পিতামহ ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত অনেকগুলি পারস্য পুস্তক আমাদের গৃহে ছিল, আমার অযত্নে সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে।"[৭]

ফারসি চর্চার বদৌলতে পাঁচদোনার দেওয়ান পরিবার পেয়েছিল প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ-খ্যাতি ও সমৃদ্ধি। এ দেওয়ান পরিবার ও পাঁচদোনাকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তি। দু / একটা কিংবদন্তির উল্লেখ করছি– সেকালে জলের কষ্ট ছিল প্রকট। মেয়েরা সংসার কর্মের জন্য বহুদূর থেকে জল সংগ্রহ করত। গ্রীষ্মকালে

প্রত্যেক পথচারীর সঙ্গেই ছোট একটি জল পাত্র থাকত। সে পাত্রের জলে পথশ্রান্ত হয়ে তারা তৃষ্ণা নিবারণ করত। এমনই এক গ্রীষ্মকালে দর্পনারায়ণ একবার কার্যোপলক্ষে ঢাকা রওনা হলেন। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নসূর্য যেন অগ্নিবর্ষণ করছে, অনেকটা পথযাত্রার পর দেওয়ান রায়ের পালকি নামানো হলো এক ছায়াময় বৃক্ষের নিচে। তাঁর সাথে ছত্রধারী, পাইক বরকন্দাজ যথারীতি অবস্থান করছে। সকলেই ঘর্মাক্ত, সকলেই পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত। কিন্তু কোথাও জল নেই। পালকিতে বসে রায় মশায় চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এমন সময় জল আনয়নরত কয়েকজন স্ত্রীলোকের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তিনি আশ্বস্ত হলেন। পানি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলল, "আমাদের জলের বড় কষ্ট, আমাদের বাড়ি থেকে দু'তিন ক্রোশ দূরে নদী; সেখান থেকে আমাদের জল সংগ্রহ করে আনতে হয়।" দেওয়ান রায়ের আর সেদিন ঢাকা যাওয়া হলো না। সেখানেই হলো এক নতুন দীঘির পত্তন। সে জায়গাটার নাম ভুলতা। আজও ভুলতার দীঘি দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায়ের অবিনশ্বর কীর্তি বহন করে চলছে।[৮] শুধু ভুলতার দীঘিই নয় পাঁচদোনার দীঘি ও কয়েকটি পুস্করিণী, পারুলিয়ার দীঘি, মঠখোলার দীঘি, দিনাজপুর জেলার একটি দীঘিও তাঁর অমর কীর্তি।

দর্পনারায়ণ জীবিত থাকাকালীনই বর্তমান ক্ষয়প্রাপ্ত ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমতীরে তিনটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন। সন্তোষনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণ এ তিন ভাইয়ের নামে পাশাপাশি তিনটি মন্দির নির্মাণ করা হয়। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ইন্দ্রনারায়ণ ও দর্পনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত মন্দির দুইটির বিগ্রহ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেবল পূর্বদিকে অবস্থিত সন্তোষনারায়ণের নামে বিগ্রহটির অস্তিত্ব বর্তমানেও আছে।

উক্ত মন্দিরে হিন্দু জনসাধারণ এখনও তাদের নিত্য নৈমিত্তিক পূজা পার্বণ করে থাকে। এ মন্দির তিনটির উত্তর পূর্ব কোণায় বিগ্রহবিহীন আরও একটি মন্দির আছে। উক্ত বিগ্রহশূন্য মন্দিরটি দর্পনারায়ণের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য শ্রীর নামে তৈরী করা হয়েছিল। কথিত আছে, তদানীন্তন বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভের সাথে দর্পনারায়ণের দুই ভাই সন্তোষনারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণের ব্যক্তিগত কলহ নিয়ে যুদ্ধ বাঁধে। দর্পনারায়ণ তখন মুর্শিদাবাদে অবস্থান করছিলেন। উক্ত যুদ্ধে রাজবল্লভের বাহিনী পরাজিত হয়। দর্পনারায়ণের দুই ভাই তাঁদের একমাত্র বিশ্বস্ত ভৃত্য শ্রীর দ্বারা দর্পনারায়ণের কাছে মুর্শিদাবাদে খবর পাঠান যে, রাজবল্লভ দর্পনারায়ণের জমিদারিতে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে তদীয় জমিদারী হতে বহু মূল্যবান সম্পত্তি লুণ্ঠন করে বিক্রমপুরে নিয়ে গেছেন। শ্রীর মাধ্যমে দর্পনারায়ণ উক্ত খবর অবগত হয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর নিকট অভিযোগ করেন।

দর্পনারায়ণের অভিযোগে আলীবর্দী খাঁ উভয় সংকটে পড়ে যান। একদিকে দর্পনারায়ণ তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী, অপরদিকে রাজবল্লভও তাঁর আস্থাভাজন বিশ্বস্ত কর্মচারী। সুতরাং উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য দর্পনারায়ণকে বলেন, "রাজবল্লভ আপনার যে সকল সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া নিয়া গিয়াছেন তাহা আপনি ফেরত নিয়া আপোষ করিয়া ফেলেন, কারণ বর্তমানে বর্গীদের বারবার হামলায় বাংলার অবস্থা খুবই খারাপ, এমতাবস্থায় কোন প্রকার গণ্ডগোলে না গিয়া আপাতঃবস্থায় আপনার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি রাজবল্লভের প্রাসাদ হইতে ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করুন। এতদ্‌বিষয়ে আমি আমার নামাঙ্কিত পাঞ্জা দ্বারা আদেশ রাজবল্লভের দরবারে প্রেরণ করিতেছি।"[৯] দর্পনারায়ণ নবাবের পাঞ্জাঙ্কিত আদেশনামা শ্রীর হাতে দিয়ে বললেন, এ

আদেশনামা নিয়ে তুমি এক্ষুণি রাজবল্লভের প্রাসাদে যাও এবং যা যা আমাদের লুণ্ঠিত হয়েছে তা ফেরত নিয়ে আস।

রাজবল্লভের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে শ্রী বিক্রমপুর গেলেন। নবাবের পরোয়ানা প্রদর্শন করে তিনি পছন্দমত বহুমূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে পাঁচদোনায় ফিরে এলেন। এ ঘটনার বেশ কিছুদিন পর দর্পনারায়ণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে শ্রীর চালাকি ও অপকীর্তির কথা জানতে পেরে শ্রীকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে শ্রী যেসব অর্থ সামগ্রী আনয়ন করেছিল তিনি তার একটি কপর্দকও গ্রহণ করেননি, এর সমস্ত অর্থ দিয়ে শ্রীর নামে একটি বিগ্রহবিহীন মন্দির তৈরী করেছিলেন। দেওয়ান দর্পনারায়ণ ছিলেন একজন পুণ্যশীল পুরুষ। লোকে বলে দেওয়ান দর্পনারায়ণের নামে নিস্ফলা গাছে ফল ধরত। দর্পনারায়ণের তিরোধানের পর তাঁর নামে মানত করলে রোগাক্রান্ত লোক সুস্থ হয়ে যেত। আরো অসংখ্য কিংবদন্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পাঁচদোনার ইতিহাসে।

খ. শৈশব ও কৈশোর

গিরিশচন্দ্র সেনের শৈশব ও কৈশোর জীবন কেটেছে মায়ের স্নেহের ছায়ায়। পরিবারের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান হওয়ায় স্নেহ-যত্নের আধিক্যে নন্দগোপাল হয়ে বেড়ে উঠেন তিনি। তিনি যখন যা আবদার করতেন, তখনই সঙ্গে সঙ্গে তা প্রাপ্তির আনন্দও পেতেন। শিশু গিরিশচন্দ্রের সমস্ত জগৎ জুড়ে ছিলেন তাঁর মা। মা তাঁকে নানা অলংকারে সাজাতেন। গলায় হার, হাতে বালা, বাহুতে বাজু নামক ভূষণ, কোমরে ঘুঙ্গুর বা গোট, পদে নূপুর ও মল ছিল তাঁর রূপসজ্জার নিত্য সামগ্রী। তিনি মস্তকে শিখা অর্থাৎ টিকী ধারণ করতেন, আদুল গায়ে থাকতেন। তাঁর রূপের ছটার সীমা ছিল না। অদ্ভুত বেশভূষায় তাঁর বাল্যকাল পরবর্তী সময়ের স্মৃতিচারণে তাঁর কাছেই হাস্যকর মনে হয়েছিল। তিনি যেন ছিলেন আদুরে গোপাল।[১০] প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সঙ্গে মায়ের অতি স্নেহের সমন্বয় তাঁর শৈশব ও কৈশোরের জগৎকে আবদ্ধ করেছিল পারিবারিক গণ্ডিতে এবং মানস জগতকে করেছিল ভীরু ও দুর্বল। তিনি দুষ্টু ও দুরন্ত প্রকৃতির ছেলেদের সঙ্গে কখনো মিশেননি। শিশুসুলভ খেলাধূলায় কখনো অংশগ্রহণ করেননি। বাল্য ক্রীড়ামোদে বুদ্ধিচাতুর্যের প্রয়োগ তিনি ঘটাননি। গৃহকোণে তিনি একাকী নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন। একমাত্র মা এবং মাঝে মাঝে দুর্গাপ্রসাদ দাস গুপ্ত নামক একজন বৈদ্য চিকিৎসকের সাথে তিনি সময় কাটাতেন। দুর্গাপ্রসাদ যে পদ্ধতিতে ঔষধ প্রস্তুত করতেন তা তিনি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতেন। যখন একাকী থাকতেন সেই প্রণালীতে কিছু ঔষধ প্রস্তুত করে পল্লীর অসুস্থ লোককে দিয়ে আসতেন। এটি ছিল তাঁর বাল্য ক্রীড়ার মধ্যে অন্যতম। এ প্রসঙ্গে 'আত্ম-জীবন'এ তিনি বলেন,

> "আমি গৃহে একাকী জীবনযাপন করিতাম। আমাদের বাড়িতে বিক্রমপুর নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ দাস গুপ্ত নামক একজন বৈদ্য চিকিৎসক স্থিতি করিয়া বহুকাল চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইয়া ছিলেন। আমি তাঁহাকে কবিরাজ দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতাম; প্রতিদিন সায়ংকালে তাঁহার ঘরে তাঁহার নিকটে বসিয়া শ্লোক আবৃত্তি করিতাম। তাঁহা হইতে নাম জিজ্ঞাসা প্রণালী ও অনেক নূতন নূতন শ্লোক শিক্ষা করা হইয়াছিল। তিনি যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতেন আমি সে সকল মনোযোগপূর্ব্বক দর্শন করিতাম, তাহা হইতে লবঙ্গাদি, নৃপবল্লভ ইত্যাদি বড়ী প্রস্তুত করিবার তালিকা লিখিয়া লইয়াছিলাম, এবং মাতৃদেবী হইতে অর্থগ্রহণপূর্ব্বক ঔষধের উপকরণ লবঙ্গ জয়িত্রী জায়ফল পিপ্পলী ইত্যাদি খরিদ করিয়া আনিতাম, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে একত্র পেষণপূর্ব্বক গুলি প্রস্তুত করিতাম, পল্লীর কাহারও জ্বর ও উদরাময় কিংবা শিরঃপীড়া হইয়াছে শুনিলে তাহাকে ঔষধ বিতরণ করিয়া আসিতাম। সকলে আমোদ করিয়া হউক বা যেভাবে হউক আমার প্রদত্ত ঔষধ আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। আমার বাল্যক্রীড়ার মধ্যে ইহা একটা ক্রীড়া ছিল।"[১১]

আর একটি বাল্য ক্রীড়ায় তিনি সময় কাটাতে ভালোবাসতেন, সেটা ছিল ঠাকুরপূজা বা মূর্তিপূজা। তিনি ছিলেন গোঁড়া শাক্ত পরিবারের সন্তান। জন্মলগ্ন থেকেই বাড়িতে দেখেছিলেন পূজা অর্চনার বাড়াবাড়ি। তাঁদের পারিবারে লক্ষ্মী গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পারিবারিক আচার-সংস্কার, পূজা-পার্বণ ও আচরিত জীবন-

যাপনে আবদ্ধ থেকে গিরিশচন্দ্র গোঁড়া পৌত্তলিক হয়ে উঠেন। শৈশবে তাঁর শিশুসুলভ মানসিকতা পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে বাইরের জগতের উদারতাকে গ্রহণ করতে পারেনি। যে শিশুর বাল্যক্রীড়ার সামগ্রী ক্ষুদ্র গণেশ, গোপাল এবং অন্নপূর্ণার মূর্তি এবং ক্ষুদ্রাকারের সাপপোষা টাটা পুষ্পপত্রাদিপূজার বাসন এবং ক্ষুদ্র কাঁসর, যে শিশুর বাল্যক্রীড়া মূর্তিপূজার জন্য ঘণ্টাশঙ্খ, পুষ্পচয়ণ, স্নান করে পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্য এবং ধূপদীপযোগে মূর্তিপূজার মন্ত্রপাঠ সে শিশুর জীবন ও জগৎ ধর্মীয় অন্ধত্ব বা গোঁড়ামির মধ্যে আবর্তিত হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই দেখা যায়, বৈদ্যজাতির উপবীত ধারণের নিয়ম না থাকলেও তিনি অনেক সময় উপবীত ধারণ করতেন। ঠাকুর দেবতার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ ভক্তি । তাঁদের পরিবারে লক্ষ্মী গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বেতনভোগী পূজক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সেই বিগ্রহের পূজা করতেন, সেই ঠাকুর পূজার সময় তিনি ঠাকুরঘরের দ্বারে উপস্থিত থাকতেন, ভক্তিপূর্ব্বক চরণামৃত গ্রহণ ও প্রণাম করতেন, নৈবেদ্যের চিনি কলা প্রসাদেরও প্রত্যাশা করতেন। সায়ংকালে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি শুনে বৈকালী প্রাসাদের জন্য দেবালয়ের দ্বারে দৌড়ে যেতেন। তিনি পারিবারিক পুতুলকে চূড়া, হার ও স্বর্ণময় উপবীত এবং বিচিত্র সাজসজ্জায় সাজাতেন, স্বর্ণনির্মিত তুলসীপত্র ও চম্পক কুসুম উপহার দিতেন, উৎকৃষ্ট সিংহাসন, শয্যা ও মশারী দান করতেন। দোলযাত্রার সময় তিনি ঠাকুরকে দোলমঞ্চে আরোহণ করাতেন। তাঁর জন্য আলাদা ক্ষুদ্রাকারে দোলমঞ্চ, সিংহাসন ও মকর কাঠাম ছিল। কূলপুরোহিত রীতিমত হোম ও পূজা করে পারিবারিক লক্ষ্মীজর্নাদন নামক শালগ্রামকে দোলমঞ্চের ওপর সিংহাসনে স্থাপন করতেন। পারিবারিক বিশাল দোলমঞ্চের পাশেই থাকতো তাঁর ক্ষুদ্র দোলমঞ্চ। যথারীতি তিনি দোল উৎসবের সব প্রণালী সম্পন্ন করতেন, এমনকি ভোজেরও আয়োজন করতেন। আর ছেলের এসব আবদারের অর্থযোগান দিতেন তাঁর স্নেহময়ী মা। পূজা-অর্চনাকে ঘিরেই ছিল তাঁর শৈশব বলয়। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি একজন গোঁড়া হিন্দু পৌত্তলিক ছিলাম। পারিবারিক বিগ্রহাদি সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত গোঁড়ামি ছিল। আমি মনে করিতাম আমাদের বাড়ির ঠাকুর দেবতার ন্যায় এবং আমাদের শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবের ন্যায় অন্য কোন দেবতা জাগ্রত নহে। আমি শাক্ত পরিবারের বালক ছিলাম, শৈশব কালে সময়ে সময়ে কদলী তরু কাটিয়া আনিয়া তাহাকে মহিষ বা পাঁঠা কল্পনা করিয়া পুতুলের সম্মুখে বলিদান করিতাম। অনেক পক্ষীর ছানা পোষা গিয়াছে; কখন কখন আমি পাখীও বলিদান করিয়াছি, কখন কখন তুলসী তরুর সেবা করিয়া তুলসীভক্ত বৈষ্ণবদের অনুকরণ করিয়াছি।"[১২]শৈশবের স্বভাবজাত চঞ্চল, দুরন্ত, ডানপিটে গিরিশ 'আত্ম-জীবন 'এ একান্তই অনুপস্থিত। 'আত্ম-জীবন'এর শিশু ও কিশোর গিরিশ পরিপক্ক পূজারী, পূজা অর্চনা ও বলিদানে নিবেদিত প্রাণ একজন পাকা হিন্দু। শুধু তাই নয়, তাঁর জাতিভেদ জ্ঞানও ছিল প্রকট। এছাড়া মুসলমানের প্রতিও ছিল তাঁর তীব্র বিদ্বেষ। মুসলমানের ছায়া মাড়ালে তিনি নিজেকে অপবিত্র মনে করতেন। উঁচু-নীচু ভেদাভেদে তিনি যেন সে যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদেরই যোগ্য উত্তরসূরি। তাঁদের ঘরে একজন শূদ্র জাতীয় চাকরাণী ছিল। তাঁর নাম করুণা। সে বহুদিন ধরে তাঁদের পরিবারের সেবায় নিয়োজিত ছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁরই কোলেপিঠে মানুষ হয়েছিলেন। তিনি তাঁকে করুণা মাসি বলে ডাকতেন। একদিন রাত্রে তিনি খেতে বসেছিলেন, করুণা মাসী তাঁর পাশ ঘেঁষে চলে যায়, তার আঁচল গিরিশচন্দ্রের শরীর স্পর্শ করেছে বুঝতে পেরে তিনি তৎক্ষণাৎ খাবার পরিত্যাগ করে উঠে গিয়েছিলেন। শূদ্র জাতির স্পর্শ লেগেছে, খাবার অপবিত্র হয়ে গেছে, তিনি সে অন্ন আর গ্রহণ করেননি।

মাত্র নয় / দশ বছর বয়সের একটি বালকের এরূপ জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার অনুভব সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। জাতিভেদের ছুঁৎমার্গ এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। একবার বড়দাদা ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে জলপথে তিনি ঢাকা যাচ্ছিলেন। ফতুল্লা বাজারে যাত্রা বিরতি ঘটে। তাঁর দাদা ফতুল্লার একটি দোকান হতে সরু চিড়া ও পাতক্ষীর ক্রয় করে আনেন। গিরিশচন্দ্র নৌকা থেকে দেখতে পেলেন সে দোকানে জয়ঢাক বাজাওয়ালা প্রবেশ করেছে। ব্যাস্ আর যায় কোথায়। গিরিশচন্দ্র সে চিড়া আর পাতক্ষীর স্পর্শও করলেন না। তাঁর মতে ফিরিঙ্গী বাজাওয়ালা প্রবেশ করাতে খাবার অপবিত্র হয়ে গেছে। তাঁকে খাওয়ানোর জন্য দাদা অনেক সাধ্য সাধনা করলেন কিন্তু জেদী, রক্ষণশীল, গোঁড়া গিরিশচন্দ্র জাত-ভেদের মোহে এতটাই অন্ধ ছিলেন যে, সারাবেলা না-খেয়ে কাটালেন কিন্তু সেই খাবার মুখে তুললেন না।

যখন গিরিশচন্দ্রের আট বছর বয়স তখন তাঁর পিতা মাধব রায়ের মৃত্যু হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর পড়াশুনা বিষয়ে বাধ্যবাধকতা না থাকায় তিনি কখনো পূজা পাঠে নিমগ্ন থেকেছেন, কখনো ঔষধ বিতরণ করে বেড়িয়েছেন, কখনো সখীসংবাদ গানের দলে সরকারের কাজ করেছেন। শিব সিংহের সখীসংবাদ বা কবির দল সে সময় পাঁচদোনায় অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। বড় বড় ওস্তাদ কবির দলও শিব সিংহের দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠত না। বিশেষ বিশেষ পূজা পার্বণে এই দলের গান হতো এবং বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন বহুদূর হতে সে গান শুনতে আসত। তিনি সেই দলের একজন পুষ্টিপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। সারারাত জেগে উৎসাহ সহকারে তিনি তাঁদের গান শুনতেন। কখনো তাঁদের গান শেখার সময় গানের খাতা দেখে গান বলে দিতেন এবং কখনো তাঁদের গাঁজা তামাকু যোগাতেন। ফলে পড়াশুনা বাদ দিয়ে এ সময় কৈশোর বয়সে তিনি কিছুটা বখে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন' এ বলেন,

> "যে বালকের উৎসাহ ও আমোদ পুতুল পূজায়, যে বালক ঔষধ বিতরণ করিয়া বেড়ায়, এবং কবির দলের সরকারের কাজ করে, সেইরূপ বালকের কি কখনও লেখাপড়া শিক্ষা হয়? আমার বাল্যকালেই পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, বোধ হয় তখন আমার অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। তিনি যে পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন সে পর্য্যন্ত আমি তাঁহার শাসনাধীনে থাকিয়া কিছু কিছু পড়াশুনা করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকটে বা অন্য কোন গুরুজনের নিকটে পন্দনামা বা গোলস্তান পুস্তক পড়িতেছিলাম। বাঙ্গালা লেখাপড়ার চর্চ্চা প্রায় কিছুই হইতেছিল না। তখন পারস্য ভাষা শিক্ষার প্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল না, বহু বৎসর পর্য্যন্ত অর্থ না বুঝিয়া ছাত্রদিগকে কেবল পাঠ আবৃত্তি করিতে হইত। এইরূপ পাঠ মুখস্থ করাকে 'মতন পড়া' বলে। এই প্রকার মতন পড়ায় আমার জীবনের অনেক বৎসর বৃথা ব্যয় হয়। পিতৃদেব স্বর্গগত হইলে পর আমি স্বাধীন হইলাম, পড়াশুনায় অধিকতর অনাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। একদিন সবক (পাঠ) গ্রহণ করিলে তিন দিনেও তাহা ইয়াদ (আবৃত্তি) করা হইত না। শাসনকর্ত্তা কেহ ছিল না, মার অত্যধিক স্নেহ ও আদরে আমাকে অধিকতর বয়ে যাইতে হইয়াছিল।"[১৩]

তাঁর এই বখে যাওয়া জীবনে পাঁচদোনার তৎকালীন সামাজিক জীবনাচরণও প্রভাব ফেলেছিল। সেকালে পাঁচদোনার জনজীবন– মদ্যপ্রিয়তা, দুরাচার, ব্যভিচার ও অসংলগ্নতায় আচ্ছন্ন ছিল। গ্রামের স্ত্রী পুরুষের মধ্যে নীতির বন্ধন ছিল না, তাঁদের মুখে ভালো কথা ও সদুপদেশ শোনা যেত না। তাঁর জ্ঞাতি কুটুম্বদের মধ্যে

অধিকাংশ পুরুষই ছিলেন মদ্যপায়ী। তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন'-এ সামাজিক প্রভাবের কারণে নিজ চরিত্রের স্খলনকে অকপটে স্বীকার করেছেন। সে সময় পাঁচদোনা গ্রামের অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল। নারী পুরুষের মধ্যে চারিত্রিক সুদৃষ্টান্ত দুর্লভ ছিল, তাঁরা অনৈতিক, অশালীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। নৈতিক অবক্ষয়ে ক্লেদাক্ত অভিপ্রায়েই কাটত তাঁদের গ্রামীন-জীবন। সে সমাজের অধিকাংশ পুরুষ ছিল মদ্যপ। মদ্যপ্রিয় শাক্ত বৈদ্য বংশেই গিরিশচন্দ্রের জন্ম। কিন্তু তাঁর পরিবারস্থ কোনো ব্যক্তি মদ্যপান করেননি, তাঁদের বাড়িতে কখনও সুরা পানের ঘটা হয়নি। তথাপি তিনি দীর্ঘদিন মাতালের সংসর্গে বাস করেছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কখনো সুরার আস্বাদ তিনি প্রাপ্ত হননি, কোনোরূপ মাদকদ্রব্য এমন কি ধূমপানও তিনি করেননি। এতদসত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে নীতির বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছিল। আবশ্যক হলে তিনি মিথ্যা কথা বলতেন, গৃহে সুস্বাদু খাদ্য ও মিষ্টান্নাদি চুরি করে খেতে তিনি পাপবোধ করতেন না, শুধু খাদ্যই নয় তিনি অন্যান্য বস্তু চুরি করতেও দ্বিধা করতেন না। তাঁর চারপাশে কুকথা ও কুদৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। সামাজিক কুপ্রভাবের কারণে স্বাভাবিকভাবেই কুচিন্তা ও কুভাবনায় কিশোর গিরিশের অন্তর কলুষিত হয়, এমনকি চরিত্রের স্খলনও ঘটে।

সে সময়ে পাঁচদোনা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে ধনী মানুষের চারিত্রিক স্খলন কতটা নীতি বিবর্জিত অমানবিক অসভ্যতায় পরিণত হয়েছিল, তা প্রিয়বালা দেবী তাঁর 'স্মৃতিমঞ্জুষা'য় পিতার জমিদার মামার চারিত্রিক অন্ধ অহমিকাতে তুলে ধরেছেন-

> "তাঁর মামারা ছিলেন সোনার গাঁ গোবিন্দপুরের প্রতাপান্বিত জমিদার। সে সময়ের কথা, সে সময় জমিদাররা খুবই উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। তাতে তাঁদের কোন লজ্জা বা অপমানবোধ হতো না। মদটা ছিল একটা সাধারণ বিলাসের অঙ্গ। এটা যখন তখন সবার সামনে চলতে পারত। একদিন সকালবেলা বাবার দুই মামা মনের আনন্দে মদ খাচ্ছেন, এবং নানা গল্পগুজব করছেন। এমন সময় বড় মামার হঠাৎ মনে হলো বাড়ীর বড়বৌ অনেকদিন যাবৎ বাপের বাড়ী আছেন, তাঁকে এক্ষুণি নিয়ে আসা দরকার। তখনকার দিনে বৌদের বৎসরে সাতদিন বাপের বাড়ী থাকার নিয়ম ছিল। সাতদিনের বেশি একদিনও থাকার উপায় ছিল না। শরীর অসুস্থ থাকলেও চলে আসতে হতো, তা না হলে রক্ষা থাকত না। ভদ্রমহিলা মোটে চারদিন চাররাত্রি বাপের বাড়ী পার করেছেন। কিন্তু তাতে কী হয় ? ছোট ভাইয়ের উপর হুকুম হলো;' যাও, এক্ষুণি বড়বৌকে নিয়ে এসো।' ভাই লক্ষ্মণ তক্ষুণি ছুটলেন ভ্রাতৃবধূকে নিয়ে আসতে। বেশি দূর নয়– চারটে মাঠ পেরিয়ে দাদার শ্বশুরবাড়ী। সকাল বেলা কুটুম দেখে সবাই সন্ত্রস্ত- 'ব্যাপার কি'? না–, বৌঠাকুরুন অনেক দিন বাড়ী ছাড়া, তাকে নিতে এসেছি। দাদার হুকুম।' প্রতিবাদ উঠল 'না-না, তা কি হয়? মোটে চারদিন হলো, আরো ত তিনদিন থাকার কথা। আজ যাওয়া হবে না।' ভাই ফিরে এসে দাদার কাছে তাঁদের বক্তব্য নিবেদন করলেন। দাদার তখন আত্মসম্মান মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। 'কী, এত বড় কথা! বৌ দেবে না? আচ্ছা, দেখ তুই ত আমার ভাই

দুঃশাসন, তুই কি পারিস না দ্রৌপদীর মত চুলের মুঠি ধরে বৌকে নিয়ে আসতে? বলা মাত্র 'রে রে' শব্দে ছোট ভাই ছুটল। চারটে মাঠ বৌঠানের চুলের মুঠি ধরে পার করিয়ে হিড় হিড় করে টেনে এনে বাড়ীতেই ভাইয়ের কাছে হাজির করলেন।"[১৪]

ক্ষমতার অন্ধ অহমবোধ, দুরাচার, ব্যভিচার, মদ্যপ্রিয়তা, নীতিহীনতা তৎকালীন সমাজের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের অমানিশায় কাটে গিরিশচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোর জীবন। তবে তিনি সেই অবক্ষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। মদ্যপ্রিয় শাক্ত বংশে তাঁর জন্ম, তিনি সবসময় মাতাল সংসর্গে বেষ্টিত ছিলেন, তবুও তিনি কখনো মদ স্পর্শ করেননি। পারিপার্শ্বিক প্রভাবে তাঁর অন্তর কলুষিত ও চরিত্রের কিছুটা স্খলন ঘটেছিল বটে কিন্তু আদ্যোপান্ত নিমজ্জিত হননি। তবে এ স্খলনকে সুন্দর স্বাভাবিক বোধে গ্রহণ করাই শ্রেয়। একটি কিশোর বয়সের বালক বোধ-বুদ্ধি-বিবেচনাহীন আবহে পারিপার্শ্বিকতায় আচ্ছন্ন হবেন এটাই স্বাভাবিক। নীতির আতিশয্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবনকে বিচার করা মোটেই সঙ্গত ও বিবেচনা প্রসূত হবে না । সামাজিক ক্লেদ-গ্লেদ, জীবনাচরণের অশ্লীলতা, লোভ-প্রলোভন ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্ধ গহ্বরে তিনি তলিয়ে যাননি। আর এ রক্ষা প্যাওয়াকে তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

গ. শিক্ষাজীবন

পাঁচদোনার উচ্চবংশ মর্যাদাসম্পন্ন দেওয়ান পরিবার ছিল-আভিজাত্যে-গৌরবে, সম্মানে-মহত্ত্বে, শিক্ষা-দীক্ষায় সমুন্নত পরিবার। মোঘল আমল থেকেই তাঁদের বংশমর্যাদার গৌরব রবি পূর্ব বাংলার প্রাঙ্গণকে আলোকিত করে আসছিল। (গিরিশচন্দ্রের 'আত্ম-জীবন'-এর বর্ণনা অনুযায়ী) সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক বোধের স্খলনে যখন পাঁচদোনার সাধারণ জনজীবন অধঃপতিত "সেন পরিবার তখন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষে, বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্যে, সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষা বিস্তারে এবং মানব হিতৈষীপনা ও চিৎপ্রকর্ষে সুনামের অধিকারী এই পরিবারটি সমস্ত বাংলাদেশে এক গৌরবান্বিত পরিবার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলো। বাংলাদেশে তখন এ ধরনের পরিবার মাত্র হাতে গোণা কয়েকটি ছিলো। কেউ কেউ এমনও বলত যে, এ বাংলায় রায় পরিবার ওপার বাংলা ঠাকুর পরিবার।"[১৫] ধর্ম সংস্কারে, সমাজ সংস্কারে ও সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় ঠাকুর পরিবারের তিন পুরুষ জুড়ে যে যুগসচেতন, আত্ম-প্রত্যয়ী, মানবতাবাদী উদার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, রায় পরিবারের আভিজাত্যে ও গৌরবের কিংবদন্তিতে তার অভাব সুস্পষ্ট। তবে পূর্ব বাংলার ক্ষুদ্র পরিসরের যৌক্তিক ভাবনায় রায় পরিবারের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্রের জন্ম আধুনিক যুগের প্রাথমিক উৎকর্ষ পর্বে। এ পর্বে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বাঙালি প্রতিভা পাশ্চাত্য ভাবধারাকে গ্রহণ করে মধ্যযুগীয় অবগুণ্ঠিত প্রথাবদ্ধ জড়তা থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য প্রস্ফুটিত হতে শুরু করেছে। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামাজিক অবকাঠামো ভেঙে আধুনিকতার দৃষ্টিনন্দন সুরম্য ইমারত নির্মাণের তোড়জোড় চলছে। যে সময় রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিক মনন বিনির্মাণে দক্ষ কুশলী, সে সময়ে ভাই গিরিশচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ হয় ফারসি চর্চার মধ্য দিয়ে। যখন ইংরেজি চর্চার মাধ্যমে বাঙালি আধুনিক জীবন সচেতনতায় আত্মোন্নয়নের পথে অগ্রসরমান, তখনও দেওয়ান পরিবারে ফারসি চর্চা হতো পূর্ব পুরুষদের আভিজাত্যের স্মারক রূপে। যুগোপযোগী মনোভাবে জীবনের যথার্থতাকে উপলব্ধির মাধ্যমে রায় পরিবারের পূর্বপুরুষ দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায় ফারসি চর্চায় যে যুগসচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন, বৃটিশ রাজত্বে ইংরেজি চর্চায় উন্নাসিক মানসিকতা দেখিয়ে রায় পরিবারের পরবর্তী প্রজন্ম পশ্চাৎপদতাকেই গ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে চিন্তা চেতনার পরিবর্তনে তাঁরা সময়োপযোগী স্রোতধারায় অবগাহন করতে পারেননি। পূর্বপুরুষদের আভিজাত্যের অন্ধ অহমবোধে মাধবরায় বর্তমানের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনকে আমলে নেননি। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান গিরিশচন্দ্র সেনের হাতেখড়ি অনুষ্ঠান বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ লেখার মাধ্যমে শুরু করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তাঁকে ফারসি চর্চাতেই নিযুক্ত রাখেন। গিরিশচন্দ্রের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন পারিবারিক ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কুলগুরু পঞ্চানন হাতেখড়ি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি তাঁকে হাতেখড়ি দিয়ে বাংলা বর্ণমালা পড়িয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি ফারসি চর্চাতেই আত্মনিয়োগ করেন–

> "পাঁচ বছর বয়ঃক্রম কালে আমি কুলগুরু স্বর্গগত বিশ্বনাথ পঞ্চানন মহাশয়ের নিকটে বিদ্যারম্ভ করিয়াছিলাম। আমার স্মরণ আছে, তিনি সরস্বতী দেবীর পূজা করিয়া আমার হাতেখড়ি দিয়াছিলেন। খড়িমাটীর ঢেলা দ্বারা ভূতলে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সকল লিখিয়া আমাকে একটি করিয়া অক্ষর পড়াইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে কদলীপত্রে বর্ণমালা লিপি করা অভ্যাস করিলে পিতৃদেব মাধবরাম রায় মহোশয় 'আমাকে পারস্য ভাষার চর্চ্চায় নিযুক্ত করেন। তাঁহার নির্দেশে একজন মোল্লা আসিয়া নামাজ পড়িয়া পারস্য বর্ণমালা আলেফ্, বে, তে, সে ইত্যাদি পড়াইয়া যান। আমি সিন্নি দিয়া তাঁহার নিকটে রীতিপূর্বক "বেসমাল্লা আর রহমান আর রহিম" বচন উচ্চারণ করিয়া আলেফ, বে, তে পড়িতে ও লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। পারস্য বর্ণমালা কিঞ্চিৎ অভ্যস্ত হইলে পর পিতৃদেব স্বহস্তে শেখ সাদী প্রণীত 'পন্দনামা' পুস্তক লিখিয়া আমাকে পড়িতে দেন। বোধ করি সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি রীতিপূর্ব্বক পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হই।"[১৬]

পারস্য ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ওপর রায় পরিবারের বিশেষ আনুগত্যের প্রেক্ষিতে বাবার হাত ধরেই ফারসি চর্চায় গিরিশচন্দ্রের আদুল যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু কিছুটা পথ যেতে না যেতেই মাধব রায়ের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে তাঁর শিক্ষাযাত্রার বিরতি ঘটে। তারপর মায়ের অতি স্নেহে এবং শিশুসুলভ বাল্য ক্রীড়া-কলাপ আমোদে তাঁর পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। এছাড়া সে কালের আনন্দহীন পারস্য চর্চার প্রণালী তাঁর কাছে উৎকৃষ্ট মনে হয়নি। না বুঝে পাঠ আবৃত্তি করাকে তিনি 'মতন পড়া' বলেছেন। একদিকে পড়াশুনায় বাধ্যবাধকতা না থাকায়, অন্যদিকে আনন্দহীন মতন পাঠ পদ্ধতির পড়াশুনায় তাঁর অনেকটা সময় নষ্ট হয় এবং পড়াশুনার প্রতি বিরাগ জন্মে। এ সময় তিনি আমোদ উল্লাসে পুতুল পূজা ও গ্রামে ঔষধ বিতরণ করে বেড়ান। কবির দলে সহকারীর কাজ করেন। সুতরাং পড়াশুনায় তিনি অত্যন্ত অমনোযোগী হয়ে পড়েন। তাঁর পিতা যে পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, সে পর্যন্ত তাঁর অধীনে থেকে তিনি কিছু কিছু পড়াশুনা করেছেন, পন্দনামা বা গোলস্তান পুস্তক পড়েছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যর পর পারিবারিক শাসন বিধি শিথিল হওয়ায় পড়াশুনার প্রতি গুরুত্ব হ্রাস পায়। একদিন সবক নিলে পরবর্তী তিনদিনও তা ইয়াদ (আবৃত্তি) করার প্রয়োজন পড়ত না। তারপর মতন পড়ায় ছিল একদমই অনীহা। সব মিলিয়ে শিক্ষাজীবন শুরু হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের পরই তাঁর পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। পরিবারে শাসনকর্তা কেউ না থাকায় এবং মায়ের অধিক স্নেহে সেসময় তিনি কিছুটা উচ্ছন্নে যান।

গিরিশচন্দ্রের উচ্ছন্নে যাওয়া জীবনের হাল ধরেন তাঁর বড়দাদা ঈশ্বরচন্দ্র রায়। তিনিই তাঁর পড়াশুনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র রায় তখন 'বিষয় কার্য্যোপলক্ষে' তাঁর শ্বশুর মুনশী রুদ্রেশ্বর গুপ্তের সঙ্গে ঢাকা বাস করতেন। গিরিশচন্দ্রকে তিনি পড়াশুনার জন্য ঢাকায় নিয়ে আসেন। ইংরেজি শিক্ষার জন্য তিনি তাঁকে পোগোজ স্কুলে ভর্তি করে দেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১২ বছর । সেখানে তিনি পনের দিনের মতো সময় Spelling শিখেন। পোগোজ স্কুলে তাঁর ছাত্র জীবনের সূচনা হয় অন্যান্য আট দশজনের মতোই। তিনি পড়াশুনায় ভালো ছিলেন এবং শিক্ষকগণ তাঁর প্রতিদিনের পাঠে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু বিধি বাম–পোগোজ স্কুলের অতি কঠোর শাসন ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের নিষ্ঠুর বেত্রাঘাত তাঁর মনে ইংরেজি শিক্ষার

প্রতি ভীত রাগ জন্ম দেয়। স্কুলে আর যাবেন না বলে তিনি কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। গুরুজনেরা তাঁকে যতই বুঝানোর চেষ্টা করেন যে দুষ্টু ছাত্ররাই বেত্রাঘাত পায়, ততই তাঁর কান্নার মাত্রা বাড়তে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, একদিন প্রধান শিক্ষক দুই তিন জন ছাত্রকে কোন একটি অপরাধে তাঁর সম্মুখে অত্যন্ত বেত্রাঘাত করেন। এটি তাঁর মনে আতঙ্কের জন্ম দেয়। তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো কোনো একসময় এরকম শাস্তি তাঁকেও দেয়া হবে। আতঙ্কিত মনে তিনি স্কুল ত্যাগের স্থির পরিকল্পনা করেন, এবং এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত ক্রন্দন শুরু করেন। অতএব এখানেই তাঁর পোগোজ স্কুলের পড়াশুনা অধ্যায় সমাপ্ত হয়। কেবল যে বেত্রদণ্ডের ভয়েই স্কুল পরিত্যাগ করেন তা নয়, স্বাধীনচারী গ্রাম্য বালক গিরিশচন্দ্রের পক্ষে স্কুল গৃহের একাসনে দীর্ঘসময় বসে থাকাও সম্ভব ছিল না।[১৭] ইংরেজি শিক্ষার ব্যর্থতাকে তিনি বিধাতার অমোঘ নিয়ম ও আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য শেষ জীবনে তিনি ইংরেজি চর্চার চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হননি।

পোগোজ স্কুল ত্যাগের পর গিরিশচন্দ্র পুনরায় ফারসি চর্চা শুরু করেন। প্রথমে ঢাকা শহরে মুনশী রুদ্রেশ্বর - এর কাছে পরে একজন মুসলমান মুনশীর কাছে ফারসি পাঠ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথাবদ্ধ শিক্ষার গতানুগতিক প্রণালী ও শিক্ষায় অমনোযোগিতার দরুণ তাঁর অধ্যয়ন ফলপ্রসু হয়ে উঠেনি। পরবর্তী সময়ে তিনি সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত হামছাদি পল্লীতে মামার বাড়িতে মায়ের সঙ্গে কিছুকাল বসবাস করেন। সেই গ্রামের অদূরে পারস্য ভাষা পণ্ডিত তাঁর পিশে মশায় উমানাথ গুপ্তের কাছে পড়াশুনা শুরু করেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন স্থির হয়নি। "ভুবনের ঘাটে ঘাটে গিরিশ সেনের তরী শুধু ফিরে ফিরেই বেড়ায় কিন্তু কোন ঘাটেই তরী ভিড়ে না।"[১৮] অবশেষে তিনি ঢাকা, সুবর্ণগ্রাম ও হামছাদি গ্রামের পালা শেষে নিজগ্রাম পাঁচদোনায় ফিরে আসেন। পাঁচদোনায় ফিরে একটানা তিন চার বছর তিনি এখানেই বাস করেন। এ সময়ে পাঁচদোনার পার্শ্ববর্তী শানখলা নামক গ্রামে পারস্য ভাষাবিজ্ঞ মুনশী কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কাছে তিনি ফারসি চর্চায় রত হন। ফারসি ভাষার বচন বিন্যাসে বাগনৈপুণ্যে ও রসিকতায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র প্রতিদিন সকালে বই বগলে নিয়ে সানখলা গ্রামে গিয়ে তাঁর কাছে পারস্য ভাষা চর্চা করতেন। শিক্ষার প্রয়োজনে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়িতে কিছুদিন অবস্থানও করেছিলেন। তাঁর কাছেই গিরিশচন্দ্র 'তওয়ারিখ জাঁহাগির' 'মাদনোজ্জওয়াহের', 'মহব্বতনামা', 'বহরদানেশ' 'সেকন্দরনামা', 'রোক্কাতে ইয়ার মোহাম্মদ' ইত্যাদি ফারসি গ্রন্থ পাঠ করেন। ফারসি চর্চায় কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে যে তিনি সর্বাধিক ঋণী ছিলেন একথা তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে ফারসি চর্চার আগে অন্যান্য গুরুর কৃপায় তিনি পারস্য গদ্য পদ্য ও কাব্যাদির মর্ম ও উপদেশ নিরপেক্ষভাবে পাঠ করতে ও বুঝতে পারতেন বটে কিন্তু তখনো বাংলা বা পারস্য বচন বিন্যাস করে শুদ্ধ দুই এক ছত্র বাক্য রচনা করার শক্তি অর্জন করেননি। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পঠন পাঠন পদ্ধতি তাঁর ফারসি শিক্ষায় একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছিল।[১৯] বাগবৈদগ্ধ রস সরসতায় পটু এ কৃষ্ণচন্দ্র সাধারণ মানুষের কাছে বাঁকা কৃষ্ণচন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মদ্যপায়ী ছিলেন। তিনি গিরিশচন্দ্রের পাশে বসেই মদ্য পান করতেন। মদ না খেলে বুদ্ধির স্ফূর্তি হয় না, ভাল শিক্ষা হয় না এসব বলে গিরিশচন্দ্রকে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র কখনো মদ স্পর্শও করেননি। কৃষ্ণচন্দ্র একা বাস করতেন। ভদ্র পরিবারের একজন বিধবা নারী তাঁর গৃহে অবস্থান করে তাঁকে দুবেলা রান্না করে দিত। তাঁর সেবা শুশ্রূষা করত। জনশ্রুতি ছিল, সে নারীর সঙ্গে তাঁর অপবিত্র যোগ ছিল। মদ্যপ্রিয়তা এবং নৈতিক স্খলন

তাঁর চরিত্রকে কলুষিত করেছিল। গিরিশচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের মদ্যাসক্তির দিকে দৃষ্টিপাত না করে তাঁর কাছ থেকে ফারসি জ্ঞানের নির্যাসটুকু গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠ গ্রহণের ফাঁকে তিনি কিছুদিন সুবর্ণগ্রামে (বর্তমানের সোনার গাঁ) অঞ্চলের বৈদ্যপাড়া বোনের বাড়িতে থেকে একজন মুসলমান মুনশীর কাছে 'গোলস্তান'এর কিছু অংশ অধ্যয়ন করেন। মোঘল আমলের শেষ দিকে ফারসি চর্চার যে অব্যবহিত ঢেউ বাংলার হিন্দু-মুসলমান সমাজে সাড়া জাগিয়েছিল ইংরেজ আমলের শুরুতেও তা ম্রিয়মান হয়নি। এ ভাষা চর্চায় তখন সাম্প্রদায়িক কোনো ভেদবুদ্ধির অবকাশও ছিল না। "গিরিশ সেনের 'আত্ম-জীবন' পড়ে বুঝা যায় একদা মোগল রাজধানী ঢাকার কোনও কোন দূরবর্তী অঞ্চলেও বিশেষত বৈদ্য সমাজের মধ্যে ফারসি শিক্ষার কী ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ফারসি ভাষাচর্চা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির লেশমাত্রও ছিল না। গোঁড়া অভিজাত হিন্দু (বৈদ্য) বাড়িতে এসে রীতিমাফিক নামাজ পড়ে মুসলমান মোল্লা ফারসি পড়াতেন আর হিন্দু ছাত্র 'বেসমিল্লা আর রহমান আর রহিম' বচন উচ্চারণ করে বিনা দ্বিধায় মুসলমান-মোল্লা বা মুন্সীর কাছে পাঠাভ্যাস করত।"[২০]

গিরিশচন্দ্রের পড়াশুনার অগ্রগতির মন্থর অবস্থা পর্যালোচনা করে তাঁর পরিবার তাঁকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এরপর পারিবারিক সিদ্ধান্তে তিনি তাঁর ছোটদাদা হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে ময়মনসিংহে চলে আসেন। হরচন্দ্র সেখানে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবসা করতেন। তাঁর সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য ও বিশেষ কবিত্ব ছিল। গিরিশচন্দ্র ময়মনসিংহের ডিপুটি ম্যাজিস্টেট ও কাজী মৌলবী আবদুল করিম সাহেবের কাছে 'রোক্কাতে আল্লামী' অধ্যয়ন করেন। এখানেই তাঁর ফারসি চর্চার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ সময়ে ময়মনসিংহের তদানীন্তন জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভগবানচন্দ্র বসুর উদ্যোগে একটি সংস্কৃত স্কুল স্থাপিত হয়। বিক্রমপুর নিবাসী পার্বতীচরণ তর্করত্ন সে স্কুলের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্র দাদার অনুমতিতে সে স্কুলে ভর্তি হন। একাগ্রতা ও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সংস্কৃত অধ্যবসয়ে মগ্ন হলেন। এই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তিনি মনোযোগী হয়ে ওঠেন। এর সাফল্যও আসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সংস্কৃত কাব্য চর্চা শুরু করেন। প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত উপক্রমণিকা ব্যাকরণ ও ঋজু পাঠ প্রথম ভাগ পড়তে আরম্ভ করেন। তিনি ছিলেন ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বিদ্যা, বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তিতে তিনি দুর্বল ছিলেন। কিন্তু গভীর অভিনিবেশ, অধ্যবসায় ও একাগ্রতায় তিনি প্রতিদিনের পাঠ তৈরী করতেন। তাঁর পরিশ্রম এবং পড়াশুনার আন্তরিকতায় পণ্ডিত মহাশয় সন্তুষ্ট হন। অল্পদিনের মধ্যে গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত কবিতা রচনা করার ক্ষমতা অর্জন করেন। এতদিনের অশান্ত, অমনোযোগী, চঞ্চল গিরিশচন্দ্র এখানে অনেকটাই আত্মপ্রত্যয়ী, বলিষ্ঠ ও ধীর মনোভাবে দীপ্ত ছিলেন। প্রতিদিন তর্করত্ন ও হরচন্দ্র এক একটি সমস্যা পূরণ করতে দিতেন, আর তিনি সে শ্লোকের অন্তঃচরণের সঙ্গে মিল রেখে প্রথম তিন চরণ অনায়াসে পূরণ করে দিতেন। গিরিশচন্দ্রের এ প্রতিভায় তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হতেন । কারণ 'উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ' পড়ে এরূপ সমস্যা পূরণ কিছু আশ্চর্যের বিষয় ছিল।[২১] এরপর তিনি ছোটদাদা হরচন্দ্রের কাছে সংস্কৃত চর্চা করেন। 'কুমার সম্ভব', 'রঘুবংশ', 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

পরবর্তী সময়ে তাঁর আর সংস্কৃত চর্চা করা হয়নি। সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় সংস্কৃত কাব্য চর্চাও থেমে যায়।

ময়মনসিংহের 'হার্ডিঞ্জ বঙ্গ বিদ্যালয়' অত্যন্ত প্রাচীন ও উন্নত শিক্ষার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সে স্কুলে তখন শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য নর্মাল শ্রেণি স্থাপিত হয়। গিরিশচন্দ্র বাংলা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি কিছু কিছু আলোচনা করে সেখানে ভর্তি পরীক্ষা দেন। তিনি গণিত খুব একটা জানতেন না, কোনো এক সহপাঠির সাহায্যে গণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন এরূপ কাজকে তাঁর অন্যায় বা অনীতি বলে মনে হয়নি, সে সময়ে এ অনীতির পথ গ্রহণ করা স্বাভাবিক বোধ হতো, এবং অনেকেই এ পথ অবলম্বন করতেন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের মধ্যে তিনি প্রথম হন এবং ছাত্রীয় বৃত্তি পান। নর্মাল শ্রেণির শেষ পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম রূপে গণ্য হন। নর্মাল শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়েই শেষ হয় গিরিশ সেনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। গিরিশ সেন কৃচ্ছ সাধনায় নীতি আদর্শ বোধের মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। অত্যন্ত সাধারণ, আড়ম্বরহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে অর্থের অপচয়ে অন্তঃসারশূন্য বাবুয়ানা চালে গা ভাসিয়ে দেননি। বাস্তব জীবন সত্যকে অস্বীকার করে, কালিক হাল ফ্যাশনের গড্ডালিকা প্রবাহে তিনি নিমজ্জিত হননি। নিজের সুখ বিলাসের জন্য তিনি পরিবার থেকে অর্থ শোষণ করেননি। বরং সামান্য আয় থেকে সঞ্চয় করে পরিবারকে দিতেন। ছাত্র জীবনে নিজ হাতে রান্না করে খেতেন। কম দামী জামা-কাপড় চটি ব্যবহার করতেন, জলখাবার হিসেবে পেতেন সামান্য চিড়া মুড়ি। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন'এ বলেন,

> "আমি কৃতবিদ্য পণ্ডিত হই নাই, গরিবানা রূপে যৎকিঞ্চিত লেখাপড়া শিখিয়াছি, চিরকাল গরিবানা চালে চলিয়া আসিয়াছি। আমি এক টাকা দেড় টাকার অধিকমূল্যের বিনামা বোধ হয় কখনও চরণে স্পর্শ করি নাই, বাল্যকালে তিন চারি আনা মূল্যের তালতলার চটি জুতা ব্যবহার করিয়াছি। তাহাও প্রায় তোলা থাকিত, আমি সর্ব্বদা এক আনা দেড় আনা মূল্যের কাষ্টপাদুকাই ব্যবহার করিতাম। কখনও কোন কুটুম্বালয়ে যাইতে হইলে বিনামা জোড়া চরণ স্পর্শ করিত। ... আমি ছাত্রীয় জীবনে সামান্য পিরাণ বা মির্জাই কখন কখন ব্যবহার করিতাম, সর্ব্বদা নয়। বিকালে জল খাওয়ার জন্য চিড়ে মুড়ী লাড়ু ইত্যাদিই নির্দ্দিষ্ট ছিল।... এখন ছাত্রগণ বাটি বাটি চায়ের জল পান করে, এবং সর্ব্বাঙ্গে সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া থাকে। এ সকল বিলাসিতার সঙ্গে আমার কখনও কোন সম্পর্ক ছিল না, এখনও নাই।"[২২]

ছাত্রজীবন শেষে সংসার জীবন ও পেশাগত জীবনে অতিবাহিত হয়েছিল বেশ কয়েক বছর, তারপর ধর্মজীবন। ধর্ম জীবনে এসে ৪২ বছর বয়সে আবার তিনি শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হন। আচার্য কেশব সেনের কাছ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ১৮৭৬ সালে লক্ষ্ণৌ নগরে আরবি ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে যান। এ ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল মোসলমান জাতির মূলধর্ম শাস্ত্র কোরআন পাঠ করে ইসলাম ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হওয়া। লক্ষ্ণৌ নগরে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মবন্ধু শিবকৃষ্ণ চক্রবর্তীর সাহায্য সহযোগিতায় সুবিজ্ঞ বৃদ্ধ মৌলবী এহসান আলি সাহেবের কাছে আরবি ব্যাকরণ ও 'পারস্য দেওয়ান হাফেজের' চর্চা করেন। লক্ষ্ণৌ নগর থেকে ফিরে এসে কলকাতায় একজন মৌলবী সাহেবের কাছে কিছুদিন আরবি চর্চা করেন। তারপর সেখান থেকে ঢাকার

নলগোনা পল্লীতে মৌলবী আলিমোদ্দিন সাহেবের কাছে আরবের ইতিহাস ও সাহিত্য আলোচনা করেন। এভাবে আরবি ভাষা ও আরবের সাহিত্য, ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পর কোরআন পাঠে মনোযোগী হন এবং কোরআন বঙ্গানুবাদের দুঃসাহসিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

গিরিশচন্দ্র সেনের বৈচিত্র্যময় শিক্ষা জীবনের সমৃদ্ধিময় পরিব্যাপ্তি ঘটেছিল আরবি, ফারসি, বাংলা ও সংস্কৃত চর্চায়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার স্মারক রূপে সার্টিফিকেট তিনি অর্জন করেননি। একমাত্র নর্মাল শ্রেণিতে তিনি উত্তীর্ণ হন আর বাকি সময় জুড়ে তিনি আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, বাংলা ও সামান্য ইংরেজি চর্চা করেন গৃহশিক্ষকের সহায়তায়। কিন্তু আরবি-ফারসি অনুবাদে, সংস্কৃতে কাব্যচর্চায় আর বাংলায় সাহিত্য রচনায় তিনি যে কলানৈপুণ্য, পাণ্ডিত্য ও যশস্বিতা দেখিয়েছেন তা সত্যিই অতুলনীয়।

ঘ. কর্মজীবন

অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক, গোছালো, ধারাবাহিকতার ছত্রছায়ায় গিরিশচন্দ্রের বাল্য, কৈশোর এবং শিক্ষা জীবন অতিবাহিত হয়নি। ছোট বয়সে পিতৃবিয়োগ, মায়ের অত্যধিক স্নেহ, প্রাপ্তির আতিশয্য, পারিবারিক ধর্মচর্চার বাড়াবাড়ি, শাসনহীন স্বাধীনতা বার বার তাঁর শিক্ষা জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দেয়। জীবনের কোনো স্থির অভিপ্রায়ে শিক্ষা চর্চায় তিনি আত্মনিয়োগ করেননি। প্রথমে ফারসি চর্চা, পরে ইংরেজি চর্চার ব্যর্থতা, আবার ফারসি চর্চা–এভাবে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাঁর জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্দেশ্যহীন তরীর হাল ধরেন ছোটদাদা হরচন্দ্র রায়। তিনি তাঁকে তাঁর কর্মস্থল ময়মনসিংহে নিয়ে যান। সেখানে তিনি প্রথমে কাজী মৌলবী আবদোল করিম সাহেবের কাছে রোক্কাতে আল্লামী অধ্যয়ন করেন। তারপর মৌলবী সাহেবের উপদেশ ও ছোটদাদার ইচ্ছেতে তিনি মৌলবী সাহেবের কাছারিতে নকলনবিশীর কাজ শুরু করেন। শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। প্রথমে তিনি দাদা সৃষ্টিধর রায়ের সেরেস্তাতেই নকলনবিশের কাজ পান। তাঁর কয়েকজন আত্মীয় বহুকাল হতে এখানে নকলনবিশের কাজ করছিলেন। তাঁরা এক এক জন প্রতিমাসে ৫০/৬০ টাকা উপার্জন করতেন, গিরিশচন্দ্র তাঁদের অধীনে কাজ শুরু করেন। তাঁরা চাপ্‌কান পরে মাথায় পাগরি বেঁধে কাছারীতে যেতেন। আর গিরিশচন্দ্র ধুতি চাদর পরে কানে কলম গুঁজে সাদাসিধে রূপে সেরেস্তায় গিয়ে বসতেন। তিনি তেমন পড়াশুনা করেননি সত্য কিন্তু অন্যদের পড়াশুনার দৌঁড় দেখে তিনি বিস্মিত হতেন। তাঁরা লেখতেন, 'জাদুকৃষ্ট জাত্রাপুরে জাইয়া জদুনাথকে অকারণ মাইর পিট করিয়া জন্ত্রনা দিয়াছে'। গিরিশচন্দ্র তাঁর ণ-ত্ব, ষ-ত্ব জ্ঞানের দ্বারা তাঁদের অশুদ্ধ বর্গীয় জ স্থানে অন্তস্থ য, দন্ত্য-ন স্থানে মূর্ধন্য-ণ দিয়ে যখন শুদ্ধ করে লেখতেন 'যদুকৃষ্ণ যাত্রাপুরে যাইয়া যদুনাথকে অকারণ মারপিট করিয়া যন্ত্রণা দিয়াছে।' তখন তাঁরা তা নিয়ে হাস্য-পরিহাস ও বিদ্রূপ করতেন। কি আর করা? পরিশেষে তিনি অশুদ্ধ লেখতেই বাধ্য হন। সেখানেও তাঁদের মধ্যে তিনি সাধারণ নীতিবোধের আয়োজন দেখেননি। তাঁরা সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার সময় অফিসের কালি ও কাগজ বাড়িতে নিজেদের লেখাপড়ার জন্য সঙ্গে নিয়ে যেতেন। গিরিশচন্দ্রও তাঁদের অনুসরণ করতেন। সে সময় এসব কাজ তাঁর কাছে অধর্ম বা অনীতি বলে মনে হয়নি। নকলনবিশ থাকাকালীন তিনি কাজকর্মে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারেননি। ছয় মাস কাজ করে তিনি মাত্র একটি টাকা উপার্জন করেন তা-ও নিজ যোগ্যতায় নয়, উপরিস্থ নকলনবিশগণ অনুগ্রহবশত তাঁকে একটি টাকা দিয়েছিলেন। যোগ্যতাহীন, উপার্জনাক্ষম গিরিশচন্দ্র এসময় তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেন। আত্মানুশোচনা, আত্মগ্লানির তীব্র সংকটে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। অন্যান্য নকলনবিশ যেখানে প্রতি মাসে ৫০/৬০ টাকা উপার্জন করেন, সেখানে তিনি ছয় মাসেও কোন উপার্জন করতে পারেননি। ব্যর্থতা, দীনতা ও নৈরাশ্যের করাল থাবা তাঁর জীবনের শেষ সান্ত্বনাটুকুও তছনছ করে দেয়। আত্মগ্লানি ও অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি বেশ কয়েকবার আত্মহননের পথেও উদ্যোগী হন। তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন'-এ বলেন, "এই সময় আমার অন্তরে ঘন বিষাদের ছায়া পড়ে, আমি মনে একবিন্দু শান্তি পাইতেছিলাম না, যেন অনলে দগ্ধ হইতেছিলাম। আমার বিদ্যাবুদ্ধি যোগ্যতা কিছুই নাই, আমি মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত, এইভাব সর্ব্বদা মনে

হইত, আর আপনাকে ধিক্কার দিতাম। আমি দুইতিনবার মানসিক যন্ত্রণায় আত্মঘাতী হইবার উদ্যোগী হইয়াছিলাম।”[২৩]

নকলনবিশের চাকরি কালে তিনি তাঁর জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, রিক্ততা, দীনতা ও ব্যর্থতাকে তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন। বিদ্যাবুদ্ধি ও যোগ্যতায় তিনি নিজেকে হীন মনে করতে থাকেন। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দহনে তিনি যখন বিপর্যস্ত তখন ময়মনসিংহে একটি সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপিত হয়। এ সময়ে এসে তিনি পড়াশুনায় অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠেন এবং কৃতিত্বের সাথে কাব্য চর্চাও শুরু করেন। পড়াশুনা বিষয়ে তাঁর ‘শিক্ষাজীবন’ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নর্মাল শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি ‘ঢাকা প্রকাশ’ নামক একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে ময়মনসিংহের সংবাদদাতা ছিলেন। তবে সাংবাদিকতা পেশাও তাঁর জীবনে দীর্ঘস্থায়ী ও সুখকর হয়নি। এ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলেন,

> “অবশেষে আমি ‘ঢাকা প্রকাশ’ নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে ময়মনসিংহের সংবাদদাতা হই। বিচারদিগের চরিত্র ও বিচার কার্য্যাদির বিরুদ্ধে আমি যাহা সমালোচনা করিতাম গবর্ণমেন্ট প্রায়ই তাহার অনুসন্ধান লইতেন। একবার আমি ময়মনসিংহের সাবর্ডিনেট জজ মৌলবি মোহম্মদ নাজেমের বিরুদ্ধ লেখনী চালনা করি। গবর্ণমেন্ট হইতে তাঁহার কৈফিয়ত তলব হয়, তাহাতে মৌলবি সাহেব অস্থির হইয়া পড়িলেন, আমি সংবাদদাতা ইহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে অপমানিত করিবার জন্য আপনার নাজির যোগে ডাকিয়া পাঠান, আমি তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া তাঁহার নিকট যাইতে সম্মত হই নাই। ময়মনসিংহের সবডিবিশন জামালপুরের সবডিভিশনল অফিসার একজন ফিরিঙ্গী ছিলেন, আমি ঢাকা প্রকাশে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করি। গবর্ণমেন্ট হইতে তাঁহার অনুসন্ধান হয়। সেবার আমার নামে মানহানির মোকদ্দমা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বাস্তবিক সবডিভিশনল অফিসর নির্দ্দোষী ছিলেন, তাঁহার ভাগিনেয়ের দোষ ছিল। আমি শুনিতে ভুল করিয়া ভাগিনেয়ের দোষ মামার উপর চাপাইয়াছিলাম। কোন কোন বন্ধুর যত্নে লাইবেল কেস হইতে পারে নাই, আমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও হয় নাই।”[২৪]

সাংবাদিক হিসেবে তিনি সাহসিকতা, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দেন। তাঁর নির্ভরযোগ্য, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সরকার প্রায়ই বিচারকার্য ও বিচারকদের চরিত্র নিয়ে অনুসন্ধান চালাতেন। তবে কখনো কখনো স্বভাবসুলভ চাপল্যে বিরুদ্ধ অবস্থাতেও পড়েছিলেন। নর্মাল শ্রেণির পড়াশুনা শেষে গিরিশচন্দ্র ময়মনসিংহের হার্ডিঞ্জ স্কুলের নিম্নশ্রেণির অন্যতর শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। শুরু হয়েছিল তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন। এ সময় তাঁর জীবনে কিছুটা স্থিতি নেমে এসেছিল। তারপর হঠাৎ করেই ছোটদাদা হরচন্দ্র রায়ের মৃত্যু ঘটে। ছোটদাদা ছিলেন তাঁর জীবনে ছায়াময় বটবৃক্ষ। তাঁর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকার্ত, অসহায় ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়েন। কিছুদিন বাড়িতে অতিবাহিত করার পর বিষণ্ন মনে তিনি তাঁর কর্মস্থল ময়মনসিংহে ফিরে যান। ময়মনসিংহে হরচন্দ্রের অনেক বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন ছিল। হরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি তাঁদের অত্যন্ত স্নেহ ভাজন হয়ে ওঠেন। তাঁদের আগ্রহ ও অনুরোধে স্কুল কমিটি তাঁকে অপেক্ষাকৃত উন্নত পদে নিয়োগ প্রদান করেন। তাঁর সহাধ্যায়ী বন্ধু শ্রীযুক্ত রামসুন্দর দত্ত তাঁর ওপরের শ্রেণির

শিক্ষক ছিলেন। তারও ওপরের শ্রেণির শিক্ষকের পদ শূন্য হয়েছিল। সে পদ রামসুন্দর নিজে গ্রহণ না করে গিরিশচন্দ্র যাতে পান সেজন্য সহায়তা করেন। এ বিশেষ অনুগ্রহকে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন আজীবন।

এরপর হার্ডিঞ্জ স্কুল ছেড়ে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের পণ্ডিত পদে তিনি কর্মরত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতা, স্ত্রীর উৎসাহ, স্ত্রীকে নিয়ে ময়মনসিংহে বাস, সনাতন হিন্দুদের বৈরীতা, নানাবিধ দুর্যোগ, অবশেষে স্ত্রীর মৃত্যু, স্ত্রী বিয়োগজনিত মানসিক অস্থিরতা ও ব্রাহ্মবন্ধু গোপীকৃষ্ণ সেনের বিরোধিতা–বিচিত্র কারণে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। ময়মনসিংহের জেলা স্কুলের পণ্ডিতের চাকরী ত্যাগ করে ১৮৭৫ সালে কলকাতায় ১৩ নং মির্জাপুর স্ট্রিট ভারতাশ্রমে অবস্থান করেন। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর রুচি ও প্রকৃতি বুঝে তাঁকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেন। গিরিশচন্দ্র সেখানে ছাত্রীদের বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়াতেন। এরপর কয়েক বছর তিনি এ শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরে দেশ-দেশান্তরে প্রচার কার্যের সঙ্গে ব্যাপৃত হওয়ায় তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। গিরিশচন্দ্রের পেশা জীবন খুব বর্ণাঢ্য ছিল না। প্রচারাভিযানে যোগদানের পরই তাঁর কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটে। তাঁর পেশাগত কর্মজীবন ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আবদ্ধ। এরপর আজীবন তিনি প্রচারব্রতেই ব্যপ্ত থেকেছেন।

ঙ. সংসারজীবন

স্বভাব সুলভ চাঞ্চল্যে অস্থির যুবা গিরিশচন্দ্র স্থির লক্ষ্যে জীবনে স্থিত হতে পারেননি। শিক্ষা-দীক্ষায় বার বার বাঁক পরিবর্তন আর প্রাথমিক কর্মজীবনে ব্যর্থতার অনুবর্তনে তাঁর জীবনের ১৮-১৯ বছর অপচয়ে কেটেছে। নর্মাল শ্রেণি পাশের কিছুদিন পরে তিনি হার্ডিঞ্জ স্কুলের নিম্নশ্রেণির অন্যতর শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষকতায় যোগদানের পর তাঁর জীবনে কিছুটা স্থিরতা আসে। সে স্থিরতার ধারাবাহিকতায় তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সময়টা তখন ১৮৫৬ কি ১৮৫৭ সাল। তখন তিনি একুশ বা বাইশ বছরের যুবক। পত্নীর নাম ব্রহ্মময়ী। বাড়ি পাঁচদোনা থেকে দেড়/ দু মাইল উত্তরে ভাটপাড়া গ্রামে। বিয়ের কিছু দিন পর তিনি তাঁর কর্মস্থল ময়মনসিংহে ফিরে যান। স্ত্রীকে রেখে গেলেন পাঁচদোনায় তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানে। তখনও শুরু হয়নি তাঁর দাম্পত্য জীবন। ছোট্ট বধূ, তাঁকে শিখে নিতে হবে সংসারের সমস্ত কলাকৌশল, দায়দায়িত্ব। তাঁকে অর্জন করতে হবে যাপিত জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা। এ প্রসঙ্গে রঞ্জন গুপ্ত বলেন, "স্ত্রী রইলেন পাঁচদোনায়, শাশুড়ি ও অন্যান্য গুরুজনদের সেবা-শুশ্রূষা করতে আর সংসার ধর্ম শিখে নিতে। প্রকাণ্ড বাড়ি, বিশাল পরিবার, সম্ভবত একান্নবর্তী। শ্বশুরবাড়িতে থেকে বালিকা বধূটি শিখে নেবেন পরিবারের ছোট-বড়, সমবয়স্ক, অন্দর মহলের পরিচারিকা, কার সঙ্গে কীভাবে চলতে হয়, কীভাবে সকলের মনোরঞ্জন করে, প্রয়োজনে আত্মবিসর্জন দিয়ে, অভিজাত গোঁড়া হিন্দুবাড়িটির 'গৃহলক্ষ্মী' হতে হয়।"[২৫]

স্ত্রী থাকতেন পাঁচদোনায় আর গিরিশচন্দ্র ময়মনসিংহে। বিয়ের পর গিরিশচন্দ্র পারিবারিক প্রয়োজনে বছরে দু একবার পাঁচদোনায় আসতেন। সে সময়ে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার প্রচলন খুব একটা ছিল না। ব্রহ্মময়ী দেবীও পড়াশুনা জানতেন না। তখনকার দিনে হিন্দু ঘরের রীতি অনুয়ায়ী খুব ছোট বয়সে ব্রহ্মময়ীর বিয়ে হয়। গিরিশচন্দ্র স্ত্রীকে মনের মতো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তাঁকে লেখাপড়া শেখানোর তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তৎকালীন সমাজে দিনের বেলা স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ ছিল বিশেষ নিন্দনীয় ব্যাপার। এতে নাকি স্বামীর আয়ুক্ষয় হয়। যদি কোনো কারণে দিনের বেলায় স্বামী স্ত্রীর দেখা হয়ে যেত, তবে স্ত্রীকে একগলা ঘোমটা টেনে আড়ালে চলে যেতে হতো। এমনই গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু পরিবারের বউ ছিলেন ব্রহ্মময়ী। সে পরিবারের বউদের শিক্ষা গ্রহণ কতটা দুর্ভোগের আর অসম্ভব ব্যাপার তা ভুক্তভোগী মাত্রই বলতে পারবেন। সকল প্রতিকূলতা পেরিয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে পড়াশুনা করানোর উদ্যোগ নেন। গভীর রাতে প্রদীপের আলোতে তিনি স্ত্রীকে পড়াশুনা করাতেন। শিক্ষার উপযুক্ত সময় হিসেবে রাতটাকেই বেছে নেন তাঁরা।[২৬] একটি উদার মানসিক পরিমণ্ডলে আবর্তিত হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা। ব্রহ্মময়ী দেবী ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। পারিপার্শ্বিক সংকীর্ণতা, নির্মমতা সহ্য করার মতো আশ্চর্য মনোবল তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর স্বামী গিরিশ সেনের কাছ থেকে। গিরিশচন্দ্র তখন ব্রাহ্মসভ্য। কেবশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে তিনি মুগ্ধ হন এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এক সময়ের 'গোঁড়া হিন্দু পৌত্তলিক' গিরিশচন্দ্র সময়ের বিবর্তনে ব্রাহ্মধর্মের একনিষ্ঠ সেবকে পরিণত হন। তিনি তাঁর স্ত্রীকেও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। গোঁড়া শাক্ত পরিবারের পুত্রবধূ হলেও ব্রহ্মময়ী স্বামীর ধর্মকেই পরম ধর্ম বলে মেনে নেন এবং যত

অত্যাচারই আসুক না কেন তা সহ্য করার প্রতিজ্ঞা করেন। প্রিয়বালা গুপ্তা তাঁর মানসিক দৃঢ়তা সম্পর্কে 'স্মৃতিমঞ্জুষায়' বলেন,

> "বাড়িতে ষষ্ঠীপুজো। প্রত্যূষে বাড়ির বৌ, গিন্নী, মেয়ে সবাই স্নান ক'রে শুদ্ধ শান্ত হয়ে পুজোর যোগাড় করবে, তারপর পুজোর পর ষষ্ঠী দেবীর পাঁচালি শুনে স্নেহভাজনদের মাথায় ধান দুর্বা ও দেবীর প্রসাদ সবার হাতে হাতে বিতরণ ক'রে তবে নিজেরা যা হোক কিছু মুখে দেবেন। এ পর্যন্ত উপবাসী থাকতে হবে। সবাই স্নানের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছোট বৌকে ডাকছেন, 'ওঠো, সূর্য ওঠবার আগে স্নান ক'রে আসা যাক।' নির্ভীক বধূ উত্তর দিল, 'আপনারা যান। আমার পুজো করা হবে না। আমি পান খেয়েছি। ' মহিলার দল স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কারোর মুখেই কথা নেই। কিন্তু যখন শাশুড়ী-শ্রেণীর চৈতন্য ফিরে এলো তখন চল্ল তার অমোঘ উত্তর। ঘর থেকে চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে ধর্মত্যাগিনীর উপর চল্ল অমানুষিক অত্যাচার। এবং তাতেও মনের শান্তি না আসায় ঘরের দরজা বন্ধ করে দিনরাত্রি উপবাসের ব্যবস্থা হলো। স্বামী তখন বিদেশে। কে তাঁকে অভয় দেয়? কে দেয় তাঁকে সান্ত্বনা? পরে নাকি স্বামীকে চিঠিতে কিছু কিছু বিবরণ দিয়ে লিখে ছিলেন, 'শুনেছি স্বামী নাকি পরম গুরু। আমি সেই পরম (গুরুর) কথার উপর নির্ভর ক'রে এত নির্যাতন সহ্য করছি'।"[২৭]

পরম সহিষ্ণু এই দেবীকে গিরিশচন্দ্রও অত্যন্ত গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তাঁদের বিয়ের বছর দুয়েক পরে পারিবারিক পরামর্শে মা, ছোটদাদার স্ত্রী এবং নিজের স্ত্রীকে নিয়ে ময়মনসিংহে বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঁচদোনা নিজবাড়ি থেকে নৌকাযোগে ময়মনসিংহের কর্মস্থলের দিকে তাঁরা রওনা হলেন। সেসময় জলপথে পাঁচদোনা হতে ময়মনসিংহে যেতে হলে চার / পাঁচ রাত পথে যাপন করতে হতো। বড়দাদা ঈশ্বরচন্দ্র রায় সঙ্গে যাচ্ছিলেন বাড়িঘরের ব্যবস্থা করার জন্য। অর্ধপথ অতিক্রম করার পর মধ্যাহ্নে তাঁরা নৌকা পাড়ে ভিড়ালেন। নৌকায় রান্নাবান্নার পর স্নানান্তে তাঁরা ভোজন করতে বসেছিলেন এমন সময় গিরিশচন্দ্র তাঁর ছোটদাদা হরচন্দ্র রায়ের দেহত্যাগের দুঃসংবাদ পান। আকস্মিক এ দুঃসংবাদে তাঁরা হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। হরচন্দ্র ময়মনসিংহ শহরে তাঁর নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকে পড়াশুনা করতেন জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান প্রসন্নচন্দ্র সেন। কৃষ্ণগোবিন্দ, প্রসন্ন এবং প্রবোধচন্দ্র রায়ের (প্রসন্নের পিতা) কাছ থেকে তাঁরা এ নিদারুণ দুঃসংবাদ পান। এ সংবাদ যেন তাঁদের কাছে বিনামেঘে বজ্রপাত। সুতরাং শোকদগ্ধ হৃদয়ে নৌকার গতি ফিরিয়ে পাঁচদোনার দিকে রওনা হলেন। হরচন্দ্রের মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্র দিশেহারা হয়ে উঠেন। পাঁচদোনার বাড়ির সর্বত্র শোকের ছায়া ঘনীভূত হয়ে উঠে। এক শোক ভুলতে না ভুলতেই আরেক অশুভ সংকেত সে বাড়িকে আবারও কাঁপিয়ে দিল। হরচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকাল যেতে না যেতেই তাঁর স্ত্রী বিসূচিকা রোগে প্রাণতাগ করেন। তারপর তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়দর্শন হেমচন্দ্রও কিছুদিন পর তাঁদের প্রদর্শিত পথে দেহত্যাগ করেন। বেঁচেছিলেন শুধু শ্রীমান ইন্দুভূষণ। এ ইন্দুভূষণ পরবর্তীকালে দাদীমা ও পিসিমার কাছে লালিত পালিত হন।

ছোটদাদার পারলৌকিক কর্মকাণ্ডের পর গিরিশচন্দ্র পুনরায় ময়মনসিংহে ফিরে যান। হরচন্দ্র সেখানকার অনেক বড়লোকের পরম প্রিয়পাত্র ও আত্মীয় ছিলেন। তাঁরা তাঁর সাহায্য-সহযোগিতায় বন্ধুবেশে এগিয়ে আসেন। গিরিশচন্দ্র তাঁদের এ অবদান অত্যন্ত বিনয়চিত্তে তাঁর 'আত্ম-জীবন' এ স্মরণ করেছেন–

> "তাঁহারা তাঁহার পরলোকযাত্রায় অতিশয় শোকার্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্য আমি অনেকের বিশেষ স্নেহভাজন হই, বিশেষ বিশেষ লোকের আগ্রহ ও অনুরোধমতে স্কুল কমিটি আমাকে অপেক্ষাকৃত উন্নত পদে নিযুক্ত করেন। কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা যাইতেছে যে, আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু শ্রীযুক্ত রামসুন্দর দত্ত আমার উপরের শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার উপরের শ্রেণীর শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছিল, সেই পদ তিনি নিজে গ্রহণ না করিয়া আমি যাহাতে পাই, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন।"[২৮]

এ সময়ে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতায় তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান শুরু করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী অনুকরণে তখন ব্রহ্মোপাসনা হতো। উপাচার্যের ব্যাখ্যান শোনে তাঁর অন্তর থেকে ব্রাহ্ম বিদ্বেষ দূর হতে থাকে। এ সময়ে তিনি ধীরে ধীরে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে ব্রাহ্মধর্মের দিকে ঝুঁকতে থাকেন। তারপর একদিন সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তিনি প্রতিদিন ব্যাখ্যান পড়তেন এবং প্রতিদিন স্নানান্তে 'নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায়' ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করতেন। সে সময়ে ময়মনসিংহে ব্রাহ্ম আন্দোলন তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজ ব্রাহ্ম ধর্মের উদার মানবিকতাকে যেমন সানন্দে গ্রহণ করে, তেমনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। পারিবারিক ও সামাজিক তীব্র সংকটের মুখে অনেক ব্রাহ্মই প্রায়শ্চিত করে নিজধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য হন। যাঁরা ব্রাহ্মধর্মকেই আঁকড়ে ছিলেন তাঁদের ওপর নেমে আসে সামাজিক নিপীড়ন। গিরিশচন্দ্র সে নিপীড়ন অম্লান বদনে সহ্য করেন তবু ব্রাহ্মধর্মে অটল থাকেন। উগ্র হিন্দু থেকে তিনি পরিণত হন উগ্র ব্রাহ্মে।[২৯] ময়মনসিংহে তিনি একঘরে হয়ে যান। সাহায্য-সহযোগিতা দূরে থাক রান্নার জন্য একজন ভৃত্যও পেতেন না। সামাজিক প্রতিকূলতায় কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। অন্যদিকে, পাঁচদোনার দেওয়ান বাড়িতেও গিরিশচন্দ্রের ধর্মত্যাগে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কেউ তাঁর সহায় ছিলেন না। মা ও বড়দাদা তাঁকে অবৈধ উপায়ে সমাজে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি রাজি হননি। সে দুঃসময়ে বিপন্ন গিরিশচন্দ্রের পাশে শক্তি ও সাহস নিয়ে দাঁড়ান তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মময়ী। তিনি গিরিশচন্দ্রের প্রতি অতিশয় অনুকূল হন, তিনি ছিলেন তাঁর ধর্মপথের একমাত্র সহায় ও বন্ধু। ব্রহ্মময়ী দেবীর উৎসাহ, দৃঢ়তা ও ধর্ম নিষ্ঠা গিরিশচন্দ্রকে তাঁর ধর্মপথে অগ্রসর হতে এবং স্থির থাকতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। ব্রহ্মময়ী দেবী ছিলেন অত্যন্ত সহিষ্ণু, ধীর-স্থির ও প্রত্যয়ী মনোভাবের অধিকারী। তিনি বিপদে-আপদে কখনো ভীত ও বিচলিত হতেন না, বরং গিরিশচন্দ্র চিন্তিত হলে তাঁকে সাহস ও উৎসাহ দান করতেন। সে ঘোরতর পরীক্ষার সময় গিরিশচন্দ্র তাঁর একটি উৎসাহজনক পত্র পেয়ে অত্যন্ত সান্ত্বনা লাভ করেন।"এই বিপদের সময় পুণ্যময়ী ব্রহ্মময়ী উপযুক্ত সহধর্মিণীর কাজ করেছিলেন। একমাত্র তিনিই স্বামীর সহায় ও বন্ধু হ'য়ে উৎসাহ-সূচক চিঠিপত্র দ্বারা তাঁর মনে সাহস যুগিয়েছিলেন। ওদিকে মাতা ও বড়দাদা 'অবৈধ উপায়ে তাকে সমাজে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন। এখন বিদেশে স্বামীর জীবনযাপন দুর্বহ হ'য়ে উঠেছে দেখে তিনি ময়মনসিংহে

আসবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন।"[৩০] গিরিশচন্দ্র তাঁকে কর্মস্থলে আনতে বাধ্য হন। স্বামীর পাশে থেকে, বন্ধুবেশে স্বামীর সুখ-দুঃখগুলোকে আপন করে নিয়ে স্বামীর আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করাই ছিল ব্রহ্মময়ী দেবীর ব্যাকুলতার অভিপ্রায়। নিঃসঙ্গ, সমাজপীড়িত গিরিশচন্দ্র সে ব্যাকুলতাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। নিয়ে এলেন স্ত্রীকে কর্মস্থলে। কিন্তু মাস দেড়েক যেতে না যেতেই দেখা দিল আরেক বিপত্তি। তিনি সপরিবারে মানিকগঞ্জ নিবাসী দুর্গাশঙ্কর গুপ্তের বাড়িতে বাস করছিলেন। দুর্গাশঙ্কর বাবু হঠাৎই তাঁর বাড়ি বিক্রি করে সপরিবারে ময়মনসিংহ ছেড়ে চলে গেলেন। তারকনাথ বাবু সে বাসা ক্রয়ের অল্পদিন পরেই তাঁকে বাসা ছেড়ে দিতে বললেন। তখন গিরিশচন্দ্র পড়লেন মহাবিপদে। হঠাৎ করে কোথায় যাবেন তিনি? ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় সমাজের লোকজন তাঁর প্রতি খড়্গ হস্ত। নিজ বাড়িতে স্থান দান করা তো দূরের কথা বাড়ির পাশেও তাঁকে স্থান দিতে কেউ রাজি ছিলেন না। অবশেষে জেলাস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু কালীকুমার গুহ নিজের বাড়ির পাশে একখণ্ড পতিত জমি তাঁকে ঘর তোলার জন্য প্রদান করেন। তিনি সেখানে একটি গৃহ নির্মাণ করে সস্ত্রীক বসবাস শুরু করেন। এভাবেই পেরিয়ে যায় বছর খানেক সময়। ব্রাহ্মময়ী অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। গিরিশচন্দ্র ছিলেন ধর্মচ্যুত সমাজ পরিত্যক্ত মানুষ। এসময় তাঁর জীবন অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। ময়মনসিংহ শহরে এমন কী স্বগ্রাম পাঁচদোনায় পর্যন্ত প্রসবকালীন দাই পাওয়ার কোনও আশ্বাস তিনি পেলেন না। বাধ্য হয়ে ঢাকার ব্রাহ্ম উপাচার্য বঙ্গচন্দ্র রায়ের অনুরোধে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে আরমানীটোলার ভবনে অবস্থান করেন। কিছুদিন পরে তিনি একটি কন্যা সন্তানের জনক হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, পনের দিন যেতে না যেতেই তিনি পিতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হন। শিশুটি মারা যায়। তখন ব্রহ্মময়ী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার একটি কঙ্কালে রূপ নেয়। এ অবস্থায় সামাজিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ব্রহ্মময়ীর মা সন্তানস্নেহে অধীর হয়ে উঠেন এবং মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নেন। তিনি ব্রহ্মময়ীকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন এবং সেবা শুশ্রূষা করে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন।[৩১] ব্রহ্মময়ীর সুস্থতার পর গিরিশচন্দ্র সস্ত্রীক তাঁর কর্মস্থলে ফিরে যেতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। এতে তাঁর স্ত্রীরও সম্মতি ছিল। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের অবকাশে তিনি স্বগ্রাম পাঁচদোনায় গেলেন। ব্রহ্মময়ী তাঁকে জানান, তিনি ভাটপাড়া থেকেই রওনা হবেন কিন্তু যাবার পূর্বে পাঁচদোনায় গিয়ে তাঁর শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম করতে চান। সে সময় তাঁর একজন ভ্রাতুষ্পুত্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে পাঁচদোনার বাড়িতে ছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর টীকা নেয়া আছে জেনে তাঁকে আসার অনুমতি দিলেন। এ অনুমতিতেই লুকিয়ে ছিল তাঁর সর্বহারা অভিশপ্ত জীবনের গোপন ঘাতক। গিরিশচন্দ্রের অনুমতি পেয়ে ব্রহ্মময়ী পাঁচদোনার বাড়িতে আসেন। মাকে প্রণাম করার পর তিনি গিরিশচন্দ্রের রোগাক্রান্ত ভ্রাতুষ্পুত্রকেও একবার দেখতে চান, তাঁর অনুমতি নিয়েই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখতে গেলেন। তিনি বসন্তরোগীর স্ফীত ও গলিত দেহের ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে ভয় পেলেন। বোধ হয় তখনই ব্রহ্মময়ীর শরীরে সেই ভীষণ সংক্রামক রোগের বীজ সংক্রমিত হয়। পরে গিরিশচন্দ্র শুনতে পেলেন, নিতান্ত শৈশব কালে তাঁকে দেশীয় রীতিতে টীকা দেয়া হয়েছিল, যা তেমন ফলপ্রদ হয়নি।

ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্তনের সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ব্রহ্মময়ী জ্বররোগে আক্রান্ত হন। ক্রমেই জ্বরের উত্তাপ বাড়তে থাকে, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড পৃষ্ঠবেদনা অনুভব করেন। স্ত্রীর জ্বরের দাপট এবং প্রলাপোক্তি দেখে অনন্যোপায় হয়ে তিনিনএকজন সিভিল সার্জনের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার যত্নসহকারে রোগীকে ঔষধ দিলেন

এবং বললেন– রোগ কঠিন হয়েছে, সাবধানে থাকবে। ডাক্তার যেদিন ঔষধ দিলেন সেদিন রাত্রেই ব্রহ্মময়ী বললেন, তাঁর সর্বাঙ্গে যেন সূচ ফুটছে। তখন গিরিশচন্দ্র তাঁর আবরণ উন্মোচন করে দেখলেন– তাঁর সমস্ত শরীরে রক্তচন্দনের ফোঁটার মত আরক্তিম বিন্দু বিন্দু ব্রণ বের হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় বসন্তের ব্রণ এ রকমই হয়। গিরিশচন্দ্র বসন্ত রোগে আক্রান্ত একজন রোগীর প্রথমাবস্থায় এ প্রকারই দেখেছিলেন। সুতরাং তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর প্রণয়িনী বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছে। ব্রহ্মময়ীর সর্বাঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বসন্তব্রণ উদগত হয়েছিল।[৩২] স্ত্রীর এহেন অবস্থায় তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। এতদূরে ময়মনসিংহে আত্মীয়-পরিজন বিহীন একাকী নিঃসহায় জীবনে এরূপ রোগীর সেবা করা সহজ সাধ্য ছিল না। সেকালে বসন্তরোগ মহামারী আকার ধারণ করত। এটি নিরাময়ের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্বজনও বসন্ত রোগীর কাছে আসতে ভয় পেত। সেখানে বিদেশ বিভূঁইয়ে একাকী বন্ধু-বান্ধবহীন পরিবেশে কারও সাহায্য সহযোগিতার প্রত্যাশা ছিল অলীক মাত্র। এ ভেবে রোগীকে তাঁর পিত্রালয়ে নিয়ে যাওয়াই তিনি মনস্থির করলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার যন্ত্রণাদায়ক নিশাবসানের পর অতি প্রত্যূষে তিনি ছুটে গেলেন ব্রাহ্মবন্ধু বাবু গোপীকৃষ্ণ সেনের বাড়িতে। গোপীকৃষ্ণের সহায়তায় দুই দাঁড়ের নৌকা ভাড়া করলেন। গোপীকৃষ্ণ ধারে কিছু টাকা সংগ্রহ করে গিরিশচন্দ্রের হাতে দিলেন। আর তাঁর শিক্ষক গোবিন্দচন্দ্র গুহের সহায়তায় দুজন চিকিৎসকের পরামর্শে রোগীর ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করে একমাসের ছুটি নিয়ে পাঁচদোনার দিকে যাত্রা করলেন। সঙ্গী হলেন হিন্দুস্থানী ভৃত্যটি। ময়মনসিংহ হতে জলপথে পাঁচদোনা সচরাচর চারদিনে পৌঁছানো যায়। তবে বর্ষাকালে স্রোত হলে শীঘ্র পৌঁছানো সম্ভব। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, নদীতে প্রখর স্রোত ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে ছিল যথাশীঘ্র পাঁচদোনা পৌঁছানোর তাড়া। তিনি মাঝি ও দাঁড়িদের বললেন যে, দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত নৌকা চালিয়ে কাল মধ্যাহ্নে ঘোড়াশালের ঘাটে পৌঁছাতে পারলে তাদের ভাড়া ছাড়াও প্রত্যেককে এক একটি টাকা পুরস্কার দিবেন। তারা সমস্তশক্তি প্রয়োগ করে নৌকা চালাতে লাগল। রাত নয়টার দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করে বানার নদের সঙ্গমস্থলে ঘোড়াশাল গ্রামের টোকনামক স্থানে পৌঁছাল। এটি মোট দূরত্বের অর্ধপথ ছিল। তারপর শুরু হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, "আকাশ ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন হইল, প্রবল প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, ক্রমে বিদ্যুৎ প্রকাশ ও বজ্রধ্বনি এবং বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। নৌকা চালাইয়া অগ্রসর হইবার নাবিকদিগের আর সাধ্য হইল না। তাহারা ঘাটে নৌকা সংলগ্ন করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।"[৩৩] কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চোখে নিদ্রা নেই। ক্রমশ অবনতি হওয়া স্ত্রীর ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ও প্রলাপোক্তি দেখে সর্বক্ষণ তাঁর বুক দুর্ভাবনায় ঢিব্‌ঢিব্ করছিল। প্রবল বাতাসে প্রদীপ জ্বালানো সম্ভব ছিল না। অন্ধকার রাত্রিতে স্ত্রীর শয্যাপাশে বসে আদিগন্ত সম্ভাবনার প্রহর গুণছিলেন। শেষ রাত্রে আকাশ পরিষ্কার হলো। তিনি মাঝিদের ডেকে তুলে নৌকা চালাতে বললেন। মাঝিরা বৈরী আবহাওয়া সত্ত্বেও প্রবলবেগে নৌকা চালিয়ে সন্ধ্যার দিকে ঘোড়াশালে পৌঁছাল। শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বকূলে ঘোড়াশাল গ্রামের পাশে ঘাঘড়ার খালের পাশে নৌকা বাঁধা হলো। সেখান থেকে ভাটপাড়ার দূরত্ব ছিল তিন মাইল। তখন ঘাঘড়ার খাল জলশূন্য ছিল, জলপথে ভাটপাড়া যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। অগত্যা নৌকা পৌঁছামাত্র তিনি তাঁর সম্বন্ধী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র রায়ের নামে রোগীর বিবরণসহ পত্র লেখে ভৃত্যটিকে ভাটপাড়ায় শ্বশুরালয়ের অভিমুখে প্রেরণ করলেন। পত্রে পাল্কী বেহারা ও চিকিৎসক মানিক আচার্যকে

পাঠানোর কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু নির্বোধ ভৃত্য তাঁর পত্র হারিয়ে রাত্রিতে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় এবং বলে, 'মাইজী ঘাটপর পঁহুছি, ওন্‌কো চিচক্‌কী বিমারী হুয়ী।' জগচ্চন্দ্র বুঝতে পারেন যে তাঁর কনিষ্ঠ বোন বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে ঘাটে পৌঁছেছে। কিন্তু সে রাত্রিতে তিনি পাল্কী এবং চিকিৎসক কোনোটির ব্যবস্থাই করতে পারেননি। এদিকে, পালকী বেহারার প্রতীক্ষা করে গিরিশচন্দ্র নিরাশ হলেন। সে সময় পালকী পাওয়া বড়ই দুষ্কর ছিল। পালকীর বেহারা সাধারণত বিদেশী হতো। বর্ষার শুরুতে তারা সকলেই দেশে চলে যেত। দেশে পালকী বেহারা প্রায় ছিল না। সূর্য অস্ত গেল। দুশ্চিন্তায় তাঁর মন উথাল পাতাল হয়ে উঠে। এতটুকু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ তাঁর ছিল না। ব্রহ্মময়ী অন্তর্যামী, স্বামীর ভেতর বাইর পুরোটাই যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। সূর্যাস্তের ম্লান আভায় তিনি স্বামীর চেহারায় এমন কিছু দেখেছিলেন, যা তাঁকে অন্তিম সময়েও বিচলিত করে তুলেছিল। তিনি তাঁর স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "শোক দুঃখ বিপদে তুমি অন্য লোককে সান্ত্বনা দান করিয়া থাক, কিন্তু উপস্থিত ব্যাপারে তুমি নিজে স্থির থাকিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে, তোমাকে সান্ত্বনাদান করার জন্য অন্য কাহারও যেন প্রয়োজন না হয়।"[৩৪] এই ছিল গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মময়ীর শেষ উচ্চারিত বাণী।

তারপর আবার শুরু হয় প্রকৃতির নির্মম তাণ্ডবলীলা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, বজ্রপাতের প্রচণ্ড নিনাদের সঙ্গে ছিল প্রবল বায়ুর ভয়ংকর দাপট আর তীব্র বৃষ্টিপাত। গভীর তিমিরাবরণকে ভেদ করে প্রকৃতি যেন ভয়ংকর রোষে ফেটে পড়ল। প্রকৃতির এ প্রতিকূলতা যেন তাঁর ভাগ্য দেবতার প্রতিকূল রোষেরই বহিঃপ্রকাশ। আশাহীন নৈরাশ্য অন্ধকারের গহ্বরে তিনি যেন ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছিলেন। জীবনে এতটুকু সান্ত্বনা, এতটুকু ভালোবাসা পাবার আশ্রয়স্থলটুকুও যেন তিনি হারাতে বসেছেন। তাঁর চোখের সামনে একটু একটু করে ক্রমশ অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে তাঁর ভালোবাসার নীড়। সে সময়ের অভিব্যক্তি তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে−

> "আমার বাহিরে আঁধার, অন্তরেও আঁধার। আমি অন্তরে কোন আলোক পাইতেছিলাম না; বাহিরে বারিদমণ্ডল হইতে অবিরল বারিধারা বর্ষিত হইতেছিল, আমার নেত্রযুগল হইতেও অনর্গল অশ্রুধারা পড়িতেছিল। আমি ক্ষণে ক্ষণে ভগবানকে ডাকিতেছিলাম। সেই রাত্রি এত দীর্ঘবোধ হইতে ছিল যেন সম্বৎসরের সমুদায় রাত্রি একত্র মিলিত হইয়া আমাকে নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত; কিছুতেই শেষ হয় না। এমন অন্ধকার আমি জীবনে কখনও দর্শন করি নাই। ভাবিতেছিলাম যে, আমার ন্যায় বন্ধুবিহীন নিরাশ্রয় বুঝি পৃথিবীতে আর কেহ নাই।"[৩৫]

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কোনোমতে রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র পালকির সন্ধানে ছুটলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মহাফা (ডুলি) জোগাড় করে স্ত্রীকে পিত্রালয়ে নিয়ে গেলেন। চিকিৎসক তাঁর আরোগ্য লাভ বিষয়ে নিরাশ হলেন। তারপরও আট নয় দিন পুরোদমে চলল তাঁর সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা। শাশুড়ি মাতা তাঁর রোগাক্রান্ত প্রিয়কন্যাকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতেন। কিন্তু সব সেবা শুশ্রূষা প্রার্থনা বিফল করে ১৯ জ্যৈষ্ঠ তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। স্ত্রীর শেষ বাণী স্মরণ করে গিরিশচন্দ্র শান্ত থেকেছেন, শোকাকুল হননি বা ক্রন্দন করেননি। শান্ত স্থির থেকে স্ত্রীর দাহকার্য সম্পন্ন করেন। স্ত্রীকে চিতায় তোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সাংসারিক সকল সুখ, আশা, ভরসাও বিসর্জন দিয়ে দিলেন। ব্রহ্মময়ীকে হারিয়ে তিনি

আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেননি। ব্রহ্মময়ীহীন জীবনে সাংসারিক মোহ তাঁকে আর টানতে পারেনি। প্রিয়তমার স্মৃতি তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। স্ত্রীকে স্মরণ করে তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী থেকেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রিয়বালা গুপ্তা তাঁর আত্মস্মৃতিকথা 'স্মৃতিমঞ্জুষা'য় বলেন, "দাদা ভাই ছিলেন ব্রহ্মচারী মানুষ। বসন্তরোগে স্ত্রীর মৃত্যুর পর যতদিন বেঁচেছিলেন সম্পূর্ণ বিধবার আচার পালন করে গেছেন। একবেলা নিরামিষ ভাত, তরকারী, আর একবেলা অন্য কিছু খেতেন। সাদা থান ধুতি, গায়ে সাদা জামা এই ছিল তাঁর সকল সময়ের পোষাক-পরিচ্ছদ।"[৩৬]

স্ত্রীর অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, ত্যাগ তিতিক্ষা তাঁর পথ চলার পাথেয় হয়েছিল। স্ত্রীকে ভালোবেসে একান্ত নিভৃতে নীরবে সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন ধর্মকে অবলম্বন করে। স্ত্রীকে তিনি ভুলতে পারেননি। প্রতি মুহূর্তে তাঁকে অনুভব করেছেন। উপলব্ধির গভীর থেকে এক একটি স্মৃতিকণা কুঁড়িয়ে এনে স্ত্রীর স্মরণে তিনি রচনা করেন-'ব্রহ্মময়ী জীবনচরিত'। তিনি স্ত্রীকে হারিয়েছেন সত্য কিন্তু স্ত্রীর অবদান ছিল তাঁর সমগ্র জীবনজুড়ে। সেজন্য তিনি নারী সেবাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। "আমি নারী-জীবন দ্বারা নিজ-জীবনে বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য নারীজাতির সেবা করা আমার চির জীবনের ব্রত হইয়াছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমার সহায় হউন।"[৩৭]

গিরিশচন্দ্রের দীর্ঘ প্রায় আশি (৮০) বছরের জীবনে ক্ষুদ্র পরিসরে যাপিত হয়েছিল একটি মধুর আনন্দঘন দাম্পত্য জীবন। যেখানে ছিল গভীর প্রেমের একান্ত নির্ভরতা, ছিল পারস্পরিক সম্প্রীতির বুঝাপড়া। দ্বান্দ্বিক অভিঘাতে নয়, পরস্পরের প্রতি আত্মসমর্পণের অর্ঘ্য দিয়ে সাজানো ছিল তাঁদের সংসার। সময়ের নির্মমতায় গিরিশচন্দ্র রিক্ত, শূন্য হয়েছিলেন সত্য কিন্তু আজীবন সে প্রিয়তমাকেই ধারণ করেছিলেন-অন্তরাত্মার প্রতিটি স্পন্দনে।

চ.ধর্মজীবন

অত্যন্ত গোঁড়া, রক্ষণশীল, সনাতনী হিন্দু বৈদ্য পরিবারে কেটেছিল গিরিশচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর কাল। সঙ্গী সাথী বন্ধু বান্ধবহীন শৈশব ও কৈশোরে তাঁর সময় যাপিত হয়েছিল পূজা অর্চনা ও তার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায়। সে বয়সেই জাত পাতের আচার সর্বস্বতাকে তিনি প্রকটভাবে সমর্থন করতেন। স্বভাবতই উগ্রবাদী সনাতনী মনোভাবে লালিত হয়েছিল তাঁর মানসভূমি। ঠাকুর দেবতার প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল এবং পারিবারিক বিগ্রহাদি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন ছিলেন। অত্যন্ত ধর্মান্ধতা, রক্ষণশীলতা ও আচরিক সংস্কারে আদ্যপ্রান্ত নিমগ্ন থেকে কেটেছে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাল ('শৈশব ও কৈশোর' অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে)।"তাঁর বাল্যকালের ধর্মবোধটা ছিল রক্ষণশীল, কুসংস্কার ও আচরিক আড়ম্বরে আচ্ছন্ন এবং পৌত্তলিকতায় ছিল তাঁর গভীর নিষ্ঠা, ধ্যান ও সাধনা। মাঝে মাঝে কোন কোন দিন প্রতিমার পদ-প্রান্তে এমনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতেন যে, তাঁকে ডাকাডাকি করলেও ধ্যান ভাঙতো না।"[৩৮] মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে মূলপাড়া নিবাসি কুলগুরু বিশ্বনাথ পঞ্চাননের কাছে তিনি শিবমন্ত্র গ্রহণ করেন। শিবমন্ত্র গ্রহণের পর প্রতিদিন স্নানান্তে ভক্তিপূর্বক পুষ্পচন্দন যোগে পূজা করতেন। আহ্নিক পূজায় তাঁর একান্ত নিষ্ঠা, দেবদ্বিজ ভক্তি ও হিন্দুয়ানি দেখে তাঁর খড়তুত বড়দাদা (পিতৃব্যপুত্র) দেবী প্রসাদ রায় গিরিশচন্দ্র তাঁদের কুলের গৌরব রক্ষা করবে বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর ধর্ম চেতনায়, পূর্জা-অর্চনায় ও ভক্তি-নিষ্ঠায় ভাঁটা পড়ে যায়। প্রথমে তাঁর শিব পূজার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা হ্রাস পায়। পরে প্রাত্যহিক পূজা হতে নিবৃত্ত হন। প্রতিদিন 'পুষ্পচন্দনবিল্বপত্রযোগে' শিব পূজা না করে ত্রিসন্ধ্যা সংক্ষিপ্তাকারে শুধু আহ্নিক সারতে থাকেন। এ সময়ে তিনি তাঁর ছোটদাদা হরচন্দ্রের সঙ্গে স্থিতি করার জন্য ময়মনসিংহে চলে যান। সেখানে যাবার পর তিনি আহ্নিক ত্যাগ করে স্নানান্তে কেবল মূল মন্ত্র 'নমঃ শিবায়' জপ করেন। ধীরে ধীরে ধর্মের প্রতি তাঁর অবিচলতা হ্রাস পেতে থাকে।

গিরিশচন্দ্রের পরিবারে শিবমন্ত্র গ্রহণের কিছুদিন পর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হবার রীতি ছিল। তাঁর বড়দাদা ও ছোটদাদা শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁরও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হবার কথা ছিল কিন্তু তিনি শিবপূজাই পরিত্যাগ করেছিলেন, শক্তিপূজা আর গ্রহণ করবেন কি? অল্পদিন পরে তিনি মূলমন্ত্র জপও ত্যাগ করলেন। হিন্দুধর্মানুমোদিত পূজার্চনায় তাঁর বিশ্বাস কমতে শুরু করে। তবে ঈশ্বর আছেন, তিনি এইটুকু বিশ্বাস করতেন, তাঁর অস্তিত্বে কখনো অবিশ্বাসী হননি। কিন্তু একজন আচরিক ধর্মনিষ্ঠ পূজারীর লোকাচারের প্রতি কেন এই বিমুখতা? বোধ, বুদ্ধি ও অধিবিদ্যায় যখন একজন মানুষের অন্তর্চক্ষু প্রসারিত হয়, বেড়ে যায় জ্ঞানের পরিধি, তখন অন্তঃসারশূন্য লোকাচারগুলোর অর্থহীনতা পরিদৃশ্যমান হয়। গিরিশচন্দ্র সেন পূজার্চনায় একাত্ম থেকেছেন, নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন মহাত্মার অনুভব। কিন্তু লৌকিক পূজার্চনায় তিনি তাঁর মাহাত্ম্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন। ফলে আচরিক ধর্ম বোধে হারিয়ে ছিলেন আস্থা ও বিশ্বাস এবং পূজার্চনায় হয়ে উঠেন ক্রমশ উদাসীন। সে সময়ে ময়মনসিংহের জেলা স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস। তাঁর দ্বারা ময়মনসিংহে ব্রাহ্মসমাজের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। প্রধান শিক্ষক ভগবান চন্দ্র বসু মহাশয়ের আবাসে সপ্তাহান্তে সন্ধ্যার পর কয়েকজন মিলে আদি সমাজের প্রণালী অনুসারে ব্রাহ্মোপাসনা

করতেন। গিরিশচন্দ্র তখন ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ওপর ‘হাড়ে চটা’ ছিলেন। তাঁর ভগ্নিপতি কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় উক্ত সমাজের একজন সভ্য হয়েছিলেন। তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ‘ধর্ম্মনীতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’ গ্রন্থ পড়ে ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হয়ে পড়েন। এজন্য গিরিশচন্দ্র তাঁর ওপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন (যদিও ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ কোন ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন না। মানবতাকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে সংস্কার প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল) শুনে তাঁর প্রতি অন্তরে এতটাই অশ্রদ্ধা অনুভব করেছিলেন, এতটাই বিরাগ হয়েছিলেন যে তাঁর প্রণীত ‘বোধোদয়’াদি গ্রন্থ স্পর্শ করতে পর্যন্ত তিনি নারাজ ছিলেন। তাঁর ভগ্নিপতি তাঁর ভাবগতিক লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “মরুভূমিতে ফুলের বাগান হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু ইহার কঠিন হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।”[৩৯] এ সময় কোনো ধর্মবোধে তাঁর আস্থা ছিল না। ধর্মীয় ধ্যান ধারণায় তিনি অবিশ্বাসী হয়ে উঠেন। তাঁর মতে, তখন তিনি ধর্মবোধহীন অদ্ভুত জন্তুর আকার ধারণ করেছিলেন।

সে সময় ভগবানবাবুর বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালী সম্পন্ন হতো। একদিন গিরিশচন্দ্র ও তাঁর কয়েকজন ছাত্রবন্ধু মিলে কৌতূহলবশত ভগবান চন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছিলেন তাঁদের কার্যক্রম দেখার জন্য। গিয়ে দেখেছিলেন ভগবানবাবু বই পড়ে পড়ে উপাসনা করছেন, আর তাঁর কয়েকজন বন্ধু আদ্যোপান্ত চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। দৃশ্যটি তাঁদের কাছে আগাগোড়া অর্থশূন্য, হাস্যকর ও কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়েছিল। পরে পরস্পর এ বিষয়ে আলোচনা করে আমোদ লাভ করতেন। এরপর গিরিশচন্দ্র বিয়ে করলেন। সুন্দর স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ধর্মবোধ আর তেমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। এমনি ভাবে দিন অতিবাহিত হতে পারত কিন্তু তাঁর বিয়ের দুবছর পর এক আকস্মিক মৃত্যু তাঁর জীবনভাবনায়, জীবন চেতনায় অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দেয়। তাঁর ছোটদাদা হরচন্দ্র রায় ময়মনসিংহে ওলাউঠা (কলেরা) রোগে আক্রান্ত হয়ে অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন। ছোটদাদার মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হয়ে পড়েন। হরচন্দ্র সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা মুদ্রিত করে যেতে পারেননি। পরে গিরিশচন্দ্র “কৃষ্ণলীলা” নামক তাঁর রচিত একটি বই মুদ্রিত করেন। তিনি তাঁর ছোটদাদার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি হরচন্দ্রের সহানুভূতি ছিল, তিনি সংস্কৃতে ব্রহ্মস্তোত্র রচনা করেছিলেন।[৪০]

স্বাভাবিক কারণেই ময়মনসিংহের ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের কাছে হরচন্দ্র প্রিয় ছিলেন। তাঁর অবর্তমানে গিরিশচন্দ্র সকলের স্নেহভাজন হয়ে উঠলেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের উন্নততর শিক্ষকের পদ পেলেন। মুড়াপাড়ার জমিদার ময়মনসিংহের কালেক্টরির খাজাঞ্চি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয়ের সঙ্গে হরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর স্ত্রী হরচন্দ্রকে মামা বলে সম্বোধন করতেন। সে পরিবারে হরচন্দ্রের আসা-যাওয়া ও ভোজনাদি হতো। হরচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাই হিসেবে গিরিশচন্দ্র সে পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরে সে পরিবারে তাঁর যাতায়াত ছিল। রামচন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় সে সময় ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্রম চলত। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়াতে গিরিশচন্দ্র সেখানে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করতে লাগলেন। তখন আদি সমাজের উপাসনা প্রণালী অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা হতো। উপাচার্য

চেয়ারে বসে উপাসনা করতেন ও মহর্ষিকৃত ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান পড়তেন। ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যান তাঁর কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মনে হতে লাগল। তিনি আগ্রহ সহকারে ব্যাখ্যান শুনতেন। তারপর ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্ম হতে তাঁর অন্তরের বিদ্বেষ বিদূরিত হলো। গিরিশচন্দ্র প্রতিদিন স্নানান্তে 'নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়' ইত্যাদি ব্রাহ্মস্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন। তখনও তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হননি এবং নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্রমে অংশগ্রহণও করতেন না। তখনও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর এক ধরনের অনাসক্তি ছিল। তাঁর মতে তখনকার অধিকাংশ ব্রাহ্মই ছিল চরিত্রহীন। অনেক সভ্য তখন সুরাপান করতেন, কোনো কোনো উপাচার্য পানাসক্ত ছিলেন। একদিন রামচন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় উপাসনা চলছিল। সে সময় একজন পানাসক্ত বৃদ্ধ এসে আম্র ফলে 'ঈশ্বরের মহিমা' বিষয়ে বক্তৃতা দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। উপাচার্য উঠে গিয়ে তাঁকে বক্তৃতাদানের সুযোগ করে দিলেন। বক্তা দু'চারটি কথা বলেই চৈতন্যশূন্য হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন। কয়েকজন সভ্য ধরাধরি করে সেই বক্তাকে বাইরে নিয়ে গেলেন। সেই ব্যক্তি কলকাতা হতে এসেছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর আগ্রহ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও মদ্যপ ব্রাহ্মদের কাছ থেকে তিনি দূরে থাকতেই পছন্দ করতেন।

এদিকে ময়মনসিংহে ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতি সূচিত হতে থাকে। ব্রাহ্মোপাসনার জন্য ফৌজদারী অফিসের কাছাকাছি বড় রাস্তার ওপর একটি বৃহৎ চৌচালা ঘর ক্রয় করা হয় এবং সে গৃহে সপ্তাহান্তে সন্ধ্যার পর উপাসনা চলতে থাকে। শহরের বেশ কয়েজন গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যায়ক্রমে উপাসানার দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। তদানীন্তন ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালিকাদাস দত্ত এবং জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু উমাচরণ দাস তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। সে সময়ে কালিকাদাস বাবুর উদ্যোগে জেলা স্কুলের একটি কক্ষে রিডিং ক্লাব স্থাপিত হয়েছিল। সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে এর অধিবেশন বসতো। এ ক্লাবের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের লোক। গিরিশচন্দ্রও উক্ত ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ক্লাবের প্রত্যেক অধিবেশনে এক একজন সভ্য ইংরেজিতে বা বাংলায় এক একটি প্রবন্ধ পাঠ করতেন। স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ মূল্যায়নে সে প্রবন্ধের আলোচনা চলত। একদিন গিরিশচন্দ্র বঙ্গভাষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সে প্রবন্ধের বিষয় নিয়ে পূর্ববঙ্গবাসী ও পশ্চিমবঙ্গবাসী সদস্যদের মধ্যে 'পরস্পর বিষম বিবাদ' উপস্থিত হয়েছিল। সেদিন থেকেই রিডিং ক্লাবটি উঠে যায়। তথাকথিত ঘটি-বাঙালের বিরোধ সে সময় যে কতটা প্রকট ছিল, তা রিডিং ক্লাব বন্ধ হওয়া থেকেই স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়।

সে যুগে ময়মনসিংহ শহরে প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসে (নভেম্বর/ ডিসেম্বর) বড় আকারের কৃষি প্রদর্শনী মেলা হতো। মেলা উপলক্ষে ১৭৮৭ শকাব্দে (১৮৬৫ খ্রি.) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে করে ময়মনসিংহে আসেন। এসেছিলেন জলপথে এক দাঁড়ের ছোট নৌকায়। জলপথে অতিকষ্টে তাঁদের ৬/৭ দিন অতিবাহিত হয়। তখন ছিল শীতকাল। বিছানা বালিশ ছিল না। ব্যাগকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করে রাত্রিযাপন করতেন, প্রচণ্ড শীতে একটি লেপই ছিল তাঁদের সম্বল। সাধু অঘোরনাথ দুবেলা রান্না করতেন, কেবশচন্দ্র রান্নার কাজে সহযোগিতা করতেন। সেই ছোট নৌকায় ময়মনসিংহ যাত্রাপথে আচার্য তাঁর প্রসিদ্ধ True Faith গ্রন্থটি রচনা করেন।

জলপথের দীর্ঘ যাত্রা শেষে তাঁদের নৌকাটি অপরাহ্ণে ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র ঘাটে এসে ভিড়ে। কিশোরগঞ্জ সাবডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত ডি: ম্যাজিস্ট্রেট রামশংকর সেন তখন মেলার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের আগমন সংবাদ পেয়ে ঘাটে গিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জানালেন। দুজনে নৌকা থেকে নামলেন। রামশংকর বাবুর চোখে পড়ল দুজনেরই পা খালি, দুজনেই ঢাকা থেকে যাত্রা পথে জুতা হারিয়ে ফেলেছেন। রামশংকর বাবু তৎক্ষণাৎ বাজার থেকে নতুন জুতা আনিয়ে দিলেন। কিন্তু দেখা দিল তাঁদের থাকার সংকট। জাত যাবার ভয়ে ময়মনসিংহের কোনো ব্রাহ্ম তাঁদেরকে নিজালয়ে আতিথ্য গ্রহণের প্রস্তাব দিতে পারেননি। ব্রাহ্মসমাজের পাশেই তাঁদের তাবু খাটানো হলো। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৃত্য তাঁদের রান্নার কাজে নিযুক্ত ছিল। পার্বতীচরণ বাবু ছিলেন জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর বাড়িতেই গিরিশচন্দ্র থাকতেন। তাঁর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। দুজনেই গেলেন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। কেশবচন্দ্র দীর্ঘাকৃতি ক্ষীণাঙ্গ যুবা পুরুষ ছিলেন। কলকাতা হতে একজন মহাবাগ্মী পুরুষ এসেছেন শুনে, বহুলোক সে পটমণ্ডপে তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রও প্রায়ই দুবেলা যেতেন। তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয়ে কেউই যেতেন না। বস্তুত, সে সময় ব্রাহ্মসমাজে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু মানুষের সন্ধান মেলা ভার ছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁর আত্মস্মৃতিতে বলেছেন, "আমার মনে আছে, ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বক্তৃতা কিরূপে করা যাইতে পারে?" কেশবচন্দ্র তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, বক্তৃতা করা কিছু কঠিন নয়, বেহায়া হইলেই বক্তৃতা করা যায়, বক্তৃতা করিতে নির্লজ্জ হইতে হয়।' ব্রাহ্ম ভ্রাতার যেমন গভীর প্রশ্ন, আচার্য্যের তদ্রূপ গভীর উত্তর হইয়াছিল।"[৪১]

কেশবচন্দ্র মাত্র চারদিন ময়মনসিংহ শহরে ছিলেন। দুদিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন– একদিন ইংরেজিতে, একদিন বাংলায়। উপাসনার দায়িত্বে ছিলেন সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত। এরপর তাঁরা ঢাকা ফিরে যান। ফেরার দিন তাঁদের কষ্ট লাঘবের জন্য গিরিশচন্দ্র তাঁর ব্যবহারের বালিশ ও তোষক তাঁদেরকে দিয়ে দেন। রামশংকর বাবু একদিন রাত্রে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ভোজন করার জন্য পার্বতীবাবুকে নিমন্ত্রণ করেন কিন্তু পার্বতীবাবু জাত যাওয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে খাওয়া তো দূরের কথা লুকিয়ে খেতেও অপারগতা প্রকাশ করেন। অথচ এ পার্বতী বাবুই পরবর্তী সময়ে বিলাতে গিয়ে বিবি বিয়ে করেছিলেন এবং বিলাতি জীবনযাত্রা অবলম্বন করেছিলেন। আর গিরিশবাবু পংক্তি ভোজন তো দূরের কথা, জাত যাওয়ার ভয়ে পাউরটি পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারতেন না। বাস্তবিক তখন ব্রাহ্মরা কেবল নামেই ব্রাহ্ম ছিলেন। সকলেই প্রায় হিন্দু আচার-বিচার, জাত-পাতের ছুঁৎমার্গ মেনে চলতেন। কেশবচন্দ্রের তখনও পর্যন্ত কোনো অহিন্দু আচার ছিল না। তিনি ছিলেন নিরামিষভোজী যুবক। তিনি কেবল প্রকাশ্য ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। বিলেতে যাওয়ার পর অবশ্য তিনি হিন্দু আচার আচরণ বহুলাংশে বর্জন করেছিলেন। আদিসমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর (১৮৬৬ খ্রি) কেশবচন্দ্র পূর্ববঙ্গে আবার প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়েই গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আগ্রহ বোধ করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে একনিষ্ঠ ব্রাহ্মে পরিণত হয়েছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রচারে সাফল্য ও সামাজিক প্রতিকূলতা :

ময়মনসিংহে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের দুবছর পর প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৮৯৯ খ্রি)। তিনি সমাজগৃহে চার পাঁচটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী যুবক। তিনি তাঁর দৃঢ়, বলিষ্ঠ কণ্ঠে পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ ও উপবীতের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য দেন। তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতায় ময়মনসিংহ শহরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মনও তখন সে আন্দোলন স্রোতে উত্তাল হয়ে উঠে এবং অনেক ব্রাহ্ম উপবীত ত্যাগী গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে পংক্তি ভোজন করেন, গিরিশচন্দ্রও তাঁদের একজন ছিলেন।[৪২] কয়েকটি বক্তৃতা দানের পর গোস্বামী শেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে শেরপুর চলে যান। তিনি নিজের বস্ত্রাদির গাঁঠরী কোমরে বেঁধে একাকী প্রায় ত্রিশ মাইল পথ হেঁটে শেরপুর গমন করেন। অনেক অনুরোধ ও অনুনয়ের পরও তিনি কাউকে সঙ্গে নেননি। তাঁর এই কষ্ট সহিষ্ণু মনোভাব দেখে লোকের অন্তর শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছিল। পরে তিনি প্রচারের জন্য পায়ে হেঁটেই শেরপুর থেকে বগুড়ায় চলে গিয়েছিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতা ময়মনসিংহের ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সামাজিক সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে মানসিক দুর্বলতাকে কাটিয়ে বিজ্ঞাপনী পত্রিকার সম্পাদক জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী এবং ওভারসিয়ার গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপবীত পরিত্যাগ করেন। এতে সেখানের সনাতনী, গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং এ আচরণের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন শুরু করে। তাঁরা 'হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী' সভা স্থাপন করে ব্রাহ্মদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। ব্রাহ্মদের কেউ কেউ সভায় উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। আবার কেউ কেউ দেশে গিয়ে আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে প্রায়শ্চিত্ত করেন। ব্রাহ্মদের ক্ষণিক উদ্ভাসিত আবেগ উত্তেজনাময় ধর্মীয় সংস্কার ধর্মান্ধ হিন্দুদের তোপের মুখে স্থায়িত্ব পায়নি। অগ্নিহোত্রী মহাশয় উপবীত ত্যাগের একদিন বা দুদিন পরেই পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন। জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করেছেন শুনে গিরিশচন্দ্র তাঁকে দেখতে যান। গিয়ে দেখেন তিনি নতুন উপবীত স্কন্ধে ধারণ করে অনাবৃত দেহে রাস্তার পাশে বসে আছেন। গিরিশচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন, শুনেছি অপিনি যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করেছেন, কিন্তু একি দেখছি? তিনি মৃদুস্বরে বললেন, হ্যাঁ ত্যাগ করেছি বটে, এই আর কি। গোপালচন্দ্র অবশ্য পনের / বিশ দিন উপবীত ত্যাগী ছিলেন। পরে স্ত্রীর তাড়নায় তিনিও উপবীত গ্রহণ করেন। জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী ঢাকার আর গোপালচন্দ্র কলকাতার লোক ছিলেন, তথাপি তাঁদের বিদ্রোহ, তাঁদের সংস্কার প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখতে পারেননি। এমনই কঠোর ছিল ময়মনসিংহ শহরে গোঁড়াপন্থীদের ধর্মীয় আগ্রাসন।

এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির উপবীত ত্যাগের সংবাদ গোস্বামী মহাশয়কে দেয়া হয়েছিল। এই সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হন। তাঁদের সাথে মিলনের তাগিদ থেকেই তিনি অতি দ্রুত পালকীযোগে ময়মনসিংহে ফিরে আসেন। এসে দেখেন সম্পূর্ণ বিপরীত আবহে পরিস্থিতি থমথমে। প্রথমবার এসে তিনি পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী মুন্সেফ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ এবার সামাজিক পীড়নে অসহায় ও ভীত। সুতরাং পুলিশের তদানীন্তন হেড ক্লার্ক বাবু ঈশানচন্দ্র দেবের আবাসে

তিনি আশ্রয় নিলেন। এ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টিতে 'ঢাকা প্রকাশ' নামক পত্রিকার দায়বদ্ধতা ছিল অনস্বীকার্য। সেবার গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে যারা পংক্তিভোজন করেছিলেন 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় তাঁদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল। এতে হিন্দুরা উত্তেজিত হয়ে সভা স্থাপন করে তাঁদের সমাজচ্যুত করেন। তবুও আরেকবার তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মত বিনিময় প্রয়োজন। গোস্বামী মহাশয়ের পরামর্শে ঈশানবাবু শহরের ব্রাহ্মদের তাঁর ঘরে ভোজের নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করার সাহস কেউই দেখাননি। শুধু বাবু দুর্গাশঙ্কর গুপ্ত ও গিরিশচন্দ্র সে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে পিছুপা হননি। সেদিন ঈশানবাবুর প্রচুর খাবার দাবার নষ্ট হয়েছিল। এতে গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। পরিশেষে অভিমানজনিত মনোবেদনায় সভ্যদের উদেশ্যে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে ঢাকার দিকে রওনা হন।

অতঃপর ব্রাহ্মদের ওপর 'হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী' সভা শুরু করে তীব্র অত্যাচার ও উৎপীড়ন। প্রায় সব ব্রাহ্মই হিন্দু আত্মীয় স্বজনের ভয়ে ও অনুরোধে প্রায়শ্চিত্ত করেন। দু একজন ব্যতীত প্রায় সকলেই অবৈধ উপায় অবলম্বন করে আত্মীয়বর্গের মনস্তুষ্টি সাধন করেন। দু একজনের মধ্যে গিরিশচন্দ্র অন্যতম ছিলেন। তিনি তখন জেলা স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু পার্বতীচরণ রায় মহাশয়ের বাড়িতে বাস করতেন এবং একত্র খাওয়া দাওয়া করতেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম হওয়ায় পার্বতী বাবুর স্ত্রী তাঁকে একঘরে করে দিলেন এবং ভয়ানক উৎপাতে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন'এ বলেন,

> "পার্ব্বতী বাবুর পত্নী অন্তঃপুরে আমার ভোজন বন্ধ করিয়া দিলেন, বহির্ভবনে আমার জন্য অন্ন ব্যঞ্জনে পূর্ণ থালা বাটী পাঠাইয়া দিতেন, সেই থালা বাটী আমি ধৌত প্রক্ষালন করিতে বাধ্য হইতাম। তৎপর অন্ন ব্যঞ্জন প্রেরণ বন্ধ হয়। আমি বহির্ভবনের একটি প্রকোষ্ঠে স্বয়ং রন্ধন করিয়া ভোজন করিতাম, ভৃত্যাভাবে নিজে খাদ্য সামগ্রী বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া আসিতাম, স্কুলের সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল বহন করিয়া আনিতাম, উচ্ছিষ্টপাত্র স্বয়ং মার্জ্জন করিতাম। পরে একটি ভৃত্য নিযুক্ত করা গিয়াছিল, গৃহকর্ত্রীর অত্যাচারে সে দুই তিন দিন পরেই প্রস্থান করে। ভৃত্য আমার উচ্ছিষ্ট পাত্র স্পর্শ করিলে গৃহিণী তাহাকে স্নান করাইতেন, সে দুই একদিন রাত্রিতে স্নান করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠে।"[৪৩]

সুতরাং ভৃত্যভাগ্যও সুপ্রসন্ন হলো না তাঁর। ময়মনসিংহের ব্রাহ্মবন্ধুদের কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে তো আসেন-ই-নি বরং তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যে জলযোগ পর্যন্ত করতেন না। অথচ অনেকেই রাত্রিকালে কেশবচন্দ্র আচার্যের বোটে গিয়ে মোসলমান বাবুর্চির রাঁধা পোলাও ও মুরগীর কারি দিয়ে উদর পূর্ণ করে আসতেন। আর পার্বতী বাবু দেশে গিয়ে স্ত্রীর অনুরোধে প্রায়শ্চিত্ত করেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই স্ত্রী বিদ্যমান থাকতেই তিনি বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। হ্যাট কোট পরে English dinner খেতে শুরু করেন এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিলাতি মেমকে বিয়ে করেন। গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মে একনিষ্ঠ থাকার ফলে শুধু যে ময়মনসিংহ শহরেই সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন তা নয়, দেশস্থ অর্থাৎ পাঁচদোনার কোনো আত্মীয়স্বজনও তাঁর সহায় ছিল না। মাতা ঠাকুরানি ও বড়দাদা তাঁকে অবৈধ উপায়ে সমাজে গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাতে সম্মত হননি। নব ধর্মবোধে, নব চেতনায়, নব উদ্দীপনায় তিনি ছিলেন অনড়। তাঁর ধর্ম পথে সবাই প্রতিকূল হলেও তাঁর সহধর্মিণী ব্রহ্মময়ী দেবী ছিলেন সহায় ও একমাত্র বন্ধু। ব্রহ্মময়ীর উৎসাহ, দৃঢ়তা ও ধর্মনিষ্ঠায়

শত বাধা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মে স্থির থাকতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেও তো ক্ষণস্থায়ী। গিরিশচন্দ্রের জীবনে উৎসাহ ভালোবাসার ক্ষণিক আভাস দিয়ে তিনিও তো চলে গেলেন পরপারে।

এদিকে মা, বড়দাদা মাতামহ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছিলেন-'স্বধর্মীত্যাগী' বলে। সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন বড়দাদা ঈশ্বরচন্দ্র রায় ও ছোটদাদার একমাত্র সন্তান ইন্দুভূষণ। গিরিশচন্দ্র সম্পত্তি বন্টন সম্পর্কে বহুদিন পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেননি। সবই ঘটে তাঁর অগোচরে।

কিন্তু বিপদে বা দুঃসময়েও অটুট ছিল তাঁর দৃঢ় মনোবল। তখন তিনি একাধারে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের পণ্ডিত ও ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য ছিলেন। ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে ছিল ব্রহ্মমন্দিরের উৎসব। পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র ঢাকা শহরে পদার্পণ করেন। সঙ্গে ছিলেন অমৃতলাল বসু (খ্র. ১৮৩৯-১৯১৩) ও কান্তিচন্দ্র মিত্র। এ উপলক্ষে কয়েকজন ব্রাহ্মযুবক নিয়ে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ আসেন বঙ্গচন্দ্র রায় (খ্রি. ১৮৩৯-১৯২২) ও কালীনারায়ণ গুপ্ত (১৮৩০-১৯০৩)। উৎসব শেষে গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য সকলে জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীর আহ্বানে শেরপুর যান। সেখানে তাঁরা জমিদার বাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করেন। তারপর শেরপুর থেকে ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্তন করে ঢাকার যাত্রীরা ঢাকা ফিরে যান। সে সময় কালীনারায়ণ গুপ্ত আচার্যের কাছে দীক্ষিত হন। আচার্যের প্রতি তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে কেশবচন্দ্র প্রচার কাজে ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। সে সময় গিরিশচন্দ্রের ভগ্নিপতি কালীনারায়ণ গুপ্ত তাঁর নিজের ব্যবহারের মূল্যবান শাল বিক্রয় করে আচার্যের ইংল্যান্ড যাওয়ার 'পাথেয়সাহায্যার্থ' মিত্র মহাশয়ের হাতে অর্পণ করেন।

ময়মনসিংহে সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত : পুনরুজ্জীবিত ব্রাহ্মসমাজ

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত (১৮৪১-১৮৮১ খ্রি.) আসাম প্রদেশে প্রচার সেরে ময়মনসিংহে আসেন। এখানে তিনি প্রায় মাসাধিককাল অবস্থান করেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উপাসনা এবং সন্ধ্যাকালে ধর্মালোচনা করতেন। সমাজগৃহে চারটি বক্তৃতাও তিনি দিয়েছিলেন। একদিন ব্রাহ্মমন্দিরে দিনব্যাপী উৎসব হয়েছিল। সে উৎসবে ৮/৯ জন যুবক সাধু অঘোরনাথের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। অঘোরনাথের প্রচেষ্টায় ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে। তাঁর প্রচার পদ্ধতি জনপ্রিয়তা পায়। অনেকের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় ও উপাসনার প্রতি অনুরাগ জন্মোয়। অঘোরনাথ গিরিশচন্দ্রের বাড়িতেই বাস করতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ব্রাহ্মরা সম্মিলিত হয়ে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত তাঁর উপদেশ শুনতেন। তিনি ঈশ্বর দর্শন, প্রত্যাদেশ শ্রবণ, বিশেষ করুণা ইত্যাদি একেকটি বিষয় নিয়ে উপদেশ দান ও আলোচনা করতেন। তাঁর সব উপদেশ পরবর্তী সময়ে মুদ্রিত হয়েছিল। সে উপদেশ ও আলোচনায় সবার সংশয় দূর, বিশ্বাস বৃদ্ধি ও ধর্মভাব প্রবল হয়েছিল। এতে অনেক যুবক অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুসমাজ ও পৌত্তলিকতার বন্ধন ছিন্ন করেন। তাঁরা আত্মীয় পরিবার দ্বারা উৎপীড়িত ও তাড়িত হয়ে গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে একান্নভুক্ত হন। তাঁদের অন্নবস্ত্রের ভার গিরিশচন্দ্রের স্কন্ধে অর্পিত হয়। শ্রীমান শরৎচন্দ্র দাস, জেলা স্কুলের ছাত্র শ্রীমান বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ এবং শ্রীমান রমা প্রসাদ গোঁড়াপন্থী হিন্দুদের দ্বারা উৎপীড়িত

ও বিতাড়িত হয়ে গিরিশচন্দ্রের কাছে আশ্রয় নেন। কিছুদিন পূর্বে এই ময়মনসিংহ শহরে হিন্দু সনাতনীদের অত্যাচারে ব্রাহ্মগণ তাঁদের পূর্ব ধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র তখন একঘরে হয়ে পড়েছিলেন, কেউ তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যে জলযোগ করতে পর্যন্ত সাহস পেতেন না। আর আজ তাঁরই গৃহে ব্রাহ্মবন্ধুদের এত বেশি সমাগম যে স্থানাভাব দেখা দেয়। তখন গিরিশচন্দ্রের মাসিক আয় ছিল ২০ টাকা। তা দিয়ে নিজের ও অন্য অনেকের অন্ন সংস্থান করতে হতো এবং নিয়মিতভাবে মাসিক চাঁদা এক টাকা কলকাতার প্রচার ভাণ্ডারে পাঠাতে হতো। এছাড়া ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য চাঁদাও দিতে হতো। তবে রক্ষা এই যে, তৎকালে এক টাকায় এক মণ চাল পাওয়া যেতো, এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যও সুলভ ছিল। তবুও ব্রাহ্মসমাজের এত সভ্য তাঁদের তো কর্মসংস্থান চাই। গিরিশচন্দ্র তাঁদের কর্মসংস্থানে সচেষ্ট হন। শরৎচন্দ্রকে বাবু গোপীকৃষ্ণ সেনের সহায়তায় স্ট্যাম্পের বাট্টাধারী কাজে নিযুক্ত করেন। তাঁর অনুরোধে শ্রীনাথচন্দকে মুড়াপাড়া নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ আবাসে আশ্রয়দান করেন এবং তাঁর অন্নচিন্তা দূর করেন। ব্রাহ্মযুবক শ্রীমান মধুসূদন সেন গোপীবাবুর গৃহে আশ্রয় নেন। তাঁর মতে "তখন ব্রাহ্ম যুবাদের জ্বলন্ত উৎসাহ উদ্যম ছিল, তাঁহারা কোন পরীক্ষা বিপদকে গ্রাহ্য করিতেন না, কোন রূপ সুখ ভোগের প্রত্যাশী ছিলেন না।"[৪৪]

এক নবতর উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়েছিল সে সময়ের ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ। শুধু ব্রাহ্মসমাজের প্রতিই নয় ব্রাহ্ম প্রচারকবৃন্দের প্রতিও ছিল গিরিশচন্দ্রের অসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশেষ সহানুভূতি। প্রচারকবৃন্দ পবিত্র ধর্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেছেন শুনে শ্রদ্ধাবনত হয়েছিল তাঁর অন্তর। তাঁদের সাহায্যার্থে তিনি দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করে প্রচার ভাণ্ডারে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে জমিদার হরচন্দ্র বাবু প্রচার ভাণ্ডারে দুইশত টাকা প্রদান করেন, তিনি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বই বিক্রি করে প্রচারভাণ্ডারের অর্থের যোগান দেন। ধর্মের প্রতি আত্ম-নিবেদিত প্রাণ; ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র তখন ময়মনসিংহের ব্রহ্মমন্দিরে উপাচার্যের কাজ করছিলেন। সে সময় ব্রাহ্ম সভ্যদের অনেকেই প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্মের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে মণ্ডলীভুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র মণ্ডলীভুক্ত হননি। তাঁর ইচ্ছে ছিল কোলকাতার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে তাঁর জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করবেন। এ সময় ময়মনসিংহ ব্রহ্মমন্দিরের উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় বঙ্গচন্দ্র রায় তথায় অবস্থান করছিলেন। কৈলাসচন্দ্র নন্দী যখন বললেন, দীক্ষিত না হয়ে উপাচার্যের কাজ করা সঙ্গত নয়, তখন তিনি মন্দিরে গিয়ে বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের কাছে নিজের বিশ্বাস স্বীকার করে মণ্ডলীভুক্ত হয়েছিলেন। মণ্ডলীভুক্ত হওয়ার সময় শপথ পাঠ করে বলেন, "অদ্য অমুক সনের অমুক মাসের অমুক দিনে অমুক তিথিতে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে আমি ব্রাহ্মধর্মে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলীভুক্ত হইলাম। করুণাময় পরমেশ্বর আমার সহায় হউন।"[৪৫]

এ শপথ পাঠ করে মণ্ডলীভুক্ত হওয়াকে সে সময় দীক্ষা বলা হতো। কিন্তু এটি ছিল মণ্ডলীতে প্রবেশ মাত্র, ধর্ম দীক্ষা নয়। নববিধানের দীক্ষার সঙ্গে এর 'স্বর্গ মর্ত্যের' প্রভেদ ছিল। যাই হোক, পুনরুজ্জীবিত ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সার্থক কাণ্ডারি ছিলেন গিরিশচন্দ্র। তাঁর তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ দ্রুত বিকশিত হতে

থাকে। তবে কিছুকাল পরেই সভ্যদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এ অন্তর্দ্বন্দ্ব পরবর্তীকালে অবশ্য ব্যাপক আকার ধারণ করে। অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই গিরিশচন্দ্র ময়মনসিংহ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যান।

গিরিশচন্দ্রের পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ

সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর গিরিশচন্দ্রের স্কুলে দুর্গাপূজার ছুটি হয়। সেই ছুটির সঙ্গে যোগ করে তিনি আরও তিন মাস ছুটি নেন। স্ত্রী বিয়োগজনিত অবসাদ, আত্মীয় স্বজনদের বৈরী মনোভাব এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্কলহজাত মানসিক বিষাদ থেকে কিছুটা সুস্থিরতার আশ্বাসে তিনি পশ্চিম ভারতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হন। প্রথমে ঢাকা শহরে উপস্থিত হন। ঢাকা থেকে সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে কুষ্টিয়ায় পৌঁছেন। তখন ঢাকা থেকে সপ্তাহান্তে একবার মাত্র মাল বোঝাই জাহাজ যাত্রী নিয়ে দু/ তিন দিনে কুষ্টিয়া যেত। সেখান থেকে ট্রেনে তাঁরা সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছান। সে দিনই (১৮৭০ সালের অক্টোবর মাসে) আচার্য কেশবচন্দ্র ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কেশবভক্তরা তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানান।

এরপর শুরু হয় গিরিশচন্দ্রের পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ। অনেক শহর তিনি ভ্রমণ করেন– বর্ধমান, ভাগলপুর, মুঙ্গের, সীতাকুন্ড, বাঁকিপুর, কাশী, মির্জাপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বিঠোর, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, দিল্লী, কতুর, মিরাট, শাহারণপুর, দেরাদুন, হিমালয়শৃঙ্গ–মসুরি, হরিদ্বার, রুর্খি, অম্বালা, জলন্দর, অমৃতসর, লাহোর, মোলতান, রাজঘাট মোট ২৯টি শহর তিনি ভ্রমণ করেন। ট্রেনে, এক্কাগাড়ি, গো-যান, অশ্বারোহণে কখনো বা পদব্রজে তিনি এসব অঞ্চল ঘুরে বেরিয়েছেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ সম্বন্ধে 'আত্ম-জীবন'এ বর্ণনা করেছেন এভাবে-

> "আমি শাহারণপুর হইতে ৪২ মাইল পার্ব্বত্য দুর্গম পথ এক্কারোহণে অতিক্রম করিয়া একদিনে দেরাদুন নগরে গিয়াছিলাম। তখন আমার প্রথম এক্কায় আরোহণ। এক এক স্থানে বন্ধুরভূমি এবং মোহন পাশ পর্ব্বত পার হইতে আমার সর্বাঙ্গ চূর্ণ এবং অন্ত্র সকল যেন ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল। আমি গিরিমূল রাজপুর হইতে ৭ মাইল পথ অশ্বারোহণে অতিক্রম করিয়া হিমালয়শৃঙ্গ মসূরির উপর আরোহণ করিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার রাজপুর হইতে অশ্বারোহণে ৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দেরাদুনে ফিরিয়া গিয়াছিলাম। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ লেণ্ডোর হইতে রাজপুর পর্য্যন্ত পদব্রজে অবতরণ করা গিয়াছিল। ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী এবং পরলোকগত ভ্রাতা বাবু গোপীমোহন ঘোষ আমার সহযাত্রী ছিলেন। আমি দেরাদুনে ২০/২১ দিন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন ঘোষের পরিবার মধ্যে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলাম। পরে দেরাদুন হইতে ৩৫ মাইল নিবিড় অরণ্যময় পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া হরিদ্বারে আমার যাওয়া হইয়াছিল; একজন পাহাড়ী ভৃত্যমাত্র সঙ্গে ছিল। হরিদ্বার হইতে ১৫ মাইল দূরে রুর্খি নগরে পদব্রজে যাওয়া হইয়াছিল, আমি তথা হইতে শাহরণপুরে গোযানে গমন করিয়াছিলাম। শাহারণপুর হইতে ট্রেনে আরোহণ করা যায়। আগ্রা হইতে ৩৫ মাইল পথ এক্কারোহণে অতিক্রম করিয়া মথুরা নগরে যাওয়া হইয়াছিল। মথুরা হইতে ৬ মাইল

বৃন্দাবন, বৃন্দাবন হইতে ১৫ মাইল গোবর্দ্ধন, তথা হইতে কুসুম- সরোবর এবং শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড, এ সকল স্থানে এক্কারোহণেই ভ্রমণ করা গিয়াছিল। আমি সীতাকুণ্ডে ও বিঠোরে এবং কুতুবে গোযানে গিয়াছিলাম, অন্যান্য স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছিলাম।"[৪৬]

তাঁর এ সমস্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পশ্চিমভারত পর্যটন শেষে তিনি ময়মনসিংহে নিজ কর্মস্থলে ফিরে আসেন।

গোপীকৃষ্ণ সেনের বিরোধিতা ও ময়মনসিংহ ত্যাগ

পশ্চিমভারতের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে তিনি যখন ময়মনসিংহে ফিরে আসেন, তখন তিনি শারীরিকভাবে অবসন্ন। "দেহের ক্লান্তি ও রুগ্নতা সারাতে প্রয়োজন ছিল মানসিক শান্তি ও শারীরিক বিশ্রাম। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কপালে তাঁর একটাও ছিল না। এসে দেখেন তাঁর অনুপস্থিতিতে পরিস্থিতি বৈরী হয়ে গেছে। বৈরিতা হিন্দুদের পক্ষ থেকে নয়–তাঁর প্রিয় ব্রাহ্ম ভাইদের দিক থেকে। কেন্দ্রবিন্দুতে গোপীকৃষ্ণ সেন। ব্রাহ্মমণ্ডলীতে পদগত মর্যাদা নিয়ে ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-বৈরিতার মুখ্য উপাদান।"[৪৭] গোপীকৃষ্ণের মনে হয়তো উপাচার্য পদের প্রতি গোপন আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল। সে আকাঙক্ষা-প্রকাশ্য বিরোধিতায় গিরিশচন্দ্রকে আঘাত করতে লাগল। তিনি প্রায় প্রতিটি সামাজিক উপাসনায় উপাচার্য গিরিশচন্দ্রের প্রার্থনা ও উপদেশের প্রতিবাদ সূচক উপদেশদানও প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর এরূপ আচরণে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিত হন। সবার সম্মুখে সামাজিক উপাসনা কক্ষে এহেন আচরণ যে অতি গর্হিত, নীতি বর্হিভূত ও অনিষ্ট কাজ তা গোপীকৃষ্ণ বুঝতে চাননি। অথচ গোপীকৃষ্ণ তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বন্ধুত্বের আন্তরিকতায় গিরিশচন্দ্রের উপাসনা ও প্রার্থনার দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করার অধিকার গোপীকৃষ্ণের ছিল। তিনি যদি প্রতিবাদ না করে তাঁর উপদেশ ও প্রার্থনার দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতেন, তাহলে গিরিশচন্দ্র তা সংশোধন করতে পারতেন এবং এতটা কষ্টও পেতেন না। কিন্তু গোপীকৃষ্ণ তা না করে উপাসনা গৃহে প্রতিনিয়ত এক অনভিপ্রেত প্রতিবাদ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে লাগলেন। গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য উপাসকগণের কাছেও তাঁর এ আচরণ ছিল অত্যন্ত বিরক্তিকর। কিন্তু আত্মমত প্রতিষ্ঠায় গোপীকৃষ্ণ ছিলেন দুর্নিবার তেজস্বী পুরুষ। উপাসকদের কারো কথায় দমবার পাত্র তিনি ছিলেন না। তিনি গিরিশচন্দ্রকে বেদীচ্যুত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিলেন। কিন্তু উপাসক মণ্ডলী রাজি না হওয়াতে তিনি সমর্থ হননি। এতকিছুর পরও গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রতি বিরূপ হননি। ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠায় গোপীকৃষ্ণের অবদান তিনি কৃতজ্ঞতাবশত স্মরণে রেখেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের এ 'ঘোরতর অশান্তি' তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলে। তাই তিনি চিরজীবনের মতো ময়মনসিংহ ত্যাগ করার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। একথা তিনি কলকাতা প্রচার ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ কান্তিচন্দ্র মিত্রকে জানালেন। গিরিশ সেন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক ভেবে কান্তিচন্দ্র তাঁকে উৎসাহসূচক পত্র লেখেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তখনো প্রচারক হওয়ার অভিলাষী ছিলেন না। তাঁর মতে, প্রচারব্রত অতি উচ্চমার্গের ব্রত এবং নিজেকে তিনি সে উচ্চ মার্গের ব্রতের অনুপযুক্তই মনে করতেন। তবে তাঁর ইচ্ছে ছিল বিষয়কার্য পরিত্যাগ করে কলকাতার প্রচারকমণ্ডলীর সঙ্গে থাকবেন। তাঁদের কার্যক্রমে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। এ ইচ্ছে ধর্মজীবনের সাধনসঙ্গিনী ব্রহ্মময়ীকে হারানোর পরপরই তাঁর মনে দানা বেঁধেছিল। আর এখন তো শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল। শিক্ষাকার্যের গুরুভার বহনে তিনি নিজেকে অক্ষম ও অযোগ্য মনে করছেন। চাকরি ছেড়ে ময়মনসিংহ ত্যাগের অভিপ্রায় তিনি তাঁর বন্ধুদের জানালেন। বন্ধুরা তাঁকে চাকরি না ছেড়ে ছুটি নিয়ে কলকাতা যেতে মত দিলেন এবং পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে চাকরি ছাড়ার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ অনুযায়ী যাত্রা স্থির হয়। গোপীকৃষ্ণ বাবুই তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে তিন মাসের ছুটির সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করেন। 'নিতান্ত নিঃস্ব নিরীহ ব্রাহ্ম যুবা' শ্রীনাথচন্দ তাঁর চাকরির পদে বহাল হন। পরবর্তী কালে এ শ্রীনাথের চাকরির

সাহায্যার্থে তিনি পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন। ময়মনসিংহ ছাড়ার প্রাক্কালে বন্ধুবর গোপীকৃষ্ণ সেন নিজ বাড়িতে কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধুসহ তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। সে সময় গোপীকৃষ্ণ অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং সজল নয়নে বলেছিলেন, তিনি গিরিশচন্দ্রের ময়মনসিংহ ত্যাগের কারণ হয়েছেন বলে হৃদয়ে বড়ই ব্যথা অনুভব করছেন। তাঁর এ অন্তর্দহন গিরিশচন্দ্রের অন্তর্বেদনার সুতীব্র যন্ত্রণাকে কতটুকু লাঘব করেছিল তা আমাদের অজ্ঞাতই রয়ে গেল। কেননা এ অভিব্যক্তি সম্পর্কে তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন'এ কিছুই লিপিবদ্ধ করেননি। তবে যে ব্রাহ্মসমাজ ছিল তাঁর অন্তরাত্মার স্ফূর্তির ঐকান্তিক নিবেদন, যে ব্রাহ্মসমাজকে তীব্র সামাজিক, পারিবারিক প্রতিকূলতায়ও আঁকড়ে ছিলেন, যে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনে জীবনের সব সঞ্চয় উজাড় করে দিয়েছিলেন, যে ব্রাহ্মসমাজকে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, ভক্তি ও আত্মনিবেদন দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন, সে ব্রাহ্মসমাজকে পিছনে ফেলে আত্মবিস্মৃত হয়ে নতুনকে বরণ করার কত যে যন্ত্রণা তা আমরা স্বভাবতই অনুমান করতে পারি। সে বেদনাকে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্তব্য বলেই মেনে নিয়েছিলেন।

১৩ নং মির্জাপুর স্ট্রিটে শুরু হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের নতুন জীবন। সময় তখন ১৮৭২ সাল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মির্জাপুরে যে ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, গিরিশচন্দ্র সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর ওপর প্রথমে 'সমাচার' পত্রিকার লেবেল মোড়ার ভার অর্পিত হয়েছিল। সেখানে থেকেই তিনি আচার্যের প্রাত্যহিক উপাসনায় যোগ দিতে লাগলেন। পরবর্তী সময়ে আচার্য তাঁর মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব সুলভ স্থিরতা লক্ষ্য করে তাঁকে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মের প্রচারাভিযান

প্রচারকমণ্ডলীর সঙ্গে থাকা এবং তাঁদের সাহায্য সহযোগিতার অভিপ্রায়ে গিরিশচন্দ্র ময়মনসিংহ ত্যাগ করে কলকাতায় আসেন। এখানে এসে তিনি রীতিপূর্বক প্রচারক রূপে মণ্ডলীতে গৃহীত হননি। তাঁর সময় প্রচারব্রত গ্রহণের কোন সুদৃঢ় নিয়ম ছিল না। কিন্তু এখন 'নববিধান ' প্রচারব্রত গ্রহণে রয়েছে সুকঠিন নিয়ম। প্রচারব্রতের প্রার্থীকে এক বৎসর পরীক্ষাধীনে থাকতে হয়। পরে প্রেরিত দরবারের অনুমোদন হলে প্রার্থীকে বিশেষ দিনে প্রকাশ্যে আচার্যের নিকটে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হতে হয়;

"অদ্য অমুক শকে অমুক মাসে অমুক দিবসে আমি অতি বিনীতভাবে গাম্ভীর্য্য সহকারে প্রচারক শ্রেণীর ব্রতবিধি গ্রহণ করিতেছি। যাবতীয় বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নববিধান প্রচার, মানবজাতির সেবা, পৃথিবীতে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যস্থাপন জন্য আমি আমাকে এবং আমার সমস্ত জীবনকে উৎসর্গ করিতেছি। মনুষ্যের অনুরোধে কদাপি খণ্ডিত না করিয়া আমি পবিত্র ধর্ম্মবিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় প্রচার করিব, সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, উপাসনা ও ঈশ্বরেতে সকলের মিলন প্রচার করিব, এবং আমার সমস্ত প্রচার মধ্যে আমি নব-বিধানকে গৌরবান্বিত করিব। আমি স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিব না, কল্যকার জন্য ভাবিব না। মনুষ্যাত্মা সকলকে ঈশ্বরের নিকটে আনা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ে ব্রতী হইব না। আমার যাবতীয় বিষয়কার্য্য মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে থাকিবে, এবং আমার সকল অভাব মণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। সাধ্যানুসারে এরূপ কার্য্য ও পরিশ্রম করিব যেন আমার জন্য মণ্ডলীকে অর্থ সম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। দারিদ্র্য, বিনয় ও

আত্মসমর্পণের সহিত আমি বৈরাগ্যের ন্যায় জীবন যাপন করিব। ঈশ্বর আমাকে এ বিষয়ে সাহায্যে করুণ।"[৪৮]

এ রকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে গিরিশচন্দ্রের প্রচারব্রত গ্রহণ করা হয়নি। নিম্ন-আসাম ও মধ্য-আসামে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে বর্ষার সমাগমে তিনি কলকাতা ফিরে আসেন। সেবার 'রবিবাসরীয় মিরার' পত্রিকায় তাঁর প্রচার কার্যক্রম প্রকাশ করে আচার্য কেশবচন্দ্র তাঁকে প্রচারক বলে অভিহিত করেন। ১৮৮০ সালে তিনি প্রচারক সভায় প্রথম যোগদান করেন এবং সে সময়েই প্রচারক মণ্ডলীতে তাঁর নাম প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়।

আসাম প্রচার

আসাম প্রদেশেই গিরিশচন্দ্র তাঁর জীবনের প্রথম প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। পরে তিনি আরও দু'বার সে প্রদেশে প্রচার করতে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার তাঁর প্রচার সঙ্গী ছিলেন শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী। সে বার নিম্ন-আসাম ধুবড়ী হতে সীমান্ত প্রদেশ উপর আসাম ডিব্রুগড় পর্যন্ত ছিল তাঁদের প্রচার যাত্রা। তৃতীয়বার আশুতোষ রায়কে সঙ্গে করে তিনি বদনপুর জংশন হতে পার্বত্য রেলওয়ের পথে গৌহাটী নগর পর্যন্ত গিয়ে ধুবড়ী হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন । আসামে উপাসনা, উপদেশ, বক্তৃতা, সঙ্গীত ও সৎপ্রসঙ্গাদির মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা হয়েছিল। নিম্ন আসাম–ধুবড়ী, গোওয়াল পাড়া, গৌহাটী, শিলং, মধ্য আসাম–তেজপুর, বিশ্বনাথ, নওগাঁ,উত্তর আসাম–শিবসাগর, গোলাঘাট, ডিব্রগড় তিনি প্রচার অভিযানে সফল হয়েছিলেন; তবে নওগাঁ জেলার বড়দাওয়া, শিবসাগর জেলার নিগ্রিটিং, আসামের জোড়হাট, টিয়ক এবং শিলঙ্গের চেরাপুঞ্জিতে প্রচার অভিযানে তাঁরা তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেননি। ভ্রমণের বাহন ছিল রেলওয়ে, জাহাজ, গো-যান, ডোঙ্গা নৌকা, অশ্ব, গজ, থাবা কখনো কখনো পদব্রজেও চলেছিল তাঁদের যাত্রা। আসাম প্রচারাভিযানের দ্বিতীয়যাত্রায় তিনি শিবসাগর ও ডিব্রগড় জেলায় প্রায় ৮২ মাইল গো-যানে ভ্রমণ করেছিলেন। প্রথম যাত্রায় ব্রহ্মপুত্র নদে ডোঙ্গায় চড়ে ২৮ মাইল পার হয়ে বিশ্বনাথ নামক স্থানে গিয়েছিলেন। এরপর ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে গজারোহণে লাউখাঁর ১৫ মাইল নিবিড় অরণ্য রাত্রে অতিক্রম করে নওগাঁ নগরে পৌঁছেছিলেন। নওগাঁ হতে ১৮ মাইল দূরে বড়দওয়াতে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে পায়ে হেঁটেই নওগাঁয় ফিরে এসেছিলেন। আবার নওগাঁ হতে অশ্বারোহণে লাউখাঁর অরণ্য পেরিয়ে ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে ডোঙা নৌকায় তেজপুরে ফিরে এসেছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বকূল হতে গজারোহণে ৪/৫ মাইল পথ অতিক্রম করে নিগ্রিটিঙ্গে পৌঁছেছিলেন। দুর্গম খাসিয়া হিল (শিলঙ্গ পর্বত) গৌহাটী হতে কমপক্ষে ৬৩ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তখন কার্ট রোড হয়নি, রাস্তা প্রস্তুতের প্রস্তুতি চলছিল মাত্র। অশ্বারোহণে সে দুর্গম পার্বত্য পথের অর্ধেক তাঁরা দুদিনে অতিক্রম করেছিলেন। শুধু তাই নয় খাসিয়া কুলীর পিঠে মোড়ার মতো থাবা নামক আসনে বসে তিনি গিরিপথও অতিক্রম করেছিলেন বার বার। তারপর আরও বিভিন্ন স্থানে প্রচার অভিযান সেরে স্টিমারে চেপে ঢাকায় এসে পৌঁছেছিলেন। সঙ্কাটাকীর্ণ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তিনি প্রথম প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। এ প্রচারাভিযানের সময় তিনি স্টিমারে বসে শেখ সাদীর 'বুস্তা' কাব্যগ্রন্থ ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। সে অনুবাদের 'প্রেমমত্ততা' পরিচ্ছদের কিছু অংশ তিনি আচার্য কেশব সেনকে উপহার

দিয়েছিলেন। এ উপহার পেয়ে আচার্য অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়ে তাঁকে পত্র লিখেছিলেন-"এই অমূল্য উপহার পাইয়া আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আমাকে এইরূপ উপহারই দিবে।"[৪৯]

পূর্ববঙ্গে প্রচার যাত্রা

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মোনশীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, কাওরাইদ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, পিঙ্গলা, ঈশ্বরগঞ্জ, বাজিতপুর, মুক্তাগাছা, শেরপুর, আঠার বাড়ি, বাঘিল, জঙ্গলবাড়ি, কুলস্বী, করিমগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, কক্সবাজার, কতুবদিয়া, পটিয়া, নোয়াখালি, সিলেট, ফেনী, সন্দীপ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা, আগরতলা, মুরাদনগর, লাকসাম-পশ্চিমা গাঁ, হরিপুর, ছাতক, আদাইর, শিলচর, হালিয়াকাঁধি, বার্ণারপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারাভিযান চালান।

উত্তরবঙ্গ

রঙ্গপুর, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, ফুলবাড়ি, রাজশাহী, বোয়ালিয়া, নওগাঁ, দীঘাপাতিয়া, বগুড়া, কোচবিহার, বড়মরিচা, হলদিবাড়ী, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মালদহ।

পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা-ভবানীপুর, চুঁচড়া, হুগলি, শ্রীরামপুর-অমরপুর, হাওড়া- আমড়াগড়ি, ব্যাঁটরা, চন্দননগর, নদিয়া-কুষ্টিয়া, শান্তিপুর, কুমারখালি, চব্বিশ পরগণা- খাঁটুরা, বহরমপুর, জঙ্গীপুর, জিয়াগঞ্জ, মেদিনীপুর-তমলুক, বীরভুমের রামপুর হাট, বর্ধমানের রাণীগঞ্জ এসব অঞ্চলে একবার নয় কয়েকবার তিনি প্রচার কার্য পরিচালনা করেছিলেন । বাকুড়াতে বিয়ে উপলক্ষে, বীরভূমের ভোলাপুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এবং কুমিল্লার কালীকচ্ছ গ্রামে দলবদ্ধভাবে তিনি ধর্মপ্রচারে গিয়েছিলেন।

বঙ্গদেশে সম্মিলিতভাবে প্রচারাভিযান

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র প্রথম সম্মিলিত প্রচারাভিযানে বের হন। সে বার তাঁর প্রচারযাত্রার সঙ্গী ছিলেন ভাই উমানাথ গুপ্ত, রামচন্দ্র সিংহ, ভ্রাতা বলদেব নারায়ণ প্রভৃতি। তাঁদের সঙ্গে রঙ্গপুর, ফুলবাড়ি, নাটোর, সৈয়দপুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। একবার তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে কাকিনায় গিয়েছিলেন। আচার্যের জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গে একবার তিনি বর্ধমান গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ভাই উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, কেদারনাথ দে, রামচন্দ্র সিংহ, কালীশঙ্কর দাস, ভ্রাতা পরমেশ্বর মল্লিক, আশুতোষ রায় সবার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে শ্রী-দরবারের নির্ধারণানুসারে প্রচার মাত্রায় বের হয়েছিলেন। খাটুরা, গোবরডাঙা, মঙ্গলগঞ্জ, নকফুলি, বনগ্রাম, যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট এবং বরিশাল তাঁদের অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

আরেকবার মাঘোৎসবান্তে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের প্রচার দলে যোগ দিয়ে তিনি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বেড়াবোচিনা, কেদারপুর এবং ঢাকা জেলার তিল্লিতে প্রচারাভিযানে বের হয়েছিলেন। তবে অনেক অঞ্চলে প্রচার কার্য চালাতে গিয়ে ব্যর্থ হন আবার কোথাও কোথাও প্রচার অভিযান চালানোর সুযোগই পাননি। ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে, চব্বিশপরগণার বশির হাটে, কৃষ্ণনগরে, নবদ্বীপে, আসাম প্রদেশের কামাখ্যা পর্বতে, বশিষ্ঠাশ্রমে, চট্টগ্রামের মহেশখালি দ্বীপস্থ আদিনাথ পর্বতে তাঁদের প্রচারাভিলাষ অপূর্ণই থেকে যায়। বঙ্গদেশের এ সব অঞ্চলে প্রচারের যানবাহন ছিল ধূমযান, বাষ্পীয়পোত, অর্ণবযান, গো-যান, মহিষযান ইত্যাদি। বর্ষাকালে ছোট নৌকায় চড়ে তিনি একাকী কুমিল্লা ও নোয়াখালিতে প্রায় একমাস প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। ময়মনসিংহের দীননাথ কর্মকার ও চন্দ্রমোহন কর্মকারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নৌকা করে ময়মনসিংহ জেলার নানা অঞ্চলে এবং ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আগরতলা পর্যন্ত মাসাধিককাল প্রচারাভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। সে বার তিনি ইটনা গ্রাম হতে সিলেট জেলার বিথলঙ্গে রামকৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম দর্শন করেছিলেন। প্রচারাভিযানে তাঁদের ঐকান্তিকতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, প্রচারব্রতে আন্তরিকতা ব্রাহ্মধর্মের প্রসারে ব্যাপকতা এনেছিল।

মহাপ্রচার যাত্রা

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র সেনের বিহার ও উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রচারাভিযানকে তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন'এ মহাপ্রচার যাত্রা নামে অভিহিত করেছেন। এ অভিযাত্রার সঙ্গী ছিলেন ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, ভাই দীননাথ মজুমদার, ভাই উমানাথ গুপ্ত, ভাই রামচন্দ্র সিংহ, ভাই বঙ্গচন্দ্ররায়, ভাই দুর্গানাথ রায় এবং ভাই মহেন্দ্রনাথ নন্দন। এ অভিযানে গিরিশচন্দ্র ধর্মতত্ত্বের 'প্রচারবৃত্তান্ত' লেখক ছিলেন। মহাপ্রচার যাত্রা শুরু হয়েছিল হাবড়া, নৈহাটী ও আচার্যদেবের পৈতৃক জন্মভূমি গৌরিভা গ্রামে প্রচারাভিযানের মাধ্যমে। সেখান থেকে চন্দন নগরে এবং জগদ্দল পল্লীতে তাঁরা প্রচারে যান। এরপর মোকামা, ক্রমে রাঢ়ঘাট, মজফ্ফরপুর, বাঁকিপুর, গয়া, ডোমরাঁও, গাজিপুর, আরা ও শোণপুরে প্রচারযাত্র অব্যাহত রাখেন। এসব স্থানে আচার্য ব্রহ্মানন্দ বাংলা বা হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতাদি দিয়ে শ্রোতাদের প্রমত্ত করে তুলেন। উপাসনা সৎ প্রসঙ্গাদি প্রভৃতি কাজও তাঁকে করতে হয়েছিল। নগরসঙ্কীর্তনে ভাই দীননাথ মজুমদার নেতৃত্বে ছিলেন। এই প্রচারযাত্রা প্রায় এক মাস স্থায়ী হয়েছিল। তাঁরা উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। কটক–এর সব এলাকা, কেন্দ্রপাড়া, পুরী–সব খুরদা, বালেশ্বর, গড়জাত–ময়ূরভঞ্জ ও বোধনগরে প্রচারকার্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হিন্দু তীর্থ ভুবনেশ্বর, বৌদ্ধতীর্থ উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরি দর্শন করতে গিয়েছিলেন। অর্ণবপোত সরিৎপোত ধূমযান গো-যান ও উৎকলিতে তাঁরা নৌকা দিয়ে গমনাগমন করেছিলেন। সম্বলপুর মধ্যভারতে অবস্থিত। তাঁরা কটক থেকে নৌকাযোগে সম্বলপুরে প্রচারে গিয়েছিলেন। বিহারের–ভাগলপুর, মুঙ্গের, বাঁকিপুর–খগোল, গয়া, আরা, লাহিরিয়া সরাই, সমস্তিপুর, সাঁওতাল পরগণা–সব, দেওঘর, মধুপুর, ছোটনাগপুর–ডেল্টনগঞ্জ, হাজারীবাগ–সব, চাত্রা, পুরুলিয়া–সব, গোবিন্দপুর এসব স্থানে তাঁরা অল্পবিস্তর প্রচার চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল–গাজীপুর, এলাহাবাদ, কাণপুর, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু কিছু প্রচার করা সম্ভব হয়েছিল। লক্ষ্ণৌতে প্রচারকালে জৈনপুর, অযোধ্যা, ফয়জাবাদ, ছাপরা ও গোরখপুরে তাঁরা প্রচার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারেননি। পাঞ্জাব প্রদেশ–দেরাদুন, সিমলা পর্বত, লাহোর, রাউলপিণ্ডি, মরি পর্বত, পেশওয়ারে যৎসামান্য প্রচারাভিযান সম্ভব হয়েছিল। রোহিলাখণ্ড–বেরিলী নগর, সিন্দুদেশ–করাচি বন্দর, হায়দরাবাদে প্রচারাভিযান সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁরা পূর্ববঙ্গ, বিহার, সাঁওতাল পরগণা, মধ্য, উত্তর ও পশ্চিমভারত, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌসহ মোট ৯২ টি গ্রাম ও শহরে তাঁদের প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচারনায় এ বৃহৎ উদ্যোগ সদূর অতীত এবং সমকালেও অত্যন্ত বিরল ঘটনা। ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচারে-তাঁদের কর্মতৎপরতায়, কষ্টসহিষ্ণুতায়, উদারতায়, দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানবতার বাণীই উচ্চকিত হয়েছে।

ধর্ম, নববিধান, বিশ্বাস, জীবনোন্নতি, প্রত্যাদেশ তত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, স্বর্গ-নরকতত্ত্ব, একতাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, মতাদর্শ তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে বক্তৃতার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি ভাষায় চলছিল তাঁদের প্রচার কার্য। পরবর্তী সময়ে এগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিরাজগঞ্জে তাঁরা উর্দুতে ভাষণ দিয়েছিলেন। অভিজাত মুসলমান সমাজে সে সময় উর্দু ও ফারসি ভাষার চর্চা হতো। "তুর্ক-আফগান-মুঘল যুগে আরব্য-পারস্য ও উত্তর ভারত থেকে কর্মসূত্রে আগত অভিজাত মুসলমানদের একাংশ এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের উত্তর পুরুষরা ভাষায়, আচার-আচরণে স্থানীয় মুসলমানদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতেন।"[৫০] এছাড়া বাঁকিপুর, ভাগলপুর, আরা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, লাহেরিয়াসরাই, চাত্রা, ঝন্সী, শিমলাশৈল, লাহোর, রাউলপিণ্ডি, হায়দরাবাদ, সিন্ধু, হায়দরাবাদ নেজাম, পুর্ণিয়া, গাজীপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও তাঁরা উর্দুতে প্রচার কার্য চালিয়েছেন।

নববিধানের একেশ্বরবাদী আদর্শে সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রয়াসে অভিজাত মুসলিম ব্যক্তিবর্গ ছিলেন আমন্ত্রিত। চট্টগ্রামে একটি উর্দু বক্তৃতায় তথাকার মাদ্রাসা কলেজের প্রিন্সিপাল মৌলবী জোলফকার আলি এবং অন্যতর বক্তৃতায় প্রিন্সিপাল মৌলবী ইয়াকুব আলি সাহেব, বাঁকিপুরে একটি উর্দু বক্তৃতাতে লক্ষ্ণৌনিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, অন্য বক্তৃতায় ব্যারিস্টার শরফোদ্দীন সাহেব, এলাহাবাদের বক্তৃতায় একজন প্রসিদ্ধ মুসলিম ব্যারিস্টার এবং লক্ষ্ণৌনগরের বক্তৃতায় একজন মুসলমান উকিল সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া নিজাম-শাসিত হায়দরাবাদে উর্দুবক্তৃতা সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সেখানকার মহবুব কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। অবশ্য সেখানে তিনি ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। লাহোরের উর্দু সভায় সভাপতি হয়েছিলেন পাঞ্জাব গভর্মেন্টের কাউন্সিল সদস্য ও 'চিফ কোর্টের' ব্যারিস্টার মোহাম্মদ শাহদীন সাহেব। এলাহাবাদের উর্দু-বক্তৃতাটি সেখানকার ত্রৈমাসিক হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লাহোর, করাচি ও হায়দরাবাদ সিন্ধের ব্রাহ্মমন্দিরে হিন্দি ভাষায় উপাসনা, উপদেশ এবং ডাল্টানগঞ্জ ও পূর্ণিয়া নগরে ছাত্র সভায় হিন্দিতে বক্তৃতা হয়েছিল। এছাড়া আচার্য কর্তৃক প্রণীত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মশিক্ষা', 'সামাজিক উপাসনা প্রণালী ও প্রার্থনামালা' এবং 'কতকগুলি ধর্ম্মকথা ও ধর্ম্মোপদেশ' নামক বইগুলো উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে তাঁরা প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন।

কেশবোত্তর নববিধান ব্রাহ্মধর্ম প্রচার

কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৮৪ সালে। কেশবোত্তর নববিধান ব্রাহ্মধর্মের মতাদর্শকে প্রচারের লক্ষ্যে কেশব ভক্তরা তাঁদের অভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে কখনো পেয়েছেন হৃদ্যিক আতিথ্য, কখনো পড়েছেন বিরূপ প্রতিক্রিয়ায়। সনাতনী হিন্দুরা কখনো কখনো তাঁদের পথভ্রষ্ট যাত্রিকদল মনে করতেন। তাঁদের ধর্মপ্রচারে বিস্তর বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করাই ছিল সনাতনীদের লক্ষ্য। কিন্তু নববিধান মতানুসারীরা সকল বাধাকে হেয় জ্ঞান করে প্রচারাভিযানে মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই কেদারনাথ দে, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, ভাই উমানাথ গুপ্ত, ভাই কালীশঙ্কর দাস, শ্রীমান আশুতোষ রায় এবং ভ্রাতা পরমেশ্বর মল্লিকের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রও প্রচারাভিযানে বের হন। তাঁদের অভিপ্রায় ছিল মঙ্গলগঞ্জ থেকে বনগ্রাম হয়ে যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে প্রচারযাত্রা করার। মঙ্গলগঞ্জ হতে যাত্রা করে অপরাহ্নে বনগ্রামে পৌছান। সেখানে তাঁদের কীর্তন ও বক্তৃতা করার প্রস্তাব ছিল। উক্ত গ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভদ্রলোকের বাস ছিল। রাত ৯/১০ টার দিকে বক্তৃতা শেষে তাঁরা নৌকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁরা অতিশয় কাতর হয়ে পড়েন, ফলে নৌকার দিকে দ্রুত ছুটতে থাকেন। কিন্তু রাত্রি ঘোর অন্ধকার হওয়ায় তাঁরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জয়সিংহের খালের কাছে চলে যান। তখন তাঁরা উপায়ান্তর না দেখে খাল পার হয়ে আশ্রয়ের প্রত্যাশায় কাছেই একটি পল্লীতে গিয়ে উঠেন। কিন্তু পল্লী নিস্তব্ধ, জনমানবের সাড়া ছিল নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁরা কোনো ময়রা বা দোকানপাট পেলেন না। অবশেষে রাস্তার পাশে বাইরের ঘরে একটি লোকের সাক্ষাৎ পেলেন। তার কাছে তাঁরা সাহায্য চাইলেন। সে তাঁদেরকে পথের অনুসন্ধান দিলেন। তাঁর তথ্যানুযায়ী ইছামতী ঘাটের সন্ধানে তাঁরা প্রায় অর্ধমাইল পথ এগিয়ে যান কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও তাঁরা নৌকার সন্ধান পেলেন না। অগত্যা আবার ফিরে আসতে হলো সেই লোকটির কাছে। ফিরে এসে তাঁর কাছে আজকের রাতের জন্য বাহির ঘরে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু বাইরঘর তো দূরের কথা, যে ঘরের বেড়া নেই সে ঘরেও রাত্রি যাপনের অনুমতি মেলেনি। তিনি তাঁদেরকে সঙ্গে করে জমিদার বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা বড় বড় ঘর এবং প্রচুর ফসলাদি দেখতে পেলেন। জমিদার বাবু নিদ্রিত ছিলেন। খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর উঠলেন বটে কিন্তু তিনি তাঁদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেন না, তাঁর কোন গৃহেই তাঁদেরকে স্থান দিতে সম্মত হলেন না। ভাবে বুঝা গেল, তিনি তাঁদেরকে ডাকাত ভেবেছিলেন, সুযোগ ক্রমে লুটপাট করে চলে যাবে, এরূপ মনে করেছিলেন। যাই হোক দুঃখের নিশি তো আর সহজে অবসান হয় না। সেই লোকটির পরামর্শ মতো সরু রাস্তা দিয়ে শিমুলতলীর দক্ষিণ দিকে গিয়ে নৌকার অনেক সন্ধান করলেন কিন্তু নৌকার হদিস পেলেন না। লোকটি তাঁদেরকে আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলেছিলেন এবং প্রবঞ্চনা করেছিলেন। এদিকে তাঁরা পথশ্রান্ত, ক্ষুৎ পিপাসায় অবসন্ন, আবার শীতেও কাতর হয়ে পড়েন। তাঁদের কারো দেহে স্থূল শীতবস্ত্র ছিল না। সামান্য একটি গেরুয়া বা সরু চাদর ছিল মাত্র। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে সকলে নদীতীরে অন্ধকারে খোলামাঠে পড়ে রইলেন। তারপর তাঁরা কুশবনে আগুন জ্বালিয়ে মহা-উৎসাহে আগুন পোহাতে লাগলেন। অবশেষে রজনীর শেষ ভাগে অবসন্ন দেহমনে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে মাটির ঢেলাকে বালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত্রি শেষে ঘুম ভাঙলে তাঁরা

জানতে পারলেন বনগ্রাম সাবডিবিশন এখান থেকে ৬ মাইল দূরে । তারপর কেউ কেউ নৌকায়, কেউ কেউ পায়ে হেঁটে বনগ্রাম পৌছান। সে রাত্রির হিম আর অপ্রত্যাশিত পথকষ্টে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। উপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে যান।

প্রচার কার্য চালাতে গিয়ে তাঁরা ছোট বড় অসংখ্য সামাজিক বিরূপ ঘটনার সম্মুখীন হন। আরেকবার বনগ্রাম হতে যশোরে প্রচারযাত্রা পরিচালনা করেন। সেখানে তাঁদের কোনো আত্মীয় বা ব্রাহ্মবন্ধু ছিল না। জাতি যাওয়ার ভয়ে কেউ তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তাঁরা কারো বাড়িতে আশ্রয় পাননি। কেউ তাঁদেরকে ধর্মালোচনা ও সঙ্গীতাদি করার সুযোগ দেননি। তাঁরা স্টেশনের কাছে একটি ক্ষুদ্র মুদি দোকান আশ্রয় করে দুই তিন দিন সেখানে ছিলেন। মাঠে ও পথে সঙ্গীত বক্তৃতাদি করে বেড়িয়েছেন। স্কুল গৃহে বক্তৃতা করার চেষ্টা করেন কিন্তু অনুমতি পাননি। মুদি দোকানে একটি ক্ষুদ্র চালাগৃহে তাঁরা অবস্থান করেন। রীতিমত এটির বেড়া ছিল না। বাঁশের মাচার ওপর চটের শয্যাতে শয়ন করতেন, কেউ কেউ কেরোসিন বাক্সকে তক্তপোষরূপে গ্রহণ করেন। নিজেরাই বাজারে গিয়ে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করে আনতেন, তাঁদের ব্রাহ্মভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ভোলা দীঘি হতে জল সংগ্রহ করতেন। কেউ মসলা পিষতেন, কেউ রাঁধতেন। খেতে খেতে একটা দুটো বেজে যেত। একদিন অপরাহ্নে শিলা বৃষ্টি হয়েছিল, রাত্রিতেও ছিল মেঘের ঘনঘটা। চারদিক খোলা, সে ক্ষুদ্র চালাঘরে অসীম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাঁরা হয়ে পড়েছিলেন অসহায়। খাওয়ার জন্য ছিল শুধু চিড়ে বাতাসার ব্যবস্থা। কিন্তু মহৎ আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে সবার মধ্যে গড়ে উঠেছিল হাস্যোজ্জ্বল কষ্ট সহিষ্ণু মনোভাব।

আবার প্রচারাভিযানে কখনো কখনো হাস্যোদ্দীপক পাগলামির ঘটনাও ঘটে। ঘটনাস্থল ছিল যশোর। যশোরের মাঠে কীর্তন ও বক্তৃতা হবে। সেখানে যাওয়ার সময় ভাই উমানাথ গুপ্ত বললেন, "প্রত্যেককে লাঠী হাতে করিয়া যাইতে হইবে।" তাতে সকলের অমত কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা, অত্যন্ত জেদ করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন সবাই লাঠি হাতে না গেলে বক্তৃতায় যাবেন না এবং সবার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হবে। সুতরাং তাঁর আবদার রক্ষার্থে সবাইকে দণ্ডধারী হয়ে সভাস্থলে যেতে হয়েছিল। তিনি আবার সভায় 'দণ্ডধারী যাত্রিক বিষয়ে' বক্তৃতাও করেছিলেন। আরেকদিন অন্য এক পাগলামি। একদিন যশোহরের মাজিস্ট্রেট সাহেবকে দেখে ভাই উমানাথ গুপ্তের রাজভক্তির আবেগ জন্মে। তিনি সম্মিলিতভাবে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করতে ইচ্ছে পোষণ করে এবং সে মোতাবেক সকলকে বাধ্য করে। অনেকে গিয়েছিলেন কিন্তু গিরিশচন্দ্র যাননি। সেদিন সন্ধ্যার পর কালেক্টরীর সেরেস্তাদার তাঁদেরকে তাঁর বাসায় নিমন্ত্রণ করে ব্রহ্মোপাসনাদি করতে দিয়েছিলেন। পরিশেষে মিষ্টান্ন ভোজন করিয়ে তাঁদেরকে বিদায় দিয়েছিলেন। এমনিভাবে কখনো তীব্র প্রতিকূলতা, কখনো সাদরে সমাদর, কখনো বা হাস্যোদ্দীপ্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁদের প্রচারকার্য সম্পন্ন হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র তাঁর নিজগ্রাম পাঁচদোনাতেও প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। গিরিশচন্দ্র আনুমানিক ১৮৯১ সালে পাঁচদোনা গ্রামে নিজের বাড়িতে উপাসনা কুঠির নির্মাণ করেছিলেন।[৫১] সে কুঠির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঢাকা হতে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় এবং তাঁর কোনো কোনো প্রচারক বন্ধুও এসেছিলেন। গিরিশচন্দ্র বাড়িতে অবস্থান কালে এ কুঠিরে উপাসনা করতেন। এই উপাসনা কুঠিরে একবার উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে

অংশগ্রহণ করার জন্য ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় সদলবলে পাঁচদোনায় আসেন এবং তাঁদের সঙ্গী হন ডাক্তার দুর্গাদাস রায়। নিজালয়ে অবস্থানকালে তিনি একবার আত্মীয় যুবকদের ডেকে 'প্রকৃত ধর্ম্ম' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম বক্তৃতা। পরে অবশ্য এ বক্তৃতাটি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। মা বেঁচে থাকতে মাতৃদর্শনোপলক্ষে বছরে দু / তিন বার পাঁচদোনায় আসতেন। তখন উপাসনা কুঠীরে নির্জন উপাসনা, সন্ধ্যায় ধ্যানচিন্তা এবং কোন কোন দিন আত্মীয় মহিলাদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন।

১৩০৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৯৭ খ্রি:) ৯৪ বছর বয়সে গিরিশচন্দ্রের মা জয় কালী দেবী প্রয়াত হন। পনেরো দিন 'ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালন পূর্ব্বক' তিনি বাড়িতে মায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। কলকাতা হতে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, শ্রীমান আশুতোষ রায়, ঢাকা হতে বঙ্গচন্দ্র রায়, মহিমচন্দ্র সেন, ভগিনীপতি গুপ্ত মহাশয় শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক দিন পূর্বে পাঁচদোনায় আসেন। শ্রাদ্ধের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য রক্ষা করে অনুষ্ঠান করা হয়। শ্রাদ্ধের 'মন্ত্রাদি শ্রবণ ও দানাদির ব্যবস্থা দর্শন করিয়া পল্লীবাসীদিগের মনে বিশুদ্ধ ভাবের' উদয় হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যায় উপধ্যায় 'পরলোক' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। পরে তিনি তাঁর মায়ের দেহ ভস্মের ওপর একটি 'শ্বেত পাথরে নির্ম্মিত সমাধি বেদিকা' স্থাপন করেছিলেন। সমাধি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পাঁচদোনায় আত্মীয়-স্বজন ও ব্রাহ্ম বন্ধুদের সমাগম হয়েছিল।

নববিধানের প্রচারকার্যে গিরিশচন্দ্রের ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্তন

গিরিশচন্দ্র ১৮৭২ সালে ব্রাহ্মবন্ধু গোপীকৃষ্ণ সেনের তীব্র বিরোধিতায় মানসিক অশান্তিতে 'চিরজীবনের জন্য' ময়মনসিংহ ত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করে কলকাতা চলে যান। তারপর পেরিয়ে যায় অনেকগুলো বছর। তিনি কেশবচন্দ্রের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, কখনো পত্রিকা সম্পাদনায় কখনো বা প্রচার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে তখন ছিল সম্ভাবনার দুর্বার গতি। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই বেজে উঠে ভাঙনের গান। ১৮৭৮ সালে কেশবচন্দ্রের নাবালিকা কন্যার 'কোচবিহার বিবাহ' ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ব্রাহ্ম সম্প্রীতির চেতনা। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসুদের নেতৃতে জন্ম নেয় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্র তাঁর অনুগতদের নিয়ে ১৮৮০ সালে সর্বধর্মসমন্বয়ে নববিধান তত্ত্ব ঘোষণা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত নতুন ধর্মমত সম্পর্কে বলেন,"ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ১৮০১ শকের ১২ মাঘ (জানুয়ারী, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে) 'নববিধান' ঘোষণা করিলেন। এই সময় হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ 'নববিধান সমাজ' নামে বিখ্যাত হইল এবং ঐ সমাজের লোকেরা আপনাদিগকে নববিধান সমাজের লোক বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন।"[৫২]

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজও কোচবিহার ঝড়ের আক্রমণঝটিকায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। গিরিশচন্দ্র এ সংবাদ জানতে পেরে অন্তর্বেদনায় কাতর হয়ে পড়েন। ময়মনসিংহের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের ছিল প্রাণের যোগ, মমত্বের বাঁধন। সুতরাং সেখানে নববিধানের কার্যক্রম বন্ধ বলে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠে। 'কোচবিহার বিবাহে'র ঝড় ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে এত সজোরে আঘাত করেছিল যে কেশব ভক্ত ব্রাহ্মবন্ধুদ্বয়

কালীকৃষ্ণ বসু ও গোপীকৃষ্ণ সেন ময়মনসিংহ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ব্রাহ্মমন্দিরের অধিকার নিয়ে বিরোধ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। আদালতের রায় অনুযায়ী একপক্ষ সকালে এবং অন্য পক্ষ সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা করার অধিকার লাভ করেছিল। কিন্তু প্রকৃতির লীলা বুঝা-ভার ভূমিকম্পে মন্দির ভূমিসাৎ হলো। তখন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মৃতপ্রায় অস্তিত্বকে কোনো মতে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন পাঠশালার পণ্ডিত বিহারীকান্ত চন্দ্র। বিহারীকান্ত চন্দ্র নিজ আবাসে একটি ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পর্ণকুটীরে উপাসনার কাজ কোনোমতে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিহারীকান্ত ছিলেন দুর্বল, অর্থসম্বলহীন, ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী নিতান্ত অসহায় মানুষ। তাঁর উদ্যোগে ময়মনসিংহ ব্রক্ষমন্দির পুনর্নির্মিত হওয়া অসম্ভব ছিল।

তখন গিরিশচন্দ্র ময়মনসিংহে নববিধানকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে বিহারীকান্ত চন্দ্রের আলয়ে এসে স্থিতি করেছিলেন। তিনি বিহারীকান্তের বাইর বাড়ির একটি ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছাদিত ঘরে বাস করতেন এবং তাঁর সঙ্গে আরেকটি কুঠীরে দৈনিক উপাসনার ব্যবস্থা করেন। বিহারীকান্ত ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল ও অসুস্থ মানুষ। সুতরাং তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে উপাসনায় যোগ দিতে পারতেন না। গিরিশচন্দ্র দেখলেন, ময়মনসিংহে বিধান বিরোধীদল প্রবল, আর বিধানানুগত একজন লোকও নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। দুই একজন নিত্য উপাসনাশীল বিধানবিশ্বাসী উৎসাহী লোক এবং দুই একটি বিধানাশ্রিত পরিবার স্থায়ীরূপে বসবাস করলে বিধান রক্ষা ও বিধান প্রচার হওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। সুতরাং নববিধানকে শক্তিশালী, সুসংহত করার অভিপ্রায়ে ময়মনসিংহে বিধান বিশ্বাসী ব্রাহ্মবন্ধুদের স্থায়ী বসবাসের ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। ময়মনসিংহ জেলার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত জঙ্গলবাড়ি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন বিধান প্রচারক ভাই দীননাথ কর্মকার ও তাঁর ভাই চন্দ্রমোহন কর্মকার। গিরিশচন্দ্রের চেষ্টায় ও পরামর্শে এ দুই ভাই জঙ্গলবাড়ি ছেড়ে ময়মনসিংহে চলে আসেন। গিরিশচন্দ্র বর্ষাকালে তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে টাঙ্গাইল, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ও আরও কয়েকটি গ্রামে প্রচারাভিযানে যান। ইতোমধ্যে গিরিশচন্দ্র শুনতে পান শহরের একজন মুসলমান তার বসতভিটা ও আশেপাশের জমি বিক্রয় করবেন। সুযোগটা গ্রহণ করেন তিনি। দীননাথ, বসন্তকুমার ও বিহারীকান্ত তিন জন মিলে জমি ক্রয় করেন। তিন জনেরই আলাদা আলাদা অংশ থাকলেও বাড়ির অংশ নিয়ে 'প্রথমে বিবাদ বিসংবাদ ও গোলযোগ হয়'। পরে অবশ্য বিষয়টির মীমাংসা হয়। বিহারীকান্ত অন্যত্র গৃহ নির্মাণ করে চলে যান। জমি ক্রয়ের বছর পাঁচেক পর কর্মকার ভ্রাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠ ভাই ডাক্তার বৈদ্যনাথ কর্মকার জঙ্গলবাড়ি ছেড়ে স্বপরিবারে ভাইদের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন। বৈদ্যনাথ বিধানাশ্রিত গৃহস্থ । ময়মনসিংহে বসবাস শুরু করার কিছুদিনের মধ্যে তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায় সাফল্য আসে। তাঁর আর্থিক উন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। গিরিশচন্দ্র চাইতেন, বৈদ্যনাথ বিধানানুযায়ী গৃহস্থ বৈরাগীর ন্যায় জীবনযাপন করুক এবং বিধান বিরোধীদের সঙ্গে কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন না করুক। এতে তাঁর নিজের পরিবারের কল্যাণের সঙ্গে ময়মনসিংহের কল্যাণ নিহিত আছে বলে গিরিশচন্দ্রের অভিমত। পবিত্র প্রেম বন্ধনে এ তিন ভাই পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থায় বিধানের কাজ করলে বিধানবাদীগণ এক আনন্দঘন পরিবেশ পাবেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন, ময়মনসিংহে তাঁদের অবস্থান এবং বিধানের শুভ উদ্দেশ্য প্রচার বিধাতারই অমোঘ ইশারা। সুতরাং তাঁরা যদি তাঁদের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে সাংসারিক কাজে ব্যাপৃত থাকেন তবে তাঁদের নিজেদের অনিষ্ট এবং ময়মনসিংহের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ প্রচেষ্টায় কেন এ

আশংকা? তবে কি ময়মনসিংহের নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দৌর্বল্য ও অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর শাণিত মানসচক্ষে ধরা পড়েছিল?

যাই হোক, কর্মকার দুই ভাই দীননাথ ও চন্দ্রমোহন কর্মকারের প্রচেষ্টায় ময়মনসিংহে ব্রাহ্মমন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দীননাথ কর্মকারের 'উৎসাহ যত্ন ও পরিশ্রমে' সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। বিরোধীদল কিছু অর্থের বিনিময়ে পুরাতন মন্দিরের স্থান ছেড়ে অন্যত্র মন্দির স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিধান বিশ্বাসীরা সংগৃহীত অর্থ দিয়ে 'পুরাতন ইষ্টকাদি দ্বারা' ভগ্নমন্দির পুনর্নির্মাণ করেন। এরপর শুরু হয় পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উৎসবের পালা। মুক্তগাছার অন্যতম জমিদার দেবেন্দ্রনাথ আচার্যের অবস্থান ছিল নববিধানের স্বপক্ষে। সকল আয়োজনে তিনিই ছিলেন মধ্যমণি। তাঁর ইচ্ছা ও সহায়তায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। কোলকাতা থেকে এসেছিলেন ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভাই রামচন্দ্র সিংহ আর ঢাকা থেকে এসেছিলেন ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার একবেলা উপাসনা করেছিলেন আর বক্তৃতা দিয়েছিলেন দুদিন। একদিন বাংলায় আরেকদিন ইংরেজিতে। অত্যন্ত আনন্দ-উৎসাহে উৎসব উদযাপিত হয়েছিল। কিন্তু বিধি বাম, কিছুদিন পরে ভূমিকম্পে বিধানমন্দির ভেঙ্গে পড়ে। ভিক্ষালব্ধ অর্থে পুনরায় নির্মিত হয় মন্দির। এবার মন্দিরের ছাদ নির্মিত হয়েছিল করোগেটেড টিনের। ভূমিকম্পে ধসের সম্ভাবনা আর ছিল না। মন্দিরের পুনর্সংস্কারে সহায়তা করেছিলেন ময়মনসিংহের সেশন জজ এ.সি. সেন মহাশয়।

এভাবে বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আজীবনের সাধনায় ব্রাহ্মধর্মের আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন গিরিশচন্দ্র। জীবন ভাবনার নিঃসঙ্গ পথ চলায় তিনি ধর্মীয় চেতনাকে একাত্ম করেছিলেন। ধর্মই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান, জ্ঞান ও একমাত্র অবলম্বন। মহত্তের আহ্বানে সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্ঠায় নববিধানের সার্থকতাকেই তিনি তরান্বিত করেছিলেন।

ছ. স্ত্রীশিক্ষায় অনুরাগ

নারী সমাজের অর্ধাংশ, নারী মা-ভগিনী-কন্যা-জায়া, নারী পরিবারের মঙ্গলময় কল্যাণে মূর্তিময়ী আশীর্বাদ স্বরূপ। এতদ্‌সত্ত্বেও সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাঙ্গালি নারীসমাজ ছিল পশ্চাৎপদ, অবহেলিত, নিগৃহীত, অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের বেড়াজালে অবরুদ্ধ। নারীর সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষার বিকাশে পুরুষদের উদারতা, মহানুভবতা, আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার অভাব যেমন দায়ী ছিল, তেমনি দায়ী ছিল শিক্ষা চর্চায় নারীর উদাসীনতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব। তাঁদের মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলো অনুশীলনের অভাবে অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যেত। সামাজিক ও পারিবারিক বৈষম্যের কারণে তাঁদের অন্তঃকরণে পাঁচটি দুরারোগ্য ব্যাধি– কোন বিষয় শিক্ষার অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মূর্খতা ক্রিয়াশীল হয়ে তাঁদেরকে পুরুষের ক্রীড়ানকে পরিণত করত।[৫৩] শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা দিয়ে নারী সে বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেননি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে বাঙালি আধুনিকতার স্পর্শ পেল, লাভ করল যুক্তিনিষ্ঠ উদার মানবিকতার এক নবতর চেতনা। কিন্তু নারী সমাজ তখনও সহস্রাব্দের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীর্ণতার অতল গহ্বরে বন্দি। কন্যা হয়ে জন্মানোকে নারীরা তখনও পাপ মনে করত এবং পাপবোধে আরো বেশি অবগুণ্ঠিত হয়ে অবরুদ্ধতায় আশ্রয় খুঁজে নিত। পরিবারও কন্যা সন্তানের জন্মকে বোঝা মনে করত। "কন্যা সন্তান জন্মিলে পিতার যেরূপ ভাবনার বিষয়, এরূপ কাহারও নয়। শৈশবে কি প্রকারে তিনি তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিবেন এই ভাবনায় দিনযামিনী কাতর হয়েন, এবং এইখানেই কি তাহার ভাবনার শেষ? কন্যা বিবাহিতা হইলেও তাঁহার অশেষ ভাবনা, পাছে বিধবা হন, পাছে স্বামী কর্তৃক পরিত্যাজ্যা হয়েন, পাছে শ্বশুরালয়ে যন্ত্রণা পান এই প্রকার ভাবনায় তিনি অণুদিন আক্রান্ত থাকেন। এইজন্যই কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, কন্যা সন্তানের যতদিন না মৃত্যু হয় ততদিন জনক জননীর শান্তি লাভ নাই।"[৫৪] প্রথাবদ্ধতায় উচ্চারিত অভিশপ্ত এ ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে বাংলার নারী সমাজকে সভ্যতার সূর্যোদয়ের আগমনী বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সে সময়ের কিছু প্রগতিশীল শিক্ষিত মানুষ। জাতি ও দেশ গঠনে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁরা। নারী শিক্ষাকে তাঁরা অধিকার পর্যায়ভুক্ত মনে করেছিলেন। শিক্ষা নারীর অধিকার-শ্লোগানে তাঁরা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন একমাত্র শিক্ষাই পারে নারীর জীবনভাবনায়, জীবনাচরণে, মানস পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে। বাঙালিদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ই নারী শিক্ষা ভাবনার অগ্রপথিক। ১৮১৮-১৯ খ্রী. তাঁর লেখা 'প্রবর্তক নিবর্তন সম্বাদ' পুস্তিকায় নারী সমাজের মধ্যে জ্ঞানের আলো প্রসারের প্রয়োজনীয়তা তিনিই প্রথম অনুভব করেন। নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতিবাদ করে তিনি বলেন,

> "স্ত্রী লোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়, আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে

বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাত আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।"[৫৫]

অবশ্য এর আগে ১৮১৪ সালে মি. মে চুঁচুরায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে নারী শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। তখন মিশনারীদের উদ্যোগে বাংলায় স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলছিল। ১৮১৯ সালের জুন মাসে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি নামক সমিতিটি স্থাপিত হবার পর কলকাতা, নন্দবাগান, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এসব বিদ্যালয়ে ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা পড়তে আসত না। বর্ণাশ্রমধর্মী সমাজ ব্যবস্থায় নিচু স্তরের মানুষের মেয়েরা এখানে পড়ত আসত। এর কারণ ভদ্রসমাজে তখনও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে অনুকূল মনোভাব গড়ে উঠেনি। রক্ষণশীল সনাতনপন্থী মানুষ 'স্ত্রীজনের বিদ্যানুশীলন শাস্ত্র সম্মত নহে'[৫৬] বলে স্ত্রী শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। নারী শিক্ষিত হলে তাঁদের চরিত্রে নৈতিকতার স্খলন ঘটবে, গুপ্ত প্রণয় বাড়বে, অধিকহারে বিধবা হবে এবং কোনো ছেলে শিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হবে না ইত্যাদি অজুহাতে তাঁরা নারী শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছিলেন। সোনিয়া নিশাত আমিন বলেন,

"যদিও নারী শিক্ষার উপর হিন্দু শাস্ত্রে কোন বাধা ছিল না, তবুও আঠারো এবং ঊনিশ শতকে এ শিক্ষাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অবহেলা করা হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে তা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে যখন ইউলিয়াম এ্যাডাম তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেন তখন তিনি উল্লেখ করেন যে বালিকাদের শিক্ষাগ্রহণকে অমঙ্গলের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হতো, কারণ জনগণ বিশ্বাস করতো এর ফলে মেয়েরা বিধবা বা কুচক্রী হবে।"[৫৭]

কুসংস্কারাছন্ন এ ধারণাকে কেন্দ্র করে সেসময় প্রগতিশীল ও রক্ষণশীলদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে বিপক্ষে তুমুল যুক্তিতর্ক চলছিল। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির উদ্যোগে এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের সক্রিয় সহায়তায় গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' প্রকাশ করেন। এ বইটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। ১৮২১ সালে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে এদেশে আসেন মিস কুক। এক বছরের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি আটটি বালিকা বিদালয় স্থাপন করেন। ঠনঠনিয়া স্কুল, মির্জাপুর স্কুল, প্রতিবেশী স্কুল, শোভাবাজার স্কুল, কৃষ্ণরাজার স্কুল, মল্লিকবাজার স্কুল প্রভৃতি। ১৮২২ সালের কয়েক মাসের মধ্যে মিস কুকের বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা হয় ২১৭ জন। ১৮২৩ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে হয় ২২টি, ছাত্রী সংখ্যা হয় ৪০০ জন। ১৮২৪ সালে চার্চ মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে লেডিস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৬ সালে কর্ণওয়ালিস স্কয়ারের পূর্ব কোণে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮২৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে এ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৮২৯-৩০ সালের মধ্যে এ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা হয় ১৫০-২০০ জন।[৫৮] এভাবে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটে। তবে মিশনারীদের এ শিক্ষা প্রসারকে সে সময়ের সাধারণ মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এ বিমুখতার পেছনে ছিল মিশনারীদের ধর্মান্ধতা। শিক্ষা প্রসারে মিশনারীদের এ পরহিত সাধন নিছক মানবপ্রেমজাত নয়। সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার বিস্তারে তাঁরা তাঁদের ধর্ম প্রচারকে গুরুত্ব

দিয়েছেন। তাঁরা যেখানেই যেতেন সেখানেই মুদ্রাযন্ত্র নিয়ে যেতেন, স্থানীয় ভাষা শিখে সে ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য বই ছাপাতেন। সে দেশের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করে খৃস্টের বাণী প্রচার করতেন। যাঁরা তাঁদের প্রলোভনে, প্ররোচনায় বা শিক্ষায় স্বধর্ম ত্যাগ করতেন তাঁরা তাঁদের আশ্রয় দিতেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন। এদেশে তাঁদের শিক্ষা প্রসারের অন্তরালে লুকিয়ে ছিল ধর্ম প্রচারের তাগিদ।[৫৯] তাঁদের ধর্মান্ধতার কারণে শিক্ষা বিস্তারের মতো মহৎ উদ্যোগ সে সময় গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। সে সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবার তাঁদের এহেন ধর্মাচরণ মেনে নিতে পারেননি। ফলে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা শিক্ষাবঞ্চিতই রয়ে গেলেন। এ সময়ে ডিরোজিওপন্থী ইয়ংবেঙ্গলেরা নারী শিক্ষাকে মানবিক অধিকার বলে ঘোষণা করলেন। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরা 'পার্থেনন',' জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এ পত্রিকায় তাঁরা নারী মুক্তির লক্ষ্যে নারী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরলেন। ত্রিশের দশকে ইয়ংবেঙ্গলেরা পত্র পত্রিকায় স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে লেখালেখি করেন, সভা সমিতিতে আলাপ আলোচনার ঝড় তুলেন। এ উদ্যোগকে বাস্তবে রূপদানের জন্য তাঁদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে মেয়েদের বাড়িতে ইংরেজি ও বাংলা লেখতে পড়তে শেখানো শুরু করেন। এঁদের প্রচেষ্টায় সে সময়ে এক শ্রেণির মানুষ সংঘবদ্ধভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন বলে অনুমান করা হয়।[৬০] সামাজিক ব্যাধিগুলো সমূলে উৎপাটিত করে নারী শিক্ষাকে গতিশীল করার তাগিদ ইয়ংবেঙ্গলরা পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্তর্মূল থেকে। নারী শিক্ষাকে বিকশিত করার লক্ষ্যে তাঁরা বিভিন্ন সভা-সমিতি ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে কয়েকটি মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ সালে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর বাৎসরিক পরীক্ষায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দুশো টাকা পুরস্কার পান। ১৮৪২ সালে দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে মধুসূদন দত্ত প্রথম পুরস্কার 'সোনার পদক' পান। তিনি তাঁর রচনায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত রচনাটির প্রশংসা করে বলেছিলেন- "একটি শিশু ছোটবেলায় যা শেখে পরবর্তীকালে সেটি তার মনে গভীর রেখাপাত করে। মায়ের কাছেই শিশু সব কিছু শেখে। যদি মা'দের আলোকপ্রাপ্ত করা না যায় তবে তাঁদের অজ্ঞতা শিশুদের মনে প্রভাব ফেলবে।"[৬১] সুতরাং মা'দের শিক্ষিত হবার আবশ্যক প্রয়াসকে তরান্বিত করতে ইয়ংবেঙ্গলরা ছিলেন দ্বিধাহীন, কুণ্ঠাহীন।

এ দেশীয়দের উদ্যোগে ১৮৪৭ সালে বারাসাতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র ও সহোদর নবীনকৃষ্ণ মিত্র। তাঁদের এ মহতী দুঃসাহসিক উদ্যোগের জন্য বারাসাতবাসী তাঁদের ওপর সামাজিক নির্যাতন চালান, তাঁদের একঘরে করেন। নারীশিক্ষা প্রসারে বাংলার প্রগতিশীল ও রক্ষণাশীলদের মধ্যে যখন দ্বান্দ্বিকতা চরম পর্যায়ে বিরাজ করছিল তখন ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বড় লাটের আইন পরিষদের সদস্য হয়ে কলকাতায় আসেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। অল্পদিনেই কর্মদক্ষতায় তিনি শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হন। শিক্ষা সংসদের সভাপতি রূপে তিনি বারাসাত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। সেখান থেকেই কলকাতায় অনুরূপ একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন। তিনি ১৮৪৯ সালের ৭মে কালকতায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেথুন বিদ্যালয় স্থাপিত হলে সম্ভ্রান্ত বাঙালিরা এগিয়ে আসেন। নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, ঈশানচন্দ্র বসু, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মদনমোহন প্রভৃতি গণ্যমান্যব্যক্তি তাঁদের কন্যাদের

বেথুন বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন। গোবিন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, দ্বারকানাথ গুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, হেমনাথ রায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরিনারায়ণ দে, দেবনারায়ণ দে, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও হরকুমার বসু তাঁদের কন্যা ও ভগিনীকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন।[৬২] 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ ভাস্কর', 'সমাচার দর্পণ', 'সংবাদ রসরাজ', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'সহ অধিকাংশ পত্রিকা বেথুনের এ প্রয়াসকে স্বাগত জানান এবং স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করেন। তবে রক্ষণশীলরাও এ সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। "বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠানোর প্রয়োজন তো এঁরা বোধ করলেনই না, বরং যাঁরা মেয়ে পাঠাতেন ও এ ব্যাপারে সাহায্য করতেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সমাজচ্যুতির আন্দোলন গড়ে তুললেন সর্বত্র। সামাজিক নির্যাতন চলত তাঁদের ওপর। এমনকি বিদ্যালয়ে গমনরত ছোট ছোট বালিকার উদ্দেশ্যে অভদ্র মন্তব্য ছুঁড়ে দিতেও এঁদের বিবেকে বাধত না। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বৈঠকী আড্ডা জমে উঠেছিল। লোকে বলতে লাগল, 'এইবার কলির যা বাকি ছিল হইয়া গেল'।"[৬৩] সুতরাং কণ্ঠকাকীর্ণ পথেই শুরু হয়েছিল বেথুনের পথচলা। বন্ধুর পথ পেরিয়ে স্ত্রীশিক্ষা ধীরে ধীরে ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করতে লাগল। এসময় স্ত্রীশিক্ষার কাণ্ডারি হয়ে এসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নিরলস সাধনায়, কর্মপ্রচেষ্টায়, আন্তরিক নিষ্ঠায় বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার সদ্য প্রজ্জ্বলিত শিখাকে ব্যাপক প্রসারতা দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলেন,

> "স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক চেতনা তখন ধীরে ধীরে বাংলার এই নাগরিক উচ্চসমাজের মধ্যে জাগছিল। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের এক কুসংস্কার বংশ পরম্পরায় তাঁদের চেতনাস্তরে স্তূপীকৃত হয়েছিল যে মাত্র কয়েক বছরের পুঁথিগত বিদ্যার জোরে হঠাৎ তাঁকে ঠেলে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। তাই চেতনা তাঁদের মনে জাগলেও তা এত তরল ছিল যে কোনো সুচিন্তিত কর্মক্ষেত্রে তাকে তাঁরা পরিচালিত করতে পারেননি। তাঁদের দুর্বল মনের কোণে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ক্ষীণ সদিচ্ছার স্বাভাবিক অপমৃত্যু ঘটেছিল। একটা নিরবয়ব আগ্রহের পদসঞ্চরণ যখন এইভাবে এ দেশের অত্যন্ত সংকীর্ণ শিক্ষিত সমাজের মনের প্রাঙ্গণে শোনা যাচ্ছিল, সেই সময় বেথুন ও বিদ্যাসাগর দৃঢ়পদে স্থির বিকল্প নিয়ে অগ্রসর হলেন তাকে বাস্তবে মূর্ত করে তোলার জন্য। ডালহৌসিও বেথুনের শুভেচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হল এদেশের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা।"[৬৪]

শিক্ষা হলো নারী উন্নয়নের মূলমন্ত্র এ স্থির বিশ্বাসে বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা প্রসারের সাধনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। গভর্ণমেন্ট স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর পদে থাকাকালীন তিনি বর্ধমান, মেদেনীপুর, হুগলী ও নদীয়া চারটি জেলায় মোট ৩৫টি মেয়েদের স্কুল আর ২০টি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। এ স্কুল স্থাপন করতে গিয়ে তাঁকে সামাজিক প্রতিক্রিয়া, বিরূপ সমালোচনা ও সরকারী প্রতিকূলতারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। কোনো প্রতিকূল অবস্থাই তাঁর অটল প্রত্যয়কে টলাতে পারেনি। নিজের উপার্জিত অর্থ ও বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে বিদ্যালয়গুলোর ব্যয়ভার চালিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের একাগ্রতা, কর্মোদ্দীপনা, সুতীব্র প্রেরণা ও সহনশীলতা পর্যবেক্ষণ করে এবং ছোট লাটের সমর্থনের কথা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার

বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা বাবদ সমস্ত খরচ মঞ্জুর করেন। বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত পরিশ্রমে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশবাসীর আগ্রহ জন্মে এবং একাধারে বিদ্যালয় ও ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে চলে।

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে ব্রাহ্মদের অবদান সুবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করে ব্রাহ্মগণ তাঁদের কন্যা সন্তান ও ভগিনীকে স্কুলে ভর্তি করেন। এ সমাজের অন্যতম প্রবীণনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে সামাজিক প্রথা ভেঙ্গে তাঁর কন্যা সৌদামিনীকে স্কুলে ভর্তি করান এবং রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লেখেন- "আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যা সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।"[৬৫] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলাদেবী, হিরন্ময়ী দেবী, ইন্দিরা দেবী সে সময়ে উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁর স্ত্রীশিক্ষা কর্ম প্রয়াসকে আরও জোরালো ভূমিকায় অবতীর্ণ করলেন। তিনি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার নীতিগত পরিবর্তনেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মির্জাপুর স্ট্রিটে 'ফিমেল নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র ছাড়া এ পর্বে আনন্দমোহন বসু, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দুর্গামোহন দাস, অন্নদাচরণ খাস্তগির, রজনীনাথ রায়, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রমুখ ব্রাহ্মের নামও প্রণিধানযোগ্য। ১৮৬৩ সালে অন্তঃপুরে নারীশিক্ষা প্রসার প্রকল্পে কয়েকজন ব্রাহ্মযুবক মিলে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা বের করেন। ব্রাহ্মসমাজের ধারাবাহিকতায় আমরা পাই ভাই গিরিশচন্দ্র সেনকে।

গিরিশচন্দ্র তাঁর চারপাশের সামাজিক অবস্থা দেখেছেন, দেখেছেন নারীর ওপর মানবতা বিবর্জিত অত্যাচার ও নির্যাতন। নারীত্বের এই নির্মম অবমাননা তাঁর শিশুমনে প্রভাব ফেলেছিল। তখন থেকেই তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন'-এ বলেন,

> "স্বদেশে গৃহে অবস্থানকালে প্রত্যেক পরিবারের বধূদিগের দুঃখ দুরবস্থা ও তাহাদের প্রতি শাশুড়ী ননদ প্রভৃতির অত্যাচার দর্শন করিয়া আমার মন অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে। এইরূপ নিপীড়ন ও নির্য্যাতনের ভিতরে থাকিয়া তাহাদের মনোবৃত্তি সকল স্ফূর্তি পাইতেছিল না, জ্ঞান পিপাসা কিছুই চরিতার্থ হইতে ছিল না। ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণও বধূরূপে দাসীর ন্যায় দিবা-রাত্রি খটিয়া গলদঘর্ম্ম হন, প্রায় কাহারও হইতে আদর যত্ন লাভ করেন না, কাজে ক্রটি হইলে গঞ্জনা ভোগ করেন, তাঁহাদিগকে নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাঁহাদের মুখ ফুটিয়া কথা কহিবার স্বাধীনতাটুকু নাই। এ সকল দেখিয়া আমি মনে ক্লেশ পাইতাম, ভাবিতাম লেখাপড়া না শিখিলে, আত্মোন্নতি না হইলে, ইহাদের অবস্থার উন্নতি, স্বাধীনচিন্তা, মানসিক স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।"[৬৬]

শিক্ষাহীন জীবন তমসাচ্ছন্ন জরাজীর্ণতায়, হীনতায়, দীনতায়, অসাড়তায় পর্যবেশিত জীবন। গৃহকোণে আবদ্ধ, নির্যাতিত, নিপীড়িত, শিক্ষার আলো বঞ্চিত নারীর হীন অবস্থা তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তাঁদের উন্নয়ন কল্পে, তাঁদের চেতনাকে শাণিত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি নিজ গ্রাম পাঁচদোনায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর এ উদ্যোগে এগিয়ে এলেন সমমনা বন্ধু ও কৃতবিদ্য আত্মীয় কৈলাসচন্দ্র সেন ও বসন্তলাল সেন। স্থানীয় প্রতিকূলতা ও বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভদ্র পরিবারের অনেকগুলো বালিকা উক্ত স্কুলে ভর্তি হয়ে শিক্ষারম্ভ করে। পাঁচদোনার সার্কেল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত

বিশ্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিদিন সকালে অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে ছাত্রীদের শিক্ষাদান করতেন। পরবর্তী সময়ে এ বিদ্যালয়টি কিছু সরকারি সাহায্যও পেয়েছিল। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন করে অনেক বালিকা বিয়ের পর স্বামী বা অন্য আত্মীয়ের সাহায্যে পরবর্তী সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করে, আবার অনেক ছাত্রী প্রাইমেরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্রীয় বৃত্তিও পায়। কলকাতায় অবস্থানকালে ছাত্রীদের উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি সুন্দর সুন্দর গল্পের বই, ছড়ার বই, ছবির বই ও নানা প্রকার খেলার সামগ্রী পাঠাতেন। কখনো কখনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অযত্ন অবহেলায় স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বটে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও স্থানীয় কয়েকজনের সাহায্য সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি পুনরায় চালু হয়। এ বিদ্যালয়টি ছিল রূপগঞ্জ ও নরসিংদী থানার মধ্যে আদি বালিকা বিদ্যালয়।[৬৭]

ময়মনসিংহ শহরে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত থাকাকালীন তিনি সেখানেও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেখানে মেয়েদের জন্য পারিবারিক শিক্ষা বা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কোনোটিরই সুযোগ ছিল না। শিক্ষা বঞ্চিত মেয়েদের দুরবস্থায় তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। জ্ঞানালোকে তাঁদের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে তিনি ময়মনসিংহে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আর এ বিদ্যালয় প্রতিষ্টায় তাঁকে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন মুড়াপাড়ার জমিদার ও ময়মনসিংহের জেলা কালেক্টরের তদানীন্তন খাজাঞ্চি গিরিশচন্দ্রের পরমাত্মীয় বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাড়িতেই প্রথমে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। তাঁর দুটি মেয়ে ও অন্যান্য ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের আরো অনেকগুলো মেয়ে বিদ্যালয়ে পড়তে আসত। গিরিশচন্দ্র প্রতিদিন সকালে কমপক্ষে তিনঘন্টা করে দুই বৎসর পর্যন্ত বালিকাদের শিক্ষাদান করেছিলেন। এজন্য তিনি কোনো প্রকার পারিশ্রমিক নেননি। মেয়েদের আত্মোন্নয়ন, চিন্তার পরিধি বৃদ্ধি, প্রথাবদ্ধ জীবনের পরিবর্তনেই ছিল তাঁর আনন্দ, ছিল তাঁর তৃপ্তি। কালেক্টর রেনাল্ড সাহেবের পত্নী দুবার তাঁর বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। একবার মেয়েদের পড়াশুনায় উৎসাহবৃদ্ধির জন্য নানা প্রকার সেলাই সামগ্রী ও খেলার সামগ্রী উপহার দিয়েছিলেন। পরে তিনি ময়মনসিংহ ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সময়ের পরিবর্তনে গভর্নমেন্ট ও জমিদারদের অর্থ সাহায্যে বিশালকায় বিদ্যালয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অন্যান্য বিদ্যালয়ের মতো সে বিদ্যালয়ের মেয়েরাও সে সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল।

ময়মনসিংহ জেলাস্কুলের কাজ পরিত্যাগ করে তিনি কলকাতার ১৩ নং মির্জাপুর স্ট্রিটে অবস্থান করেন। ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন তাঁর প্রকৃতি ও রুচি বুঝে তাঁকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি ছাত্রীদের বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়াতেন। দেশ ও সমাজের প্রথাবদ্ধতা, জরাজীর্ণতা, অন্তঃসারশূন্যতা, ধর্মান্ধতা দূর করার অভিপ্রায়ে প্রসারিত ছিল ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার প্রচেষ্টা। সে সমাজের সভ্য হয়ে গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন নারীর উন্নয়ন, নারীর স্বাধীনতা ও নারীর মুক্ত চেতনা ছাড়া সংস্কার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণতা পাবে না। নারীর অধিকার সচেতনতায় তিনি ১২ বছর মাসিক ‘মহিলা পত্রিকা’ সম্পাদনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, নারীর জ্ঞানোন্নতি বিধায়িনী ‘বামাবোধিনী’, ও ‘পরিচারিকা’ নামক পত্রিকারও তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের নারীশিক্ষা মনোভাব গড়ে উঠেছিল ছোটবেলা থেকে। যৌবনে তিনি নারীশিক্ষা প্রসারের প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন আপন আঙ্গিনায়। তিনি তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মময়ীকে আপন হাতে পড়াশুনা শিখিয়েছিলেন। তিনি গ্রামের মেয়েদের লেখাপড়াতেও আগ্রহী ছিলেন এবং শেষ জীবনে গরীব দুঃখী নারীদের শিক্ষার সাহায্যার্থে উইলও করেছিলেন। "ঋণ পরিশোধ ও পুস্তক পুনর্মুদ্রাঙ্কনার্থ ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া অর্থ সঞ্চিত থাকিলে দরবার প্রচার কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য শতকরা (২৫) পঁচিশ টাকা রাখিবেন, অবশিষ্ট ৭৫ 'পঁচাত্তোর' টাকা আমার জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামের দুঃখিনী বিধবা, নিরাশ্রয় বালক-বালিকা, দরিদ্র বৃদ্ধ ও নিরুপায় রোগী এবং নিঃসম্বল ছাত্র ও ছাত্রীদিগের অন্নবস্ত্র, চিকিৎসা ও বিদ্যা শিক্ষার সাহায্যার্থে ব্যয়িত হইবে।"[৬৮] ছাত্রাবস্থায় তিনি যখন ময়মনসিংহে নর্মাল শ্রেণিতে পড়েছিলেন তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তায় গুরুত্ব আরোপ করে রচনা করেছিলেন 'বনিতাবিনোদ' নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা পদ্যে রচনা করেছিলেন। পরিণত বয়সেও স্ত্রীশিক্ষার মহান ব্রত থেকে তিনি পিছুপা হননি। স্বদেশে কিংবা বিদেশে কোনো মহিলা লেখাপড়া চর্চা করছে শুনলেই তিনি আনন্দিত হতেন। পত্রিকার সম্পাদক থাকাবস্থায় যদি নারীদের কোনো চিঠিপত্র ও রচনা পেতেন এবং তা যদি ছাপানোর উপযুক্ত হতো তিনি তা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে পত্রিকায় ছাপাতেন। সে সময় পাবনা নিবাসী হরিশচন্দ্র তলাপাত্রের পত্নী বামাসুন্দরী দেবী মহাবিদ্যাবতী বলে বাংলায় অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত একটি বই পড়ে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পত্র মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বামাসুন্দরী দেবী তাঁকে হিতৈষী বন্ধু মনে করতেন। বামাসুন্দরী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁর ছাত্রীদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য গিরিশচন্দ্র অনেকগুলো পুস্তক পাঠিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র সে অবক্ষয়ের যুগে কত বড় উৎসাহদাতা ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্যার কে জি গুপ্তের পত্নীর লেখা চিঠিতে-

> "আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। জানি না আপনার মনে আছে কিনা, প্রায় ৩৭ বৎসর গত হইল আমি তখন মাত্র ১২ বৎসরের ছিলাম, তখন আমি আমার মাতুলকে একখানা চিঠী লিখিয়াছিলাম, আপনি সেই চিঠী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং ময়মনসিংহের বিজ্ঞাপনী পত্রে তাহা ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। আপনিই সর্ব্ব প্রথমে আমার লেখা কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বইখানি আপনার মনে আনন্দ প্রদানে সমর্থ হইয়াছে, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।"[৬৯]

তিনি শ্রীমতি উত্তমাসুন্দরীর রচনা শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কতগুলো পত্র ও প্রবন্ধ তাঁর উৎসাহ বর্ধনার্থে বিজ্ঞাপনী পত্রিকায় মুদ্রিত করেছিলেন। এই উত্তমাসুন্দরী ছিলেন তৎকালীন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অন্যতর শিক্ষক রামমাণিক্য সিংহের বড় কন্যা এবং ঈশানচন্দ্র চন্দের পত্নী। পরবর্তী সময়ে পত্রযোগে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। উত্তমাসুন্দরী তাঁকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর লেখালেখিতে অনুপ্রেরণা যোগাতেন, এজন্য তাঁকে তিনি অনেকগুলো বইও উপহার দিয়েছিলেন।

শিক্ষার ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রের উৎসাহের প্রস্রবণ ধারা থেকে পাঁচদোনার আগ্রহী বিদ্যার্থীরা বঞ্চিত হননি। আচার্য কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া নারী বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বাইরের মেয়েরাও পরীক্ষা দিতে পারতেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগে

ভ্রাতুস্পুত্র ইন্দুভূষণের সহায়তায় পাঁচদোনার বধূ শ্রীমতী হেমলতা এবং শ্রীমতী সুশীলা হস্তাক্ষর ও বাঙ্গলা রচনা প্রভৃতির পরীক্ষা দিয়েছিলেন, হেমলতা উত্তম হস্তাক্ষরের জন্য প্রথম পুরস্কার ১৫ টাকা এবং উত্তম রচনার জন্য প্রথম পুরস্কার ২৫ টাকা পেয়েছিলেন। সুশীলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুস্তকাদি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য নির্দিষ্ট ছিল ৫০ টাকা তা অবশ্য কেউ পাননি। কিশোরগঞ্জের ব্রাহ্মভাই বিহারীলাল সেনের পত্নী কিশোরী মোহনী হেমলতার সমান নম্বর পেয়ে ২৫ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতুস্পুত্রী শ্রীমতি অক্ষয় কুমারী কাগজে কাটা ছবির জন্য কেশবচন্দ্রের কাছ থেকে ১০ টাকা পুরস্কার লাভ করেছিলেন। অক্ষয়কুমারী ও তাঁর ছাত্রী গঙ্গা কাগজে কাটা ছবির জন্য ইউরোপ আমেরিকাতে পর্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁরা যীশুখ্রিস্টের বিভিন্ন ছবি, হিন্দু দেব দেবীর ছবি এবং বিখ্যাত মানুষের ছবি কাগজ কেটে এমন আশ্চর্য নৈপুণ্যে তৈরী করতেন যে দর্শকমাত্রই বিস্মিত ও চমৎকৃত হতেন। তাঁদের তৈরী কিছু ছবি কোচবিহারের মহারাজ, ত্রিপুরার মহারাজ, ময়ূরভঞ্জের মহারাজ এবং কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীকে উপহার দেয়া হয়েছিল। তা পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁরা অক্ষয়কুমারী ও গঙ্গার উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তাঁদেরকে কেউ ৫০ টাকা, কেউ ৪০ টাকা, কেউ ২০ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। এমনকি আমেরিকা হতেও ৪০টাকা পুরস্কার এসেছিল।[৭০] ব্রাহ্মসমাজ নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অক্ষয়কুমারীর কিছু ছবি প্রাক্তন লেফটেনেন্ট গভর্নর ইলিয়ট সাহেবের পত্নী লেডি ইলিয়টের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ছবি পেয়ে তিনি শিল্পীদ্বয়কে ভূয়সী প্রশংসা করে পত্র লেখেছিলেন। স্টেটসম্যান সম্পাদক অক্ষয়কুমারীকৃত যীশুখ্রিস্টের একটি ছবি পেয়ে ইতালির প্রসিদ্ধ চিত্রকরের চিত্রের সঙ্গে তুলনা করে বৃহৎ সমালোচনা করেছিলেন। কলকাতা আর্ট স্কুলের ইতালীয় প্রিন্সিপাল ও লিন্তো গিলার্ডি অক্ষয়কুমারীর কাগজে কাটা ভিক্টোরিয়ার ছবি দেখে বলেছিলেন, ইতালিতে কাগজে কাটা ছবি হয়, কিন্তু এত সুন্দর ও পরিষ্কার হয় না। গিরিশচন্দ্র তাঁর মায়ের একটি ছবি শিল্পীকে দিয়ে তৈরি করে নিয়েছিলেন। ছবিটি অত্যন্ত সুন্দর এবং ঝকঝকে হয়েছিল। এটি ব্রোনাইট আলেখ্যকে আদর্শ করে কাটা হয়েছিল। এ ছবির কারুকার্য অত্যন্ত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র সেন নারী অগ্রসরতার মসৃণ পথ রচনায় নিরলস পরিশ্রম করেছিলেন। ক্লান্তি, হতাশা বা ব্যর্থতা বোধ তাঁকে থামাতে পারেনি। নারীশিক্ষা সহায়তায় তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। যেখানেই নারীশিক্ষার সম্ভাবনা দেখেছিলেন, সেখানেই তিনি উৎসাহ উদ্দীপনার ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। নারীশিক্ষায় তাঁর উৎসাহ সম্পর্কে প্রিয়বালা গুপ্তা তাঁর আত্মজীবনী 'স্মৃতিমঞ্জুষা'য় আলোকপাত করেছেন। পারিবারিক বিভিন্ন প্রতিকূলতায় প্রিয়বালার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মনে ছিল পড়াশুনার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। মনের ইচ্ছা দাদাভাই গিরিশচন্দ্রের কাছে ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন "বেশ ত, পড়বি তাতে কি। মেছুয়াবাজারে একটা মেয়েদের স্কুল আছে, সেখানে আমাদেরই একজন প্রচারক আছেন, তার মেয়ে সেই স্কুলের শিক্ষিকা, তোর সাথে আমি একটা চিঠি দিয়ে দেবো– সেই স্কুলে ভর্তি হয়ে যা।"[৭১] দাদার উৎসাহে প্রিয়বালা স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

গিরিশচন্দ্র সেন নারীশিক্ষায় উৎসাহ প্রেরণা দানে ছিলেন স্নেহপ্রবণ অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। নারীরা শিক্ষিত হোক, সুন্দর স্বাভাবিক জীবনবোধ ফিরে পাক, তাঁদের সৌন্দর্যচেতনায় সংসার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে উঠুক এটি ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। তাঁর চেতনায় বাংলার শাশ্বত নারীমূর্তির রূপটিই পরিদৃশ্যমান ছিল। নব যুগের সবচেয়ে আধুনিক ধর্মবোধের ধারক হয়েও তিনি গতানুগতিকতার বাইরে নারীর উত্তরণকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি নারীর ধর্মহীনতা, আধুনিক সভ্যতায় একাত্ম হওয়া, রাজনীতি করা ও বিবিয়ানার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলেন। সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি নারীর অংশগ্রহণকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেননি। 'কোচবিহার বিবাহ' ও 'বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী ও বয়কট' আন্দোলনে তাঁর নারী বিষয়ক যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, তা একান্তই প্রথাবদ্ধ, একদেশদর্শী ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতারই অনুবর্তন। তিনি নারীর পরম হিতৈষী বন্ধু সন্দেহ নেই কিন্তু চিন্তা চেতনায় প্রগতিকে তিনি আত্মস্থ করতে পারেননি। 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' বা 'লজ্জা নারীর ভূষণ' ইত্যাদি প্রচলিত ধ্যান-ধারনায় তিনি আবদ্ধ ছিলেন। এখানে এসে নারীশিক্ষা প্রসারতায় তাঁর সীমাবদ্ধতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আধুনিকতার চেতনা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয় এবং যুগের প্রয়োজনেই পরিবর্তিত হয়। পূর্বতন সময়ের জরাজীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ প্রথাকে উত্তরণই আধুনিকতা। গিরিশচন্দ্র নারী আধুনিকতার এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হননি। নারী প্রগতির সম্পূর্ণতাকে তিনি ধারণ করতে পারেননি, একটি নির্দিষ্ট পরিধিতেই তাঁর নারী উন্নয়ন ভাবনা ঘূর্ণীয়মান হয়েছিল। ।

কিছু সীমাবদ্ধতা বাদ দিলে গিরিশচন্দ্র সেন নারীশিক্ষায় যে অবদান রেখেছেন তা সত্যিই বিরল। তিনি নিগৃহীত, অবহেলিত, অবরুদ্ধ বাঙালি ললনার মনোবেদনার সহায়ক হয়ে তাঁদের জন্য মুক্ত আলোর অবারিত দ্বার উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাচর্চায় আগ্রহী নারীকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, অনেকসময় তাঁদের শিক্ষাচর্চার ব্যবস্থাও করেছিলেন। মুসলিম নারীমুক্তির অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াতের শিক্ষা প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রোকেয়া সাখাওয়াতের সঙ্গে তাঁর ছিল মা-পুত্রের সম্পর্ক। আজীবন নারীর শিক্ষার স্বপক্ষে ছিল গিরিশচন্দ্রের অবস্থান। ধর্ম সাধনার মতোই তাঁর আরেকটি সাধনা ছিল নারী সেবা। তাঁর জীবন ছিল ব্রহ্মময়ী। এক ব্রহ্মময়ীকে হারিয়ে বাংলার হাজারও ব্রহ্মময়ীর দুঃখ মোচনের ব্রত তিনি নিয়েছিলেন এবং তা পালনও করেছিলেন।

জ. পারিবারিক বিষয়সম্পত্তি ও গিরিশচন্দ্রের উপজীবিকা

ময়মনসিংহে উপাচার্যের পদ নিয়ে গোপীকৃষ্ণ সেনের সৃষ্ট অশান্তির কারণে গিরিশচন্দ্র সেন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং 'চিরজীবনের জন্য ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করাই' স্থির করেন। তখন তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের পণ্ডিতের পদে কর্মরত ছিলেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বে বিচলিত হয়ে মানসিক স্থিরতা ও সুস্থিরতার আশায় পরিশেষে তিনি তাঁর প্রিয় ময়মনসিংহকে ছেড়ে কলকাতা চলে গিয়েছিলেন। প্রচারকদের সাহায্য সহযোগিতা করার আকাঙ্ক্ষায় দৃঢ় ছিল তাঁর মনোভাব। তিনি যখন কলকাতায় চলে আসেন তখন তাঁর সঞ্চয় বলে কিছুই ছিল না। ময়মনসিংহে থাকাবস্থায় তিনি যা উপার্জন করেছেন তার সবই ব্যয় করেছেন ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে। কলকাতা আসার পর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁকে তাঁর শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। সেখানে তাঁর কিছু বেতন নির্দিষ্ট ছিল। তিনি তা গ্রহণ না করে প্রচারভাণ্ডারে দান করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বিষয়কর্ম ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু রীতি অনুযায়ী প্রচারব্রতও গ্রহণ করেননি। সুতরাং অপর প্রচারকদের জীবনযাপনের ব্যবস্থা আর তাঁর জীবনযাপনের ব্যবস্থা এক ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি 'আত্ম-জীবন'এ বলেন,

> "সাধারণ প্রচারকদিগের জীবিকা প্রচার ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করে। অনেকে প্রচার ভাণ্ডারের উপর নির্ভর না করিয়া বিধিবহির্ভূতভাবে নিজে অর্থোপার্জ্জন ও অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। সাধারণের দান ও প্রচারকদিগের শ্রমার্জ্জিত অর্থে প্রচার ভাণ্ডার। সেই ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়। তিনি প্রচারক পরিবারের ঈশ্বর-নিয়োজিত অভিভাবক ও প্রতিপালক। যাঁহারা বিষয় কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রণীত পুস্তকাদিতে ও তাঁহাদের অন্যান্য কার্য্যে অর্থাগম হইলে সেই অর্থে তাঁহাদের নিজের কোন অধিকার নাই, উহা প্রচার ভাণ্ডারের সম্পত্তি, তাঁহারা সপরিবারে বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিবেন, প্রচার ভাণ্ডারের সাহায্যে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে, ইহাই প্রকৃত ব্যবস্থা। প্রেরিতদিগের প্রতিবিধিনামক পুস্তকে ইহা সবিশেষ বিবৃত।"[৭২]

স্বাভাবিক কারণেই তিনি আর্থিক দুরস্থায় পড়েন। অর্থ সমাগমের অন্য উপায় না দেখে তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির স্মরণাপন্ন হন। পিতার সম্পত্তির যে অংশ তাঁর রয়েছে, তিনি সেখান থেকে সাধারণভাবে বেঁচে থাকার উপজীবিকা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র রায়কে জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী কিছু অর্থ প্রতিমাসে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর দাদা অর্থ প্রদানে অসম্মতি জানান এবং প্রয়োজনবোধে গিরিশচন্দ্রকে বাড়িতে এসে বাস করতে বলেন। বিদেশে তাঁর জন্য অর্থ পাঠানো সম্ভব নয় বলে তিনি মত দিয়েছিলেন। এরূপ উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলিষ্ঠভাবে বলেছিলেন সম্পত্তিতে তাঁরও স্বত্ব আছে, সুতরাং সে আয় হতে তাঁর অন্ন বস্ত্রের জন্য প্রতিমাসে কিছু টাকা যেন পাঠানো হয়। তাঁর জোরালো দাবিতে এবং এ বিষয়ে তাঁর মা সম্মতি প্রকাশ করাতে তাঁর বড়দাদা ঈশ্বরচন্দ্র বাধ্য হয়েছিলেন প্রতি মাসে ৭ টাকা পাঠাতে। গিরিশচন্দ্রের যেহেতু বিষয় সম্পত্তি আছে, পৈতৃক সম্পত্তির আয় দ্বারা তাঁর জীবিকা নির্বাহ

করা সম্ভব, সেহেতু তিনি সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন প্রচারব্রত গ্রহণ করলেও তিনি প্রচার ভাণ্ডারের অর্থ সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করবেন না এবং জীবিকার জন্য অর্থোপার্জনও করবেন না। প্রচারকরূপে গৃহীত হওয়ার পর তিনি আচার্য কেশবচন্দ্রকে তাঁর ইচ্ছের কথা জ্ঞাপন করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করা আচার্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা প্রচারভাণ্ডারের নিয়ম বর্হিভূত। আচার্য বলেছিলেন, এ বিষয়ে সাধারণ নিয়মের অধিভুক্ত থাকতে হবে। পৈতৃক সম্পত্তি হতে যে অর্থ আনীত হবে, তা ভাণ্ডারীর ব্যবস্থামতে ব্যয়িত হবে, নিজের অভিমতানুসারে নয়। তাহলে প্রেরিত জীবনে অর্থসম্বন্ধীয় নীতি প্রতিপালিত হবে।[৭৩] আচার্যের অভিমতানুসারে তিনি প্রতি মাসে ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ কান্তিচন্দ্র মিত্রের হাতে সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত ৭ টাকা অর্পণ করতেন। কান্তিচন্দ্র ছয় টাকা ভাণ্ডারে অর্পণ করে এক টাকা গিরিশচন্দ্রের ক্ষুদ্র ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁর কাছে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ছয় টাকায় তাঁর খাদ্য, বাড়িভাড়া, চাকরের বেতন ইত্যাদি চালানো হতো। আর অবশিষ্ট এক টাকায় কাপড় কেনা, ধোপার খরচ প্রভৃতি চালানোর পর জলখাবার কেনার সঙ্গতিও তাঁর থাকত না। অত্যন্ত সামান্যভাবে কৃচ্ছতায় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তবে প্রচারকার্যোপলক্ষে প্রায়ই তাঁকে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ বিশেষ বন্ধুর-আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করে সেখানে অবস্থান করতে হতো, তাতে তাঁর খোরাকি খরচ কিছু বেঁচে যেত। এতে কিছুটা অর্থের সঞ্চয় হতো। এ অর্থ দ্বারা তিনি কখনো কখনো পাথেয়ের অভাব পূরণ করতেন। গিরিশচন্দ্রের এ কষ্ট সহিষ্ণু জীবনযাত্রার কথা চিন্তা করে মায়ের অনুরোধে তাঁর বড়দাদা তাঁর মাসিক বরাদ্দ আট টাকা করেন। তাতে তিনি প্রতিদিন এক পোয়া দুধ ও বিকেলের অর্ধপয়সার মুড়ি খাওয়ার ব্যয়টা স্বচ্ছন্দে নির্বাহ করতে পেরেছিলেন। তারপর বড়দাদার পরলোক গমন। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এসে পড়েছিল শ্রীমান ইন্দুভূষণের হাতে। ইন্দুভূষণ কয়েক বছর পরেই তাঁর জন্য মাসিক দশ টাকা পাঠাতে শুরু করেছিলেন। তাতেও তাঁর কষ্ট নিবৃত্তি হচ্ছে না ভেবে ইন্দুভূষণ প্রতি মাসে তাঁকে ১২ টাকা পাঠাতে থাকলেন। এতে তিনি প্রচার ভাণ্ডারের অধ্যক্ষের ব্যবস্থা মতে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে জীবন নির্বাহ করতে পেরেছিলেন।

এদিকে তাঁর মাতৃদেবী উত্তরাধিকারসূত্রে মাতামহ ঠাকুরের ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র স্বধর্মত্যাগী বলে তাঁকে সে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি তিনি বড় সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র রায় ও ছোট সন্তানের পুত্র ইন্দুভূষণকে উইল করে দান করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে প্রথমে কিছুই জানতেন না, পরে জানতে পেরে তাঁর ভীষণ অভিমান হয়েছিল। তিনি এমনিতেই স্ত্রী পুত্রহীন নিঃসঙ্গ মানুষ। তাঁর অর্থ বা সম্পত্তির প্রয়োজন ছিল না কিন্তু কেন এ লুকোচুরি? এ লুকোচরি তাঁকে আহত করেছিল। অভিমান নিয়ে তিনি তাঁর মাকে বলেছিলেন,"আপনি যেরূপ উইল লিখিয়া নিজের সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে; আপনি জানেন আমার অর্থের প্রয়োজন নাই, সামান্যভাবে আমার অন্ন-বস্ত্রের মাত্র প্রয়োজন। আমার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। আপনার সম্পত্তি বড়দাদা প্রভৃতি ভোগ করেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। যাহা করিয়াছেন ঠিক হইয়াছে।"[৭৪] এ কথা শুনে তাঁর মায়ের দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে ছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁর মাতৃদেবী যখন আবার তাঁর পৈতৃক জমিদারী গোবিন্দপুর পরগণার নিলাম ফাজিলী টাকার অংশস্বরূপ ছয় হাজার টাকা পেয়েছিলেন তখন তিনি কিছু টাকা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার জন্য নিজের কাছে রেখেছিলেন। আর বাকি টাকা ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের হাতে তুলে

দিয়েছিলেন। নিজের কাছের টাকা থেকে মা একশত টাকা ছোট দিদির মাধ্যমে গিরিশচন্দ্রকে দিয়েছিলেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার জন্য। গিরিশচন্দ্র প্রথমে নিতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। পরে দিদি যখন বললেন মা আদর করে দিয়েছেন এটি তোমার গ্রহণ করা উচিত, তখন তিনি টাকাটা গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু খরচ করেননি। মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এ টাকা তিনি ব্যয় করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের বড়দাদা ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর বিষয় সম্পত্তি নিয়ে জটিলতা শুরু হয়। বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বিপিনচন্দ্রের অমিতাচারী এবং বিলাসী জীবনযাত্রা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিপিনচন্দ্র নিতান্ত অমিতাচারী ও অবিবেচক ছিলেন। অবশ্য তার চারিত্রিক কোনো দোষ ছিল না। এমনকি পানাসক্তও ছিলেন না। কিন্তু ঢাকায় পাঠ্যাবস্থাতে ভোজন বিলাস ও পোশাক পরিচ্ছদাদিতে অতিরিক্ত ব্যয়-বিলাসিতা করে তার পিতাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। কাপড়ের দোকানে ও ময়রার দোকানে তাঁর অনেক টাকা ধার হয়েছিল। বহুদিনে সে টাকা তাঁর পিতা পরিশোধ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। ঋণ করতে তিনি কিছুমাত্র ভীত ও সঙ্কুচিত হতেন না। স্বাভাবিক কারণেই গিরিশচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন বিপিনচন্দ্রের হাতে সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে পরিবারের কল্যাণ, শান্তি ও সুব্যবস্থার দায়ভার গিরিশচন্দ্রের ওপর বর্তেছিল। কিন্তু তিনি চিরকালই ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী। সুতরাং তাঁর পক্ষে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব ছিল না। তিনি তাঁর পারিবারিক দায়িত্বে বিপিনচন্দ্রকে বললেন, দাদা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তিনিই ছিলেন পরিবারের কর্তা ও অভিভাবক। তোমরা সকলে তাঁর আশ্রয়ে সস্নেহে ছিলে। কিন্তু এখন তিনি পরলোকগত, এখন ভিন্নতর অবস্থা। তোমরা সহোদর চার ভাই, ইন্দুভূষণ তোমাদের খড়তুত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং তোমরা সকলে একান্নভুক্ত। অর্থ আদান-প্রদান সংক্রান্ত কাজ তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইন্দুভূষণের অমতে করবে না, এবং তার ও তোমার অন্য ভ্রাতাদের অমতে ও অজ্ঞাতসারে ঋণ করবে না। তা না হলে পৈতৃক সম্পত্তি ও পিতামহীর সম্পত্তির ওপর আঘাত পড়বে, সম্পত্তি রক্ষা করা দুরূহ হবে। ভ্রাতৃবিরোধ ও পরিবারে অশান্তি আসবে।[৭৫] গিরিশচন্দ্রের এ উপদেশে হিতে বিপরীত হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁর নামে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগপত্র লেখতে শুরু করেছিল। ইন্দুভূষণ কর্মস্থল উপলক্ষে বিভিন্ন জেলায় অবস্থান করছিল বলে বিপিনচন্দ্রের ওপরই ছিল সমস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। কিন্তু কয়েক বছরের ব্যবধানেই সম্পত্তির ভরাডুবি হয়েছিল। এত ঋণ হয়েছিল যে ঋণ পরিশোধের জন্য সম্পত্তি বিক্রি ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। সুদের ওপর বিপিনচন্দ্র এত ঋণ করেছিল যে ভাইদের সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রি করেও দেনা শোধ সম্ভব হয়নি। তিন/ চার হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করার পর তারা ভেবেছিল ঋণ দায় হতে পরিবার মুক্ত হলো। পরে জানা গেল ঋণ শেষ হয়নি আরও অনেক ঋণ রয়ে গেছে। শুধু তাই নয় প্রথমবার ঋণ শেষ হতে না হতেই কিছুকালের মধ্যে আবার ‘পূর্বববৎ ঋণ’ বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয়বারও তাঁর অন্য ভাই ঋণ পরিশোধে সহায়তা করেছিল এবং কেউ কেউ নিজেদের অংশও ছেড়ে দিয়েছিল। এ গোলযোগে গিরিশচন্দ্রের মায়ের সম্পূর্ণ সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ঋণদায়ে জর্জরিত হয়ে বিপিনচন্দ্রের মনে অশান্তি দানা বেঁধেছিল, স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল Colic Pain এ ভোগছিল এবং আহারে অরুচি হয়েছিল। বিপিনচন্দ্রের এ করুণাবস্থায় গিরিশচন্দ্র ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ মতো চললে এ দুরবস্থায় বিপিনকে পড়তে হতো না। বিপিনচন্দ্রের অমিতব্যয়িতায়

পরিবারের অন্যরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। ইন্দুভূষণ ও বিপিনের কনিষ্ঠ সতীশচন্দ্র মিতব্যয়ী ও মিতাচারী ছিলেন। তাঁরা আয় অনুযায়ী ব্যয় করতেন ও ঋণ গ্রহণে সদা সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত ছিলেন। ইন্দুভূষণের হাতে শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র তাঁর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেছিলেন। যখন বিপিনচন্দ্রের হাতে গিরিশচন্দ্রের উপজীবিকার ভার ছিল তখন 'ছয় মাসান্তে বা বৎসরান্তে' টাকা পাওয়া দুষ্কর ছিল। তা দেখে ইন্দুভূষণ দুঃখিত হয়ে নিজ হাতে গিরিশচন্দ্রের জন্য উপজীবিকা পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে টাকা প্রেরণ করেছিলেন। প্রথমে আট টাকা হতে দশ টাকা পরে দশ টাকা থেকে বার টাকা প্রতিমাসে পাঠিয়েছিলেন। এতে গিরিশচন্দ্রের জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা এসেছিল। গিরিশচন্দ্র সব সময়ই সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রাকে তিনি কখনোই সমর্থন করেননি। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে জটিলতা সৃষ্টিতে তিনি আহত হয়েছিলেন, পারিবারিক অশান্তি বিরাজে তিনি পীড়া অনুভব করেছিলেন, পরিশেষে জটিলতা নিষ্পত্তিতে স্বস্তি অনুভব করেছিলেন।

ঝ. কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিয়ে নিয়ে বিতর্ক ও গিরিশচন্দ্র সেনের ভূমিকা

কেশবচন্দ্রের বড় কন্যা সুনীতি দেবীর বিয়ে 'কোচবিহার বিবাহ' নামে খ্যাত। 'কোচবিহার বিবাহ' ছিল ব্রাহ্মধর্মের ঐতিহাসিক পালাবদলে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ বিবাহের সূচনা পর্বেই 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মধর্ম' ভাঙ্গনের করুণ রাগে অনুরণিত হয়ে উঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রাহ্মধর্মের পতন অনিবার্য হয়ে উঠে এবং সময়ের ব্যবধানে সবচেয়ে আধুনিক প্রগতিশীল ব্রাহ্মধর্ম মৃতপ্রায় ধর্মে পরিণত হয়। অবশ্য 'কোচবিহার বিবাহের' আগ থেকেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত নড়বড়ে হতে শুরু করে। "কেশবচন্দ্র ক্রমে নিজেকে 'ঈশ্বর প্রেরিত' বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রচারক দল প্রকাশ্য ভাবেই এই মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মেরা দেখিলেন যে ব্রাহ্মসমাজেও ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট করিবার জন্য আবার একটা নতুন আয়োজন হইতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা ভীত হইয়া উঠিলেন। কেশবচন্দ্র ক্রমে 'আদেশবাদ' অর্থাৎ সাধকেরা ঈশ্বরের আদেশপ্রাপ্ত হন, এবং ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া তাঁহারা সে কর্ম করেন, তাহা সর্ব্বতোভাবেই ধর্মসঙ্গত, এ বিষয়ে প্রাকৃত বিচার-বুদ্ধির সমালোচনার অধিকার নাই,– এই মতবাদও প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের প্রবৃত্তিমূলক সহজ কর্মচেষ্টাকে ধর্ম্মের নামে সঙ্কুচিত করিয়া প্রাচীন বৈরাগ্যের আদর্শও প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।"[৭৬] এটি ছিল 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মধর্মে' বিরোধের অন্যতম কারণ। সে সঙ্গে অত্যগ্রসর দলের স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী অবরোধ মোচন—পুরুষের সঙ্গে মহিলাদের প্রকাশ্য উপাসনা মন্দিরে উপবেশন, স্ত্রীশিক্ষা দান বিষয়ে মতপার্থক্য, নরপূজার অভিযোগ, ব্রাহ্মধর্মে নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৭৪ সালে ভারতাশ্রমে সংঘটিত একটি অবাঞ্চিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে পুঞ্জিভূত কালো মেঘাকারে ব্রাহ্মধর্মাকাশের ঈশান কোণে জমতে শুরু করেছিল। পরিশেষে 'কোচবিহার বিবাহে'র ঝড়ো বাতাসের প্রচণ্ড দাপটে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মধর্মের এ অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্চিত পরিণতির ইতিহাস ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে মুঙ্গের নরপূজা আন্দোলনেই প্রথম উপ্ত হয়েছিল। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'সমদর্শী' প্রকাশে সে অসন্তোষ ও প্রতিক্রিয়া আরো জোরালো হয়ে উঠে। কিন্তু এর আগে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'তিন আইন' নামক বিবাহবিধি আইন সিদ্ধ হওয়ার পর কেশব বিরুদ্ধরাও তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই বিলে অসমবর্ণ বিবাহ আইনের স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং পাত্রপাত্রীর বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ ও ১৪ বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্দিষ্ট হয়েছিল। আর এ আইনের উদ্যোক্তা ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেবশচন্দ্র সেন। তাঁরই ঐকান্তিকতা ও সক্রিয়তায় এ বিল পাশ হয়েছিল। ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাস হওয়ার পর কেশবচন্দ্র বেদীতে উপদেশ দিয়েছিলেন-"এই বিধি কেবল রাজবিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের বিধি, তাঁহার আদেশে সম্পন্ন হইয়াছে।"[৭৭] আবার স্বীয় কন্যার বিয়েতে সে বিধি লংঘন করে অপ্রাপ্তবয়স্ক পাত্রের হাতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যাকে অর্পণ করেছিলেন এবং তাকেও তিনি প্রত্যাদেশ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র কুমারী ফ্রান্সিস কোবেকে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ এপ্রিলের এক চিঠিতে লেখেছিলেন-

> "আমি জনগণের সেবার আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করেছি। অন্য সমস্ত বিবেচনা এই পবিত্র কর্তব্যের তুলনায় গৌণ। এটা ছিল ঐশ্বরিক আদেশ।

আমার বিবেক আমাকে সেই আদেশ পালন করতে বলেছিল। জীবন্ত ঈশ্বরের বিধানের কাছে অবদমিত হয়ে আশ্চর্যভাবে আমি পরাভূত হয়েছিলাম। আমি এর ফলাফল চিন্তা করতে পারিনি, কিন্তু এর সুফল সম্বন্ধে আমার সংশয় ছিল না। আমি বিস্তৃত ও যুক্তিপূর্ণ চিন্তা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে পারিনি। আমি অন্যের উপদেশও গ্রহণ করার চেষ্টা করিনি। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে প্রস্তাবিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নেওয়া হয়, কারণ পাত্র একজন স্বাধীন রাজা এবং তিনি তাঁর রাজ্যের কুপ্রথাগুলির প্রভাবে পতিত হতে পারেন। আমি বিশ্বাস করেছিলাম এবং সর্বান্তঃকরণে আশা করেছিলাম যে, ঈশ্বর আমার, আমার কন্যার এবং স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যা করণীয় তাই করবেন। বর্তমান কর্তব্যটি আমার করণীয় ভবিষ্যৎ ফলাফল ঈশ্বরের হাতে।”[৭৮]

মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে ঈশ্বর একই বিষয়ে পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটি প্রত্যাদেশ পাঠালেন– একটি ভারতবর্ষে অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাত্রপাত্রীর বিয়েতে অসম্মতি জ্ঞাপন, অন্যটি কেশবচন্দ্রের অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যার রাজবধূ হওয়াতে সমর্থন প্রদান। আজকের যুগের যে কোনো সচেতন নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রই কেশবচন্দ্রের পরস্পর বিরোধপূর্ণ মতবাদ প্রচারে অযৌক্তিক আত্মশ্লাঘা খুঁজে পাবেন। এটি কি আত্মসমর্থনে ঈশ্বরের ওপর আরোপিত কেশব মনোভাবের পরিবর্তন মাত্র নয়! এ বিষয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রতিবাদ পত্রে বলেন, “পাপ-কার্য্যকে ঈশ্বরের আদেশ বলিলে যেরূপ ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি অপ্রেমও প্রকাশিত হয়। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি কি নিজের দোষ উপাস্য-দেবতার উপর স্থাপন করিতে পারেন? কখনই না।”[৭৯]

‘কোচবিহার বিবাহ’কে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ‘পাপকার্য্য’ বলে অভিহিত করেছিলেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসে পাপপুণ্যের মীমাংসা আমাদের বিচার্য নয়। তবে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই একটি সত্যনিষ্ঠ অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধিময় হয়ে ওঠে যে, ‘কোচবিহার বিবাহে’র প্রত্যাদেশ ছিল বিচক্ষণতাহীন আত্মবিধ্বংসী সিদ্ধান্ত। কেননা সে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজে শুরু হয়েছিল প্রবল আন্দোলন আর কেশবচন্দ্র হয়ে পড়েছিলেন ব্রিটিশরাজ ও কোচবিহার রাজপরিবারের ইতিহাস ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের শিকার। অপমান ও প্রতারণার কঠিন পাষাণে কেশবচন্দ্রের আত্মা মাথা ঠুকেছিল কিন্তু মুক্তি ছিল অসম্ভব, সুদূর পরাহত।

‘কোচবিহার বিবাহ’ আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। রীতিমত ঘটকালী করে বিয়ে। কেশবচন্দ্র অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে ভেবেচিন্তে নিয়েছিলেন নিয়তি নির্ভর এক অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত। পাত্রী নির্বাচন, কেশচন্দ্রের মত আদায়ে কৌশলী পদক্ষেপ, পাত্র-পাত্রীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা, বিয়েতে করণীয় শর্ত আরোপ, আবার বিয়ের আসরে সচেতন মনোভাবে নিষ্ক্রিয়তার ভান ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে ইংরেজ সরকার অত্যন্ত ধূর্ততার পরিচয় দিয়েছিল। আর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কেশবচন্দ্র কূটকৌশলী ইংরেজদের হটকারী চক্রান্তে সম্ভবত অনেকটা আত্মসম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং নিজের ও ব্রাহ্মধর্মের জন্য ধ্বংসাত্মক ভয়াবহতা বয়ে এনেছিলেন।

সময়টা ছিল ১৮৭৮ সাল। 'কোচবিহার বিবাহ' নিয়ে সরকারি বেসরকারি, ব্রাহ্ম ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তুমুল আলোচনার ঝড় উঠেছিল। বিষয়টা ছিল কোচবিহার রাজার সঙ্গে সর্বত্যাগী ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের বড় মেয়ে–সুনীতি দেবীর বিয়ে। আর এ বিয়ের দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং ইংরেজ সরকার। উনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে কোচবিহার রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন নাবালক রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ। কোচবিহার রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সাথে কোচবিহার রাজের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং কোচবিহার ইংরেজদের অধীনতা স্বীকার করেছিল। কাজেই ইংরেজ সরকার কোচবিহার রাজ্যের এজেন্ট স্বরূপ ছিলেন।[৮০] সুতরাং নৃপেন্দ্র নারায়ণের তত্ত্বাবধায়ক হয়েছিলেন ইংরেজ সরকার। যুবরাজকে আদর্শ ন্যায়-পরায়ণ, প্রগতিশীল শাসক ও মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব ইংরেজদের কাঁধে অর্পিত হয়েছিল। অর্পিত দায়িত্ব তাঁরা পালন করেছিলেন সুচারুরূপে। যুবরাজের দেশীয় শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছিল। উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁকে ইংল্যান্ডে পাঠানোর আয়োজন চলছিল কিন্তু রাজমাতা তাতে সম্মত হলেন না। তিনি রাজকুমারের বিলাত যাত্রায় বাধ সাধলেন। অনুন্নত কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোচবিহারের রাজমাতা স্বভাবতই ভেবেছিলেন নাবালক ছেলে কালাপানি পার হলে ম্লেচ্ছ হয়ে যাবে, অজাত কুজাতের সঙ্গে মিশবে, নিষিদ্ধ মদ্য মাংস খাবে, আর মেমসাহেব বিয়ে করবে। সে সময়ে বিলাতযাত্রা সম্পর্কে এমনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত ধারণায় পূর্ণ ছিল বাঙালি মানসিকতা। শুধু তাই নয়, কালাপানির নদী পার হলে জাত যাওয়ার কুসংস্কার পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কেউ যদি বিলাতে যেত সে সমাজ তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করত। স্বভাবতই নাবালক পুত্রের রাজমাতা সচেতনভাবেই এ বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন । ইংরেজ সরকার রাজমাতাকে বুঝালেন যুবরাজ কিছুদিনের জন্য ইংল্যান্ডে যাচ্ছেন চিরদিনের জন্য নয়, আর এতে কোচবিহারের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। "...While giving him the benefit of an English education, we should take every pains to train and prepare him for the duties he would hereafter have to discharge as the head of a state."[৮১] কিন্তু রাজমাতা কিছুতেই রাজি হলেন না। পরিশেষে যুবরাজকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করে বিলাত গমনের অনুমতি প্রদানে মত প্রকাশ করেছিলেন। মহাসমারোহে শুরু হয়েছিল পাত্রীর সন্ধান। কোচবিহার ছিল উনিশ শতকের আলোকবঞ্চিত পশ্চাৎপদ এবং আদিবাসী সুলভ কুপ্রথা ও কুসংস্কারে পূর্ণ একটি রাজ্য। এ রাজ্যকে জাগাতে হলে এবং আধুনিকতার উন্মুক্ত দ্বার প্রসারিত করতে হলে যুবরাজের পাশাপাশি রাজবধূকেও হতে হবে সুশিক্ষিত, পরিশীলিতবোধ ও মার্জিত রুচির অধিকারী। যোগ্যপাত্রীর সন্ধানে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ইংরেজ সরকারের দূত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যাদব বাবু বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে প্রথমে গেলেন দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের কাছে "তাঁহার পত্নী ব্রহ্মময়ী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "না না, আমার মেয়েরে রাজারাজড়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে না। প্রথমত' ছেলে অপ্রাপ্তবয়স্ক; তারপর রাজারাজড়ার সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাল নয়, আমার ছেলেমেয়েরা রাণী বোনের সঙ্গে ভাল ক'রে মিশ্‌তে পারবে না।"[৮২] শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মজীবন'-এর পাদটীকার তথ্যানুযায়ী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হয় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং বিয়ের প্রস্তাব ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই এসে থাকবে।[৮৩] আর কেশবচন্দ্রের কন্যা সুনীতি দেবীর বিয়ের পাকা কথাবার্তা চলতে থাকে ১৮৭৮ সালের

জানুয়ারির প্রারম্ভ থেকে। সুতরাং কেশবচন্দ্রের কাছে যাদব বাবুর কোচবিহার যুবরাজের সঙ্গে সুনীতির বিয়ের প্রথম প্রস্তাব দেওয়ার সময়টা ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর হওয়াই সঙ্গত। প্রথমবার এ বিয়ের প্রস্তাবে কেশবচন্দ্র তো বজ্রাহত। এখনই মেয়ের বিয়ের কথা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেননি। মেয়ের বয়স সবে সাড়ে তের। কেশবচন্দ্র প্রণীত আইন অনুযায়ী ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক। আবার অন্য দিকে পাত্রও ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক। তার বয়স সবে ষোল। সুতরাং এ বিয়ের প্রস্তাব ছিল একেবারেই অবাঞ্ছিত। তিনি বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। তাঁরা বার বার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য কেশবচন্দ্রের দরজায় কড়া নাড়তে থাকলেন। এ প্রসঙ্গে মহারাণী সুনীতি দেবী তাঁর Autobiography of an Indian princess গ্রন্থে বলেন- “When the marriage was first suggested my father was surprised. He never gave a thought of worldly family affairs: his mind was too full of his religious work, and he refused the offer. But, the government and the representative of the state would not be discouraged. They continued writing to my father, interviewing him and sending messages urging that the marriage of the young prince and myself was most desirable. My father repeatedly refused. In one of his letters he said that I was neither very pretty nor highly educated, and therefore, I was not a suitable bride for the young Maharaga.”[84]

১৮৭৮ সালে জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে আবার প্রস্তাব আসে। এবার ইংরেজরা কেশবচন্দ্রকে আবেগী প্রতারণার ফাঁদে ফেলেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালেন যে, কেশব তো একজন সমাজসেবক, ধর্ম সংস্কারক। সুতরাং কোচবিহারের মতো একটি অনুন্নত, উপজাতি প্রধান, কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাজ্যের মানুষের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো পৌঁছে দেবার তাঁরও কিছু দায়িত্ব আছে। কেশবচন্দ্রের মতো সরল, উদারপ্রাণ, মহৎচিত্ত মানুষ সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কারের দায়বদ্ধতা সম্ভবত অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি ঈশ্বর নিবিষ্ট প্রাণ। মানুষের কল্যাণকর আত্মমুক্তির মধ্যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন আর সে মঙ্গলময় অবিনাশী সুষুপ্ত ইচ্ছায় যেন ঈশ্বরের অমোঘ নির্দেশ পেয়েছিলেন। তখনই তিনি স্বীয় আদরের কন্যাকে ঈশ্বরের পদতলে উৎসর্গ করলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না তাঁর মহৎ, সত্য, সুন্দর প্রেরণার বিপরীতে লুকিয়েছিল ইংরেজদের ঘৃণ্যতম চালাকি। মাঘোৎসবের ব্যস্ততার মধ্যে বিয়ের কথাবার্তা এগোচ্ছিল। কিছু শর্ত জুড়ে দিয়ে তিনি বিয়েতে সম্মত হলেন।

“প্রথমত, এখন বিবাহ অনুষ্ঠান হবে না। এখন শুধু বাগদানই হবে। মহারাজা বিদেশ থেকে ফিরে এলে তাঁরা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হবেন তখন প্রকৃত বিবাহ হবে। এখন শুধু প্রথাবদ্ধ বাগদান অনুষ্ঠান হবে।

দ্বিতীয়ত, এই অনুষ্ঠানে কোনো পৌত্তলিক ধর্মাচরণ হবে না। বিয়ে ব্রাহ্ম মতানুসারে হবে।

তৃতীয়ত, তিনি নিজে কন্যাকে সম্প্রদান করবেন না– তাঁর কোনো আত্মীয়–মেয়ের কাকা তাকে সম্প্রদান করবে।

চতুর্থত, মহারাজকে একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তিনি ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী।”[৮৫]

কেশবচন্দ্রের শর্তগুলি মেনে নিয়ে কোচবিহার ডেপুটি কমিশনার দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন। এদিকে কেশবচন্দ্র বিয়েতে মত দেয়ার পর পরই ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। ব্রাহ্মদের কাছে এ বিয়ে ছিল অপ্রত্যাশিত। শ্রীনাথচন্দ তাঁর 'ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর' গ্রন্থে বলেন, "ব্রাহ্মসমাজে যিনি সামাজিক সংস্কারের প্রবর্ত্তক, তিনি বাল্যবিবাহ প্রদান করিবেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই। আর এক কারণে উহা আমাদের কাছে ভাল লাগে নাই; কুচবিহারের রাজকুমার বা রাজপরিবার ব্রাহ্ম নহেন, কুচবিহারের অনেক অবস্থা আমাদের পরিজ্ঞাত ছিল, আমাদের আচার্য্য-কন্যা ওরূপ স্থলে পরিণীতা হইলে ব্রাহ্মসমাজের মান হানি হয়, আদর্শ হীন হয়।"[৮৬] তথাপি মান এবং আদর্শকে খর্ব করে কেশবচন্দ্র 'কোচবিহার বিবাহে' সম্মতি জ্ঞাপন করেন। 'কোচবিহার বিবাহে' ব্রাহ্মদের পক্ষ থেকে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় তিনটি অভিযোগ-

> "(১) পাত্রপাত্রী অপ্রাপ্ত বয়স্ক সুতরাং ইহা বাল্য বিবাহ দোষে দূষিত; ২) কেশববাবু স্বয়ং যে বিবাহ আইনের প্রবর্ত্তক, যাহাকে তিনি ঈশ্বরাদেশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, এই বিবাহে সেই আইনের মূলভাব (Principle) নষ্ট হইল, (৩) রাজকুমার বা রাজপরিবার ব্রাহ্ম নহেন এরূপ স্থলে ব্রাহ্মসমাজের নেতার কন্যা পরিণীতা হইলে ব্রাহ্ম সমাজের অপমান ও আদর্শ খর্ব্ব হইবে।"[৮৭]

শুধু তাই নয়, কেশব বিরুদ্ধরা তাঁর কাছে লিখিত প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। মোট তেইশ জন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম সে প্রতিবাদ পত্রে স্বাক্ষর করেন। সমদর্শী দল, স্ত্রী স্বাধীনতার দল, নিয়মতন্ত্রের দল এমনকি বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ও 'কোচবিহার বিবাহের' বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র কোনো বিরুদ্ধ মনোভাবকেই তোয়াক্কা করলেন না, এমনকি কারো সঙ্গে এ নিয়ে বুঝাপড়ার চেষ্টাও করলেন না। বরং 'কোচবিহার বিবাহের' সিদ্ধান্তকে ঈশ্বরাদেশ বলে প্রচার করলেন। অবশেষে সে প্রেক্ষিতে ২৫ ফেব্রুয়ারি কন্যার ডুলি কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। সঙ্গে গিয়েছিলেন কেশবচন্দ্রের বন্ধু-বান্ধব, পুরোহিত গৌরগোবিন্দ রায়, কনের মা-দিদিমা, মিস পিগট, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, প্রসন্নকুমার সেন, গিরিশচন্দ্র সেন ও আরো নিকট আত্মীয় স্বজন। কোচবিহারে নেমে তাঁরা আথিত্যের উষ্ণ অভ্যর্থনা থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁরা রাজচক্রান্তের অশুভ চক্রে বাঁধা পড়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার আর রাজ পরিবার যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কার্যে পরিণত হয়নি। ব্রিটিশ সরকারের কোনো কর্তা ব্যক্তি কিংবা কর্মচারীকে আশেপাশে দেখা গেল না আর কোচবিহার রাজকুল সেদিন দেখিয়েছিল প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গার অদম্য স্বেচ্ছাচারিতা। ৪মার্চ কোচবিহারের রাজপুরোহিত ও আরো কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি এসে কেশবচন্দ্রের কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করেছিলেন—

> "(১) বিবাহের আসরে কেশবচন্দ্র উপস্থিত থাকতে পারবে না। (২) কোনো অব্রাহ্মণ কিংবা পৈতে পরিত্যাগী ব্রাহ্ম বিয়ে দিতে পারবে না। (৩) জনসমক্ষে কোনো ঈশ্বর উপাসনা ও প্রার্থনা করা যাবে না। (৪) বর-কনে বিয়ের আসরে কোনো অঙ্গীকার বাক্য উচ্চারণ করতে পারবে না। (৫) বরের পক্ষ থেকে ও কনের পক্ষ থেকে উভয় পক্ষ থেকে যজ্ঞ করতে হবে।"[৮৮]

কেশবচন্দ্র এ প্রস্তাবের কোনোটিই মেনে নিতে পারেননি। তিনি তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হলেন। তিনি বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চাইলেন কিন্তু সেটি ছিল অসম্ভব। একদিকে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গা, ব্রিটিশ সরকারের নীরব ভূমিকা, রাজপরিবারের হিন্দু ধর্ম মতে বিয়ের আয়োজন, অন্যদিকে পত্র-পত্রিকায় দুর্নাম রটনা ও ব্রাহ্মবন্ধুদের তীব্র বিরোধিতা– সব মিলিয়ে তীব্র মানসিক সংকটে কেশবচন্দ্র নির্বাক হয়ে গেলেন। পরিশেষে ঘটনা পরম্পরার টানাপোড়নে ৬মার্চ সুনীতি দেবীর বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। কেশবচন্দ্র কন্যা সম্প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন এবং অপমানিত হয়ে ছাদনাতলার সভাস্থলে প্রবেশাধিকার পর্যন্ত হারালেন। দূরে একটি স্থানে তাঁর উপবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল।[৮৯] রাজবাড়ির ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ হিন্দুয়ানি আনুষ্ঠানিকতা ও লোকাচার পালন করেছিলেন। ব্রাহ্মোপাসনার সাড়াশব্দটিও সেখানে ছিল না, এমন কি ব্রাহ্ম আচার্যের বড় কন্যার বিয়েতে ব্রহ্ম নামোচ্চারণও হলো না। আগুন জ্বেলে হোম করা হয়েছিল, সভাস্থলে হর-পার্বতীর দুটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। হিন্দুধর্মানুগামী পৌত্তলিক পদ্ধতি অনুসারে বিয়ের কার্যপ্রণালী শেষ হয়েছিল, সেখানে ব্রাহ্মবিবাহপদ্ধতির কোনো স্থান ছিল না। পৌত্তলিকতা-বিরোধী অনুষ্ঠানের জন্য যে ব্রাহ্মসমাজ সারা বিশ্বে সমাদৃত ছিল, এ বিয়েতে পৌত্তলিকতা আরোপিত হওয়ায় সারা বিশ্বের সম্মুখে সে ব্রাহ্ম সমাজই হেয় হয়ে গিয়েছিল।[৯০] ব্রিটিশ সরকারের প্রতারণা আর কোচবিহার রাজপরিবারের অপমানে বিষাদগ্রস্ত, অবসন্ন কেশবচন্দ্র ১৮মার্চ কলকাতায় ফিরে আসেন। 'কোচবিহার বিবাহে' কেশবচন্দ্র বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ঈশ্বরাদেশের নামে 'কোচবিহার বিবাহে'র যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, তা ছিল অভিজ্ঞ সমাজ সংস্কারকের অনভিজ্ঞ রাজভক্তির অনভিপ্রেত অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন 'কোচবিহার বিবাহে'র একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বিবাহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ছিল তাঁর বিচরণ। "এই উদ্বাহ নিবন্ধন ব্যাপারে আমি সর্ব্বতোভাবে যোগদান করিয়াছিলাম, সকল ঘটনার সঙ্গে জড়িত হইয়াছিলাম।"[৯১] গিরিশচন্দ্র ছিলেন কেশবচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত। ভক্তিরঞ্জন দৃষ্টিতে তিনি তাঁর পূজা করতেন। আচার্য রূপে তাঁকে দেবতার আশীর্বাদ পুষ্ট মনে করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল ঈশ্বরাদেশ আচার্যের মাধ্যমে সংসারের কল্যাণে লিপিবদ্ধ হবে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ, যুক্তিনিষ্ঠ, মুক্ত, উদার মানসভঙ্গি ছিল তাঁর আয়ত্তের বাইরের বস্তু। সুতরাং পূর্বাপর ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ, যুক্তি-তর্ক তাঁর অবিচল বিশ্বাসকে টলাতে পারেনি। অত্যগ্রসর ব্রাহ্মরা যখন স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠিতে কেশবচন্দ্রের প্রতিটি কাজের যথার্থতা নিরূপণ করছিলেন, গিরিশচন্দ্র তখন ভক্তির অন্ধত্বে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন অকপটে। শুধু তাই নয়– উগ্রবাদী বিশ্বাসে তিনি অত্যগ্রসর দলের বিরুদ্ধে লেখনিও চালনা করেছিলেন। 'কোচবিহার বিবাহ'কে কেন্দ্র করে যে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাকে তিনি "ধর্ম্মের সঙ্গে সংসারের, প্রত্যাদেশের সঙ্গে মানবীয় বুদ্ধির, বিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্বাসের সংগ্রাম"[৯২] বলেছেন। 'কোচবিহার বিবাহকে' সমর্থন করে তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন'-এ লেখেন,

> "কুচবিহার বিবাহের বহু বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্যের বিরুদ্ধে বিবাদানল প্রধূমিত হইতেছিল। সেই সময় প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশ পাইবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। আচার্য্যের নিকটে ধর্ম্মগ্রহণ এবং ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছেন তাঁহার এরূপ কতিপয় অনুগামী নিজেদের স্বার্থসাধনে

> বাধা পাইয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন, এবং তাঁহাকে লোকের নিকটে অবিশ্বস্ত, অশ্রদ্ধেয় এবং অপদস্থ করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র দলে বদ্ধ হইয়া নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করেন, পত্রিকা বিশেষ প্রচার করিয়া তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনাদির বিরুদ্ধে নানা কথা ঘোষণা করিতে থাকেন, এবং অন্যান্য উপায়ে তাঁহার ও তাঁহার অনুগত বিশ্বাসী দলের অপবাদ রটনা করেন। তাহাতে তাঁহারা কিছুতেই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির অনেক সুযোগ ও সুবিধা হয়।"[৯৩]

যুক্তিনিষ্ঠ, বুদ্ধিনির্ভর প্রগতিশীল চেতনা নয়, 'কোচবিহার বিবাহ' সম্পর্কে একান্তই একদেশদর্শী মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 'আত্ম-জীবন'এর বর্ণনায়। 'কোচবিহার বিবাহে'র সময় গিরিশচন্দ্র কেশবচন্দ্র সেনের একান্ত সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। প্রতিবাদ আন্দোলনের সব চিঠি তাঁরই হস্তগত হতো এবং সব প্রতিবাদ পত্র পড়বার ভার তাঁর ওপরই অর্পিত ছিল। আচার্য তাঁকে বলেছিলেন, কোন আঞ্চলিক ব্রাহ্মসমাজ বা কোন ব্রাহ্ম যদি 'কোচবিহার বিবাহের' প্রতিবাদ না করে কীভাবে বিয়ে হবে এটি জিজ্ঞাসা করে পত্র লেখে তাহলে তাঁকে যেন পড়তে দেয়া হয়, তিনি অবশ্যই সে পত্রের উত্তর দিবেন। যারা তাঁর কাছে কিছুই জানতে চায়নি অথচ প্রতিবাদ করেছে তাঁর মতে তাঁদের বিচার নিষ্পত্তি গেছে, তিনি সে পত্র পড়বেন না। কেননা তাঁদের উদ্দেশ্যে তাঁর কিছুই বলার নেই। তিনি বলেন, তিনি প্রত্যাদিষ্ট হয়ে কন্যার বিয়ে স্থির করেছেন, যে সব পত্রে সে প্রত্যাদেশের প্রতিবাদ রয়েছে তা পড়াকে তিনি পাপ মনে করেন।

গিরিশচন্দ্রের হাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হতে বহু পত্র এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু তাঁর মতে সব পত্রে প্রতিবাদ, বিচার নিষ্পত্তি এবং দণ্ডাজ্ঞা ছিল। একটি পত্রেও জিজ্ঞাসা ছিল না। তাঁর কাছে আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, বিচারক একজন দস্যুকে পর্যন্ত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করার আগে তার আত্ম সমর্থনে কিছু বলার সম্মতি দেন। কিন্তু 'কোচবিহার বিবাহে'র প্রতিবাদকারীগণ বিচারাসনে বসে আচাযের্র বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর আত্ম সমর্থনে কিছু বলার আছে কিনা জিজ্ঞাসাও করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি যিশু খ্রিস্টের উদাহরণ টেনে বলেন–যুডাস স্কেরিয়ট সামান্য অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতা করে আপন গুরু যিশুখ্রিস্টকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পরে তিনি অনুতাপ করে আত্মহত্যা করেছিলেন। ফিরুসীগণ যিশুদেবকে বিচারের জন্য বিচারকের হাতে অর্পণ করেছিলেন। এবং তাঁর প্রতি নানারূপ মিথ্যা দোষারোপ করে তাঁকে কঠোর শাস্তি প্রদান করার জন্য বিচারপতি পাইলটকে অনুরোধ করেছিলেন। বিচারপতি নিয়মমাফিক বিচার করেছিলেন এবং যিশুর মুখে আত্মবৃত্তান্ত শুনে তাঁকে নির্দোষ মনে করেছিলেন। কিন্তু প্রবল ফিরুসীদের ভয়ে, তাঁদের দৃঢ় অনুরোধে বাধ্য হয়ে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মতে, আচার্য বিরোধিরা ফিরুসীদের নীতিও অবলম্বন করলেন না। নিজেরাই একতরফাভাবে আচার্যের বিচার করেছিলেন। অথচ 'কোচবিহার বিবাহের' ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকজন প্রধান সভ্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তা সুনজরে দেখেননি– শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিত'-এ প্রসঙ্গে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন-

"আমরা স্থির করিলাম যে, এই সঙ্কটে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত সত্যসকলকে জোর করিয়া ধরা আমাদের কর্তব্য এবং তাহা করিবার জন্য কেশববাবুর কার্যের প্রতিবাদ করা কর্তব্য। যে কেশববাবু মহা-আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বর কন্যার বিবাহের বয়স নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন তিনিই তাহা ভাঙ্গিতে যাইতেছেন, ইহা কেমন কথা? সুতরাং এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত কার্যপ্রণালী রক্ষা করিবার জন্য জোড়ে দাঁড়ানো কর্তব্য, কিন্তু তৎপূর্বে বন্ধুভাবে একবার কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুমুদয় কথা তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিবার চেষ্টা করা উচিত। তদনুসারে ২রা ফেব্রুয়ারি আমরা তিনবন্ধু মিলিয়া কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। যাইবার দিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। তিনি বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না ; বলিলেন, "আমি সবে বোম্বাই হইতে আসিয়াছি, আমি কোনও সংবাদ জানি না। তোমরা কেশব বাবুর কাছে যাও, আমিও পশ্চাতে আসিতেছি।" আমরা গিয়া কেশব বাবুর সহিত কথা কহিতেছে, তিনিও আসিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। কেশববাবু কোনও মতেই বিশেষ সংবাদ দিতে চাহিলেন না; বলিলেন, "এখন কোনও সংবাদ দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "এই সংবাদে ব্রাহ্মদের মন অতিশয় উত্তেজিত; আপনার উচিত, আমাদিগকে সকল সংবাদ দেওয়া। লোকে ত' আপনার নিকট আসে না, আমাদিগকেই পথে, ঘাটে ধরে, আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে। আমরা উত্তর দিতে পারি, লোককে শান্ত করিতে পারি, এমন সংবাদ আমাদের কাছে থাকা আবশ্যক।" তিনি কোনক্রমেই কিছু বলিলেন না। অবশেষে আমি বলিলাম, আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, আপনারা,"খাস্তগির মহাশয়ের কন্যার বিবাহে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ রক্ষা হয় নাই বলিয়া তাঁহাকে কিরূপ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন তাহা মনে আছে। তাঁহার ঘাড়ের মাংস ছিঁড়িয়া খাইয়াছিলেন; আপনার কন্যার বিবাহে ব্রাহ্মদের অবলম্বিত কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ব্রাহ্মেরা ছাড়িবে না।" যেই এই কথা বলা, অমনি কেশববাবু বিরক্ত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া টেবিলের উপর উঠিয়া বসিলেন, কাঁধে একখানা গামছা ছিল, তাহা মাথায় বাঁধিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আমারও ঘাড়ের মাংস ছিঁড়ে খাবে, তার আর কি?" আমি পূর্বে কখনও তাঁহাকে এত উত্তেজিত দেখি নাই। দেখিয়া মনে হইল, আর তাঁহাকে বিরক্ত করা উচিত নয়। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "আপনি বিরক্ত হইতেছেন, তবে এ কথা থাক।" এই বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।"[৯৪]

সুতরাং কেউ তাঁর কাছে 'কোচবিহার বিবাহ' সম্পর্কে কিছু জানতে চায়নি এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের সুযোগ আছে। সাধারণত কোন বিষয়ে মন্তব্য করার আগে সে বিষয়ে জানার আগ্রহ মানুষের স্বভাবজাত। তবুও ধরে নিলাম সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ হুজুগে মাতাল হতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মরা ছিলেন সে যুগের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি। তাঁরা কোনো বিষয় সম্পর্কে না জেনে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাবেন তা একান্তই অবান্তর। প্রচণ্ড বাক বিতণ্ডা, বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে 'কোচবিহার বিবাহের' প্রস্তুতি এগিয়ে চলছিল। কেশবচন্দ্র কারো

আপত্তিতে দমবার পাত্র ছিলেন না। এ বিয়ের প্রতিবাদ সম্বলিত ৫০ টি লিপি এসেছিল কেশবচন্দ্রের কাছে। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ থেকেও একটি প্রতিবাদী লিপি গিয়েছিল কেশবচন্দ্রের কাছে। এ লিপি সম্পর্কে শ্রীনাথচন্দ বলেন- "আমরা ব্রাহ্মসমাজের গৌরব রক্ষার জন্যই একান্ত কর্ত্তব্যবোধে উহাতে স্বাক্ষর করিলাম; তখনও মনে আশা ছিল, যিনি ব্রাহ্মদিগকে স্বাধীন বিবেকবুদ্ধিতে পরিচালিত হইতে চিরদিন যত্ন করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন, হয় ত তাঁহার নিকট আমাদের এই সঙ্গত প্রার্থনা একেবারে অগ্রাহ্য হইবে না।"[৯৫] কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, উদার ও মুক্তচিন্তার ধারক, ধৈর্য ও ধীরতার অধিকারী কেশবচন্দ্র হঠাৎই যেন বদলে যাওয়া হাওয়ায় পাল তুলেছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে। 'কোচবিহার বিবাহে'র প্রত্যাদেশ পেয়ে পুরানো সব স্মৃতি যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল। প্রত্যাদেশের প্রতি তীব্র বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছিলেন। আর গিরিশচন্দ্র ছিলেন তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। কেশবচন্দ্র আর তাঁর প্রত্যাদেশের প্রতি গিরিশচন্দ্রের ছিল অগাধ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তাই যারা কেশবচন্দ্রকে পতিত করেছিল, অপমান করেছিল, লোকের কাছে ঘৃণিত অশ্রদ্ধাভাজন করেছিল–ধর্মবিষয়ে তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নেয়া ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এই বিষয়ে নিকটাত্মীয়দের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়ন চলেছিল। পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে বিরোধীদলের ব্রাহ্ম উপস্থিত থাকলে সেখানে তিনি যেতেন না। বাকুড়া শহরে ভূতপূর্ব সেশন জজ শ্রী কেদারনাথ রায় মহাশয়ের বড় কন্যার বিয়েতে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় পৌরহিত্য করবেন জানতে পেরেও তিনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহযাত্রী হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁকে জানানো হয়েছিল বিয়ে নববিধান পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হবে আর আচার্যের দায়িত্বে থাকবেন মজুমদার মহাশয়। কিন্তু কার্যত যখন দেখা গেল শিবনাথ শাস্ত্রী পাত্র-পাত্রীকে উপদেশ দান করেছিলেন, তখন তিনি বিবাহ আসর ছেড়ে চলে এসেছিলেন। এতে শাস্ত্রীপন্থীরা বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তা আমলে নেননি।

তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় বিরোধীমণ্ডলীভুক্ত স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের কন্যা, ভাই এবং বোনদের বিয়েতে তিনি নিমন্ত্রিত ও অনুরুদ্ধ হয়েও যোগাদান করেননি। একবার মাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছিল। কৃষ্ণগোবিন্দের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতি সরযুবালার বিয়েতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল তাঁর বোঝার ভুল। তিনি স্থির করেছিলেন বিবাহ অনুষ্ঠানের আগে কিংবা পরে গিয়ে পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ করে আসবেন। কিন্তু বিয়ের দিন সকালবেলা কন্যাকর্তার দৃঢ় অনুরোধ নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের এক উচ্চ পদস্থ আত্মীয়। সে আত্মীয় তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল আচার্যের এবং উমেশচন্দ্র দত্ত পৌরহিত্যের কাজ করবেন। এতে গিরিশচন্দ্রের ধারণা হয়েছিল নববিধান অনুযায়ী বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, এক অদ্ভুত নতুন পদ্ধতিতে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। একটি ছোট্ট ঘর, প্রচণ্ড গ্রীষ্মোত্তাপ। এরই মধ্যে বিয়ের কাজ চলছিল। ভীষণ গরমে এবং আচার্য ও পুরোহিতের দীর্ঘ উপদেশ ও বক্তৃতায় সভায় উপস্থিত সম্ভ্রান্ত অতিথিবৃন্দ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়া স্যান্যাল মহাশয়ের বিবাহ পদ্ধতি অনুসরণে নববিধান মণ্ডলীর অনেকেই ব্যথিত হয়েছিলেন। সব মিলিয়ে বিয়ের ক্রিয়াকলাপ তাঁর কাছে 'বাল্যক্রীড়ার' মতো মনে হয়েছিল। তাঁর মতে একজন প্রত্যাদিষ্ট মহাজনকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করার ফল এটি।[৯৬]

গিরিশচন্দ্র গোঁড়া ও সনাতনী বিশ্বাসে আস্থাশীল ছিলেন। পশ্চাৎপদ ধ্যান ধারণায় তিনি প্রাচীনকেই লালন করেছিলেন। কেশবচন্দ্র প্রত্যাদিষ্ট ছিলেন একথা তিনি গভীর ভক্তির সঙ্গে বিশ্বাস করতেন। সাধারণত আমরা জানি, অলৌকিক শক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত বাণীকে প্রত্যাদেশ বলা হয়। প্রত্যাদেশ সম্পর্কিত ধারণার পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি-তর্ক অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। এটি নিতান্তই একটি বিশ্বাসজাত শব্দ। বস্তুত, প্রত্যাদেশ কোন অলৌকিক বাণী নয়। আত্মজ চিন্তা চেতনার ধ্যানলব্ধ সাময়িক উপলব্ধি বাণী আকারে লিপিবদ্ধ হয় মাত্র। যা পরবর্তী সময়ে মানুষ তার স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে একে প্রত্যাদেশ নামে চালিয়ে দেয়। গিরিশচন্দ্র জ্ঞান, বুদ্ধি ও অধিবিদ্যার সীমাবদ্ধতার কারণে কেশবচন্দ্রের বাণীকে প্রত্যাদেশ হিসেবেই মেনে নিয়েছিলেন। আর যারা এ প্রত্যাদেশের বিরোধিতা করেছিলেন উগ্রবাদী চেতনার আক্রোসে তাঁদের প্রতি অভিশপ্ত বাণী উচ্চারণেও তিনি পিছু পা হননি।"এই নবগঠিত সমাজের নেতা, প্রবর্ত্তক ও প্রচারকদিগের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত সকলেরই পতন এবং মত ও বিশ্বাসের ঘোরতর স্খলন ও পরিবর্তন হইয়াছে। কেহ বা হিন্দু গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং মন্ত্রদানে মন্ত্রগ্রাহী বৈষ্ণবসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, কেহ বা হিন্দুবামাচারী মহান্ত হইয়া শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন; কেহ বা কর্ত্তাভজা গুরুর, কেহবা মন্ত্রগ্রাহী গোস্বামী গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কেহ বা সিংহবাহিনী ভবানী পূজায় যোগ দিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের নিন্দাকারীদিগের এই পরিণাম ঘটিয়াছে।"[৯৭] বিরোধী দলের এহেন অবস্থা দেখে তিনি আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন, এহেন পরিস্থিতিতে তাঁর অন্তরের বিষবাম্প যেন অনেকটাই উবে গিয়েছিল। কিন্তু কেন এ ধর্মান্তরের হুলস্থুল ব্যাপার ঘটেছিল? কোন অবিশ্বাস তাঁদেরকে ধর্মান্তরিত হতে প্ররোচিত করেছিল? এ বিষয়ে 'কোচবিহার বিবাহে'র দায়বদ্ধতা ছিল কতটুকু? এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান করা গিরিশচন্দ্রের মতো সনাতনপন্থী, অন্ধবিশ্বাসে অবিচল, রক্ষণশীল মতবাদে পুষ্ট সীমিত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। একটি নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে আন্তর্জাতিক অভিব্যক্তি তাঁর গড়ে উঠেনি। আত্মচেতনাকে ছাপিয়ে মহত্ত্বের বৃহৎ পরিমণ্ডলে তিনি নিজেকে ছড়াতে পারেননি। 'কোচবিহার বিবাহে'র পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রক্ষণশীলতা থেকে বেরিয়ে যখন অত্যাগ্রসর ব্রাহ্মদের সমর্থন করেছেন তখন তিনি তাঁর সম্পর্কেও বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন-

> "সমধিক বিস্ময় ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন যে সকল লোক কেশবচন্দ্রের প্রাণের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষিদেব তাঁহাদের সহায় ও মুরব্বি হইয়াছেন; তাঁহাদিগকে বুকে তুলিয়া লইয়াছেন, অর্থাদিদানে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহার মত ও বিশ্বাসে মিলুক বা না মিলুক তাঁহারা তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। এই নতুন বিরোধী দলের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও আদর পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ তাঁহারা তাঁহার মত ও ভাবের এবং তাঁহাকর্ত্তৃক প্রচারিত প্রণালী ইত্যাদির অনুবর্ত্তী নহেন। তিনি স্ত্রী স্বাধীনতার বিপক্ষ হইয়াও এক সময়ে কেশবচন্দ্রের বিপক্ষ স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদাতাদিগকে বিশেষ উৎসাহদান করিয়াছেন। উচ্চ ঋষিধর্ম্ম যোগধ্যানের সঙ্গে এইরূপ ভাবের কি প্রকার সামঞ্জস্য আছে, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অনেকে বলেন, মহা প্রতিভাশালী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী উদারচেতা উন্নতিশীল ভক্ত কেশবচন্দ্রের

প্রভাবে তাঁহার রক্ষণশীল সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমত এদেশে গৃহীত ও সমাদৃত হইল না, তজ্জন্য মহর্ষি কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে এতদূর প্রতিকূল ছিলেন।"[৯৮]

গিরিশচন্দ্রের ভগ্নিপতি, ভাগনে ও ভাগিনিরা সকলেই যুক্তিনিষ্ঠ, মুক্তবুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে 'কোচবিহার বিবাহের' প্রতিবাদ করেন। তাঁরা কেশব বিরোধীদের সমর্থন করেন। গিরিশচন্দ্র ছিলেন তাঁদের চিরশুভকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও নিকট আত্মীয়। তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁকে 'কোচবিহার বিবাহ' সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেননি। গিরিশচন্দ্র নিজ থেকেও ঘটনার সত্যাসত্যতা সম্পর্কে তাঁদেরকে কিছু বলেননি। কারণ তাঁরা শত্রু পক্ষকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁদের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন। এটিকে গিরিশচন্দ্র সুনজরে দেখেননি। তাঁর আশঙ্কা ছিল তাঁরা তাঁর কথা বিশ্বাস করবে না, পাছে তাঁকে লজ্জিত ও অপ্রতিভ হতে হবে। ঢাকায় গিয়ে তিনি দু / একবার তাঁর ছোটদিদির বাসায় উঠেন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি বুঝে অত্যন্ত সংকুচিতভাবে স্থিতি করেন। কখনো কখনো এমনও ঘটেছিল যে, তাঁর উপস্থিতিতে পারিবারিক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিধান বিরোধী নেতা উপাচার্যের কাজ করেছেন। তিনি কিছুই জানতে না পেরে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যথিত হন। পরিশেষে তিনি ঐ পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিশ্বাস ও মতের অনৈক্য বুঝতে পারেন বলেই তিনি সে বাড়ি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কিন্তু সে বাড়ির মঙ্গল কামনায় তিনি ছিলেন অধীর। পূর্ববঙ্গের মধ্যে গুপ্ত পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবার। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা ও আগ্রহ ছিল, বিবাহাদি সূত্রে ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে যেন গুপ্ত পরিবারের আত্মীয়তা হয়। কিন্তু তার অন্যথা হতে লাগল। ঘটনাক্রমে এ পরিবারে বিগর্হিত অনৈতিক ব্যাপার ঘটতে লাগল। ফলে এ পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল। এ পরিবারের বিয়ে সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনি অনেকের ভর্ৎসনাভাজন হয়েছিলেন। এমনও হয়েছিল যে, বিবাহাদি ব্যাপারে অনেক সংবাদ ইচ্ছাপূর্বক তাঁর কাছে গোপন করা হতো। কোনো কোনো দুর্ঘটনায় তিনি এতটাই মর্মাহত হন যে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছিলেন। এ তো গেল কৃষ্ণগোবিন্দের পরিবারের কথা। মধ্যম ভাগিনেয় ফরিদপুরের সিভিল সার্জেন প্যারীমোহন গিরিশচন্দ্রকে অতিশয় ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। একবার প্যারীমোহন কোনো সূত্রে ভুল করে তাঁকে 'পরিবারের শত্রু' বলে গালি দিয়ে এবং ভর্ৎসনা করে পত্র লেখেন। উত্তরে গিরিশচন্দ্র লেখেন, "তোমার যখন আমার প্রতি এরূপ বিশ্বাস, তখন আমি তোমার সঙ্গে কোন প্রকার যোগ ও সম্বন্ধ রাখিতে প্রস্তুত নহি।"[৯৯] পরে অবশ্য প্যারীমোহন নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। এরপর অবশ্য জীবনের শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের প্রতি তাঁর ভক্তি ভালোবাসা অটল ছিল। একবার ভবানীপুরে প্যারী নিজ কন্যার নামকরণ করার জন্য অসুস্থ গিরিশচন্দ্রকে গাড়িতে করে শ্বশুরালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শ্বশুর বিরোধী দলের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি তাঁকে দিয়ে নামকরণ করিয়েছিলেন–এটি গিরিশচন্দ্রের প্রতি প্যারীর ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। এরপর ময়মনসিংহে অবস্থান কালে প্যারীর পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছিল। প্যারীমোহন পুত্রের জাতকর্মের ক্রিয়া সম্পাদন করতেও গিরিশচন্দ্রকে বাধ্য করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রতি গভীর আস্থা, অবিচল ভক্তি ও বিশ্বাসের জন্য গিরিশচন্দ্রকে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরিবার পরিজন এমনকি নিকটাত্মীয়দের কাছেও তিনি বিরাগভাজন হয়েছিলেন কিন্তু তিনি সকল বন্ধুর পরিস্থিতি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন

আচার্যের প্রতি বিশ্বাস আর ভালোবাসার জোরে। ধর্ম সাধনায়, ধর্ম চেতনায় পরম ব্রহ্মের সান্নিধ্যের একাগ্রতায় তিনি কেশবচন্দ্রকে পরম গুরু জ্ঞানে ভক্তি করেছিলেন। তাঁর গুরু ভক্তিতে উগ্র অন্ধত্ব থাকলেও তা একজন শিষ্যেরই অভিলষিত পথ।

ঞ. বঙ্গভঙ্গের প্রতি গিরিশচন্দ্রের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ছিল বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহুল বিতর্কিত ঘটনা। এর ফলে একদিকে যেমন পূর্ববঙ্গের পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত জনপদে শিক্ষা-দীক্ষাসহ নানান সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ ঘটেছিল, অন্যদিকে তেমনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের স্বদেশী আন্দোলনের ফলে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল। তবে এটিও সত্য এ আন্দোলনের ফলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাব দেখা দিয়েছিল। বিচিত্র তাৎপর্যে বঙ্গভঙ্গ ছিল বাঙালির জীবনে এক অর্থবহ অধ্যায়।

১৮৯৮ সালে বড়লাট হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করে ভারতে এসেছিলেন লর্ড কার্জন। তাঁর শাসনামল (১৮৯৮-১৯০৫) বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগে ছিল স্মরণীয়। এসব সংস্কারের মধ্যে বঙ্গবিভাগ ছিল অন্যতম। তৎকালে সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে ছিল বঙ্গদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি।[১০০] বিশাল প্রদেশ। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল এলাকা শাসন করছিলেন এবং ১৯০৩ সাল নাগাদ এর লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭ কোটি ৮৫ লাখে।[১০১] যা তৎকালীন উপমহাদেশের এক তৃতীয়াংশ। বাংলা প্রেসিডেন্সি তখন শাসন হতো কলকাতা থেকে। কলকাতা ছিল তখন সমগ্র ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পচেতনা ও রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা থেকে বাংলার দূরবর্তী অঞ্চলগুলো কার্যত ছিল বিচ্ছিন্ন। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, ভূস্বামীদের আধিপত্য পূর্ব বাংলার জনজীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা এমনকি জীবন যাপনেও তারা ছিল অবহেলিত ও নিগৃহীত। প্রকৃতপক্ষে, কলকাতা ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলো সরকারের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিল। সরকারি অনুদানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং জনকল্যাণমূলক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায়। ১৯০৯ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম আইন পরিষদের বক্তৃতায় সৈয়দ শামসুল হুদা উল্লেখ করেন-"বঙ্গ বিভক্তির পূর্বে বিরাট অঙ্কের টাকা কলকাতা ও তার আশেপাশের জেলাগুলোতে ব্যবহৃত হতো। শ্রেষ্ঠ কলেজ, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ভারতের রাজধানীর আশেপাশে করা হতো আর পূর্ববঙ্গের লোকেরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে

বছরের পর বছর পুঞ্জিভূত অবহেলা ও বঞ্চনা।"[১০২] এসব বৈষম্য দূরীকরণে প্রশাসনিক শাসনের সুবিধার্থে এবং পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ, প্রতিরক্ষা অথবা ভাষাগত সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে ১৯০৩ সালে বাংলাকে ভাগ করার পরিকল্পনা করা হয়। অবশ্য লর্ড কার্জনের এ উদ্যোগের আগেও মাঝে মাঝে বাংলার প্রশাসনিক এককসমূহকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। ১৮৩৬ সালে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে বাংলা থেকে পৃথক করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে দেয়া হয়। ১৮৫৪ সালে সপরিষদ গভর্নর জেনারেলকে বাংলার প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে প্রদেশটির শাসনভার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ওপর অর্পণ করে। ১৮৭৪ সালে চীপ কমিশনার শীপ গঠনের লক্ষ্যে (সিলেটসহ) আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ১৮৯৮ সালে লুসাই পাহাড়কে এর সাথে যুক্ত করে।[১০৩] এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ভারত সচিবের অনুমোদন নিয়ে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। উত্তর পূর্ব বাংলাকে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করে এক লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশ চল্লিশ বর্গমাইল বিশিষ্ট প্রদেশের নামকরণ করা হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম।' এ প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল তিন কোটি দশ লক্ষ। তন্মধ্যে এক কোটি আশি লক্ষ ছিল মুসলমান এবং এক কোটি বিশ লক্ষ ছিল হিন্দু। এর রাজধানী হয়েছিল ঢাকা এবং চট্টগ্রাম হয়েছিল দ্বিতীয় সদর দফতর।[১০৪] পূর্ববঙ্গ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা উপকৃত হয়েছিল বেশি। লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গের প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করে সেখানকার শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়ন করতে চেয়েছিলেন। যদিও এসবের পেছনে কার্জনের একটি প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল। "তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা ভারতে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্মদাতা। সেই জন্য প্রথম হইতে তিনি এই শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীকে সন্দেহের চোখে দেখিতেন।"[১০৫] স্বাভাবিক কারণেই তিনি বাংলার একতা বা অখণ্ডতাকে দ্বিধা বিভক্ত করতে চেয়েছিলেন অত্যন্ত সুকৌশলে। মুসলমানদের স্বাধীন আত্মবিকাশের পথকে সুগমের নামে ধূর্ততার সাথে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেয়াই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য এবং তাতে তিনি সফল হয়েছিলেন সন্দেহাতীত ভাবে।
বঙ্গবিভাগে উত্তাল হয়ে উঠে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দু সমাজ। উচ্চবর্ণের এলিট শ্রেণির হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করে। পূর্ববঙ্গ আলাদা প্রদেশ হলে সেখানে প্রশাসনিক কাঠামো সুদৃঢ় হবে, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে, শিক্ষায় সরকারী বরাদ্দ বাড়বে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসা-বাণিজ্য এগিয়ে যাবে, সর্বোপরি জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মহাজন জমিদারদের প্রভাব কমবে এটি তৎকালীন এলিট শ্রেণি তথা উচ্চবর্গীয় হিন্দুরা মেনে নিতে পারেননি। বলা যায়, হিন্দু মধ্যবিত্তদের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় পূর্ববাংলার সাধারণ হিন্দু মুসলমানদের অনুপ্রবেশ তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। ফলে পশ্চিমবঙ্গের এলিট শ্রেণি তাঁদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। গোলাম মুরশিদের বর্ণনায়-

> "কলকাতায় বসবাসকারী অনুপস্থিত(Absentee) জমিদারগণ দেখলেন তাদের জমিদারী অন্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে। আর ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা দেখলেন নতুন রাজধানীতে একটি ব্যবসা ও শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠলে তা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে, ফলে বিকাশোন্মুখ নবজাত বুর্জোয়া শ্রেণী এবং বিক্ষুব্ধ জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ এক হয়ে দাঁড়ালো।

তাছাড়া উকিল ব্যারিস্টারগণও (এঁদের অনেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) আশঙ্কা করলেন যে, ঢাকায় উচ্চ আদালত স্থাপিত হলে তাঁদের কার্যক্ষেত্র সংকুচিত হবে।"[১০৬]

এ আশঙ্কা থেকে এলিট শ্রেণি আন্দোলন শুরু করেন বটে কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা হিন্দু জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে পরিব্যাপ্ত হয়। তাঁরা হিন্দু ভাবাদর্শে বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি এবং বাংলার অখণ্ডতা রক্ষার আন্দোলনে হিন্দু ধর্মেরই পুনরোত্থান ঘটিয়েছিলেন। যদিও এ আন্দোলন পূর্ববঙ্গের সাধারণ হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা এ আন্দোলনে একাত্ম ঘোষণা করেন। অরন্ধন, নগ্নপদে পথ পরিক্রমার পর গঙ্গাস্নান এবং রাখিবন্ধন ইত্যাদি হিন্দুয়ানি পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁরা বঙ্গভূমির অঙ্গচ্ছেদের জন্য দুঃখপ্রকাশ, শুচিতালাভ এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধন সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। যা থেকে বৃহৎ মুসলিম সমাজ স্বাভাবিক কারণেই বাদ পড়ে যায়। কলকাতার সংবাদপত্রগুলো কার্জনের উদ্দেশ্যকে মুসলিম পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিহিত করে তাঁর তীব্র সমালোচনা করে। সারাদেশে প্রবল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' সমিতির জন্ম হয়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গরদ করার জোরালো দাবী ধ্বনিত হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বাঙালি যে আত্মশক্তি অর্জন করেছিল তা স্বদেশ প্রেমের দুর্জয় স্বাধীনতা লাভের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। সুপ্রকাশ রায়ের রচনাতে আমরা সে আন্দোলনের সচিত্র বর্ণণা পাই-

"১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ছিল বঙ্গভঙ্গের নির্দিষ্ট তারিখ। ঐ দিন অসংখ্য সমাবেশ ও শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বাংলার জনসাধারণ সে বিক্ষোভ প্রকাশ করে, ভারতের ইতিহাসে তাহার কোন তুলনা নাই। এদিন সারা বাংলাদেশব্যাপী জনসাধারণ উপবাস করিয়া ও নগ্ন পদে থাকিয়া দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদের জন্য শোক প্রকাশ করে, দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ রাখে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবানুসারে সমগ্র বাঙালির ঐক্য ও প্রতীকস্বরূপ হস্তে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র ধারণ করিয়া "রাখী বন্ধন" এর অনুষ্ঠান ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবনানুসারে "অরন্ধন" পালন করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং বাঙালি জনসাধারণ তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া জন্মভূমির ঐক্য অব্যাহত রাখিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। ঋষি বঙ্কিমের অমর সঙ্গীত "বন্দে মাতরম" প্রথমে বাঙালির ও পরে ভারতের জনগণের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। বাঙালির এই নতুন স্বদেশ প্রেমের মন্ত্র দ্রুত সারা ভারতবর্ষকে দীক্ষিত করে, সারা ভারতের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ করে।"[১০৭]

নিঃসন্দেহে এ আন্দোলন ছিল বাংলার জনগণের আপোষহীন সংগ্রামে আত্মপ্রত্যয়জনিত বলিষ্ঠ চেতনার নাম। কিন্তু এ চেতনার অংশীদার পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা হতে পারেননি। এ আন্দোলনে তাঁরা পূর্ববৎ বঞ্চনার হতাশায় নিমজ্জিত হন। পরিশেষে হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতার মুখে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লীতে তাঁর রাজাভিষেক দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন।

বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট বিক্ষুব্ধ আন্দোলন বিরোধী এক নির্ভীক চেতনার নাম ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। স্বদেশী, বয়কট প্রভৃতি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ ছিল সদা উচ্চকিত। তাঁর 'আত্ম-জীবন' এর রাজনৈতিক

আন্দোলন বিষয়ক মন্তব্য অধ্যায়ে বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনায় তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এ অধ্যায়টি তিনি রচনা করেন 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কার্যকর হবার দুই বছর পর। বাংলায় তখন বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্যে তুমুল আন্দোলন ও প্রতিবাদ চলছিল। সে সময়ে তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ চিত্তে বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষীয় স্বকীয়তায় হয়েছিলেন নির্ভার। এ স্বপক্ষীয় প্রেরণার তাগিদ এসেছিল তাঁর প্রাণের উৎসমূল থেকে। তিনি ঢাকা নিবাসী, সে স্থানে তাঁর বাসগৃহ, পূর্ববঙ্গ তাঁর জন্মভূমি। ঢাকা রাজধানী হলে নানা বিষয়ে পশ্চাৎগামী ও অনুন্নত ঢাকার উন্নতি হবে।[১০৮] এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল তাঁর কাছে যুক্তিহীন। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের বাদ-প্রতিবাদ, রাজপ্রতিনিধি সম্পর্কে নিন্দাপরাধ রটনা, কটূক্তি বর্ষণ, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছাত্রদের এমনকি নারীদেরও খেপিয়ে তোলা, চারিদিকে হৈচৈ ব্যাপার দেখে তিনি ব্যথিত হন। তিনি বলেন,

> "আমি বঙ্গবিভাগ নীতির বিপক্ষ নহি, বরং স্বপক্ষ। আমার বিশ্বাস এতদ্বারা পশ্চাৎপদ, অনুন্নত ও নানা অভাবগ্রস্ত পূর্ববঙ্গের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। ঢাকা রাজধানী এবং পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বাণিজ্য স্থান হইতে চলিল, পূর্ববঙ্গবাসীদিগের অর্থাগমের পথ মুক্ত হইল। সেদেশে রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্য্যালয় সকল স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হইবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, আসাম প্রদেশ ও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে বদ্ধ হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে ইহা ভাবিয়া আমার আহ্লাদ হইয়াছে।"[১০৯]

পূর্ববঙ্গের পুঞ্জিভূত দুর্ভোগ ও বঞ্চনা নিরসনে বঙ্গভঙ্গ ছিল তাঁর কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। দুই বাংলার এলিট শ্রেণির হিন্দুদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তিনি পূর্ববঙ্গের কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেননি। এ আন্দোলন তাঁর কাছে ছিল আবেগজাত অন্ধ উন্মাদনা মাত্র। তিনি নিজে ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু। তবুও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের উন্নতি কামনায় তিনি ছিলেন অধীর। কোনো সাম্প্রদায়িক আবিলতা তাঁকে হীনমন্য করে তুলতে পারেনি। সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক উদার মানবিকতা লুকিয়ে ছিল তাঁর নববিধান অন্তঃকরণ সত্তায়। নিজ জেলার প্রতি, নিজ জন্মভূমি পূর্ববঙ্গের প্রতি তাঁর ছিল অপ্রতিম নাড়ির টান। পূর্ববঙ্গের প্রতি পশ্চিম বঙ্গের বৈষম্যমূলক আচরণ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। পশ্চিমবঙ্গবাসীদের দৌরাত্ম্যে পূর্ববঙ্গের কৃতবিদ্য লোক কলকাতার কোনো অফিসে সহজে প্রবেশ করতে পারত না। সেখানকার কেরানিগিরি প্রভৃতি কাজে তাঁদের ছিল একচেটিয়া অধিকার।[১১০] নতুন প্রদেশ এসব অবাঞ্ছিত ঘটনার পরিবর্তে সম্ভাবনার অবারিত দ্বারা উন্মুক্ত করবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু নতুন রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হলো, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের বিচ্ছেদ ঘটল ইত্যাদি অপপ্রচারের মাধ্যমে উচ্চবর্গের হিন্দুরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে। বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার পশ্চাৎপদ একটি অংশ উন্নতির দিকে ধাবিত হবে, সকল সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হবে সে ইতিবাচক দিককে গ্রহণ না করে হিন্দু এলিট শ্রেণি আত্মস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলা বিভাজনের নেতিবাচক দিকগুলোর প্রোপাগান্ডা ছাড়িয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাংলাকে উত্তাল করে তুলে। গিরিশচন্দ্র তার যৌক্তিকতা খণ্ডন করে "কি যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কি যে অনিষ্ট হইয়াছে" তার কোন লক্ষণ দেখতে পাননি বলে অভিমত দেন। তাঁর মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন– উভয়

প্রদেশের বক্তা ও লেখকগণ সম্মিলিতভাবে উৎসাহ সহকারে রাজনৈতিক আন্দোলন করছেন, রেলওয়ে স্টীমারাদি যোগে আগের মতো উভয় প্রদেশে বাণিজ্য চলছে, প্রতিদিন হাজার হাজার নরনারী এপার বাংলা ওপার বাংলা যাতায়াত করছে। বিবাহাদি সম্বন্ধে দুই বাংলার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পর্কের কোনো দিকই মলিন হয়নি। সুতরাং অঙ্গচ্ছেদের ধারণাটি ছিল একান্তই ভ্রান্ত। তাঁর মতে, অরন্ধন নিয়ম ও রাখিবন্ধন প্রভৃতি কবি কল্পনাজাত পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল ইংরেজ জাতির সঙ্গে দূরত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে। এ আন্দোলনের মূলে তিনি 'অধর্ম্ম অনীতি ও বিদ্বেষ' দেখতে পেলেন। লর্ড কার্জনের প্রতি বিদ্বেষ আর ক্রোধ থেকে এ আন্দোলনের উৎপত্তি বলে তিনি মনে করেন। লর্ড কার্জন 'বহু প্রজার অমতে' পূর্ববঙ্গের নতুন শাসনব্যবস্থা কার্যকর করেন। "এই ব্যবস্থায় পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত পূর্ব্ববঙ্গের ও আসামের অচিরে সমৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, সে দেশে বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার হইবে, তথাকার গরীব দুঃখী উপযুক্ত লোক বাঙাল বলিয়া যে, কলিকাতার সমুদায় অফিস হইতে তাড়িত হইয়া থাকে তাহাদের চাকরী জুটিবার ও জীবিকা নির্ব্বাহ হইবার উপায় হইবে।"[১১১] নতুন প্রদেশ হওয়ায় পূর্ববঙ্গের এসব উন্নতি ও উপকার যেন তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গনীতির প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে অবস্থান ছিল তাঁর আঞ্চলিক প্রেম ও রাজভক্তিরই লক্ষণ। নববিধান মূলতন্ত্রের অন্তর্গত অন্যতম ধর্মমত ছিল রাজভক্তি। আচার্য কেশবচন্দ্র বিলাত হতে কলকাতায় ফিরে এসে বিলাতের সঙ্গে 'ভারত ভূমির বিবাহ' অর্থাৎ 'চিরসম্মিলন' বিষয়ে উপদেশ দিলেন। বিলাতের বিজ্ঞান, দর্শন, সেবাময়তা ও কার্যোদ্যম ভারতকে গ্রহণ করতে হবে আর বিলাত গ্রহণ করবে ভারতের যোগভক্তি আর আধ্যাত্মিকতা। এভাবে চিরদিন দুই দেশের সঙ্গে আদান প্রদান চলবে। পরস্পরের এ যোগ কোনোদিন ছিন্ন হবে না। গিরিশচন্দ্র নববিধানে আত্ম-নিবেদিত প্রাণ। রাজভক্তি ছিল তাঁর ধর্ম বোধেরই একটি অংশ। সুতরাং ইংরেজদের প্রতি সহিংস মনোভাব তিনি মেনে নিতে পারেননি। অরন্ধন, রাখিবন্ধন, নগ্নপদে পথ পরিক্রমা, স্বদেশী, বয়কট আন্দোলনকে তিনি ইংরেজ জাতির সঙ্গে অসদ্ভাবের কারণ বলে চিহ্নিত করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ইংরেজ জাতির সঙ্গে বাঙালির বিচ্ছেদ ও শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। প্রবল জাতির সঙ্গে দুর্বল জাতির বিবাদে দুর্বল জাতিরই ক্ষতি হয়। আন্দোলন স্রোতে বাঙালি জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে তিনি মনে করেন। বাঙালির চাকরী-বাকরী জীবনোপায় সবই ছিল ইংরেজ সরকারের হাতে ন্যস্ত। সুতরাং ইংরেজদের সাথে শত্রুতা নয় বন্ধুত্বই পারে বাঙালির জীবনোন্নয়ন ঘটাতে। গিরিশচন্দ্র ইংরেজ শাসনকে বিধির বিধান মনে করতেন। তাঁর মতে, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে অন্তঃসারশূন্য ভারতভূমিকে উদ্ধারার্থে ইংরেজশাসন ঈশ্বরের দূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতকেই অবলম্বন করেন। প্রতাপচন্দ্র ইংরেজ শাসনকে বাঙালির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করতেন। তাঁর মতে, "ইংরেজ জাতির সঙ্গে মিলনে আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ উচ্চ হইল, নীতি চরিত্র উচ্চ হইল, সভ্যতা সদগুণ বৃদ্ধি হইল, সামাজিক উন্নতি, বিশেষতঃ স্ত্রী জাতিবিষয়ক উন্নতি আরম্ভ হইল।"[১১২] গিরিশচন্দ্র নববিধানের এ ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তিনিও পতিত জাতিকে উত্তোলন করে অন্য জাতির সমান করার জন্য ভিক্টোরিয়াকে ভগবানের হাতের যন্ত্র বলেন। ঈশ্বর প্রদত্ত শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ প্রজার হস্তক্ষেপ ছিল তাঁর কাছে অপছন্দনীয়। লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গে যে নতুন শাসনব্যবস্থা কার্যকর

করেছেন তাতে প্রজার কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে তিনি অভিমত দেন। স্বদেশী আন্দোলনের নামে সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টি, সহিংস বিক্ষোভ ও আইন অমান্যের প্রবণতায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। স্কুল কলেজের ছাত্রদের অন্যায়, অনৈতিক আচরণ, নারীদের উৎসাহ উত্তেজনার বাড়াবাড়ি, সাধারণ প্রজার ম্যাজিস্ট্রেটকে ঢিল ছুঁড়ে মারা, ইউরোপীয় মহিলার গায়ে কাদা নিক্ষেপ করা, স্কুল কলেজের নিয়ম বিধি অগ্রাহ্য করে চলা, মহামান্য রাজাধিপতি লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর মহোদয়কে অপমান করা, বিলাতি লবণের নৌকা নদীতে ডুবিয়ে দেয়া এবং হাটবাজারে দৌরাত্ম্য করাকে তিনি ছাত্র ও আন্দোলনকারীর দুর্নীতি বলে অভিহিত করেন। এ আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। রাজনীতি বিষয়ক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ প্রকৃতি বিরুদ্ধে বলে তিনি অভিমত দেন। কারো অনুরোধে রাজনৈতিক আন্দোলন স্রোতে পড়ে নারীরা যেন তাঁদের স্বাভাবিক নম্রতা ও শিষ্টতা বিসর্জন না দেন এটি ছিল নারীর প্রতি তাঁর আবেদন। তিনি মনে করতেন, ‘প্রেম ও কৃতজ্ঞতাশূন্য Protesting spirit অত্যন্ত অনিষ্টজনক’। গিরিশচন্দ্র নারী কল্যাণ চেয়েছেন, নারীশিক্ষা উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকাও রেখেছেন কিন্তু সেটা যেন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও ইংরেজ প্রীতিরই ফল। নারী সমাজের আধুনিকায়নে তাঁর মনোজগতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। নারীকে যে সনাতনী গণ্ডিবদ্ধ গতানুগতিকতায় দেখে অভ্যস্ত ছিলেন, চিন্তা চেতনায় তাঁর বাইরে তিনি বেরুতে পারেননি। নারীর মানোন্নয়নে যুগান্তরের ব্যাপ্তীময় প্রসার তাঁর কাছে তাঁদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলে মনে হয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে তিনি মেনে নিতে পারেননি।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। দেশজ দ্রব্য ব্যবহার করে দেশজ শিল্পের উন্নতি সাধন ও উৎসাহ বিধানে স্বদেশ প্রেমকে উদ্বুদ্ধ করা এবং বিদেশি দ্রব্য বর্জনের মাধ্যমে ইংরেজ বিরোধী চেতনাকে সঞ্চারিত করা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য। গিরিশচন্দ্র স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁর স্বদেশীয়ানা প্রসঙ্গে বলেন, “আমি কখনো ইংরেজী জুতা পদে স্পর্শ করি নাই, কোনরূপ বিলাতী পোষাক পরি নাই। আমি নিরেট স্বদেশী; স্বদেশী বক্তৃতা শুনিয়া আমি স্বদেশী হই নাই।”[১১৩] বাঙালিয়ানার ষোল আনাই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে লক্ষণীয়। কিন্তু জোর জবরদস্তি করে ঘৃণা বিদ্বেষ উৎপন্ন করে স্বদেশি পণ্য ক্রয় বিক্রয়ে বাধ্য করার তিনি বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল এতে জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন, স্বদেশি পণ্য যদি গুণে মানে উৎকৃষ্ট হয় এবং দামে সস্তা হয় তাহলে এর উপযোগিতা বাড়বে। ক্রেতা সাধারণ এতো নির্বোধ নয় যে সস্তায় উৎকৃষ্ট স্বদেশি পণ্য পেলে বিদেশি দ্রব্যের প্রতি ঝুঁকবে। তিনি এঁড়ি, মুগা, বাপ্তা, টুইল, বোম্বাই চাদর, ময়নামতী ছিট, ঢাকা, পাবনা, ফরাশ-ডাঙ্গার কাপড়, লুধিয়ানা, ধারোয়াল, কেনানোর, কানপুর প্রভৃতির উদাহরণ টেনে বলেন, এসব অঞ্চলের কাপড় ছিল এদেশের মানুষের নিত্য ব্যবহার্য। সস্তা এবং ভালো হওয়ায় এগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোনো সভা সমিতি করা হয়নি, লোকজনকে সচেতনও করা হয়নি। এর বিপরীত দিকে, বিলাতি দ্রব্য যদি সস্তা এবং টেকসই না হয় তবে, জনগণই তা প্রত্যাখ্যান করবে বলে তিনি মনে করতেন।

সভ্যতার উত্তরণে আদান-প্রদান অবশ্যম্ভাবী এবং গিরিশচন্দ্র একেই উন্নতির সোপান বলেছেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির আবিষ্কার তাদের উন্নত জীবনভাবনা অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি জাতি উন্নত হয়ে উঠে। বর্তমানে

নব নব আবিষ্কার মানুষের সুখ-সুবিধা ও জীবিকা অর্জনের পথ সুগম করেছে। তড়িৎ, বাষ্প প্রভৃতি শক্তি ভৌত রাজ্যে যুগান্তর ঘটিয়েছে। তিনি মনে করতেন, ভারতের আধুনিকতা আনয়ন ইংরেজদের অনন্য কীর্তি। আর এসব সুখ সুবিধা অগ্রাহ্য করে ভ্রান্ত স্বদেশী আন্দোলনে 'মান্ধাতার আমলের চরকা, গোযান, তুর্জ্জপত্র, তালপত্র, বংশলেখনী, মৃন্ময় পত্র মধ্যে চিন্তা ও কার্য আবদ্ধ রাখা' অসম্ভব। ইংল্যান্ড যদি তাঁদের বিজ্ঞান প্রসূত শিল্পাদির আমদানি বন্ধ করে দেয় তাহলে ভারতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এদেশের লোকের বুদ্ধির প্রসার হবে না, নতুন আবিষ্কার ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। এদেশবাসী পূর্ববৎ অশিক্ষিত ও অশক্তই থেকে যাবে বলে তিনি অভিমত দেন। তিনি মনে করেন, প্রতিযোগিতা, স্বাধীনভাবে আদান প্রদান প্রকৃতির নিয়ম। বিদেশি পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই দেশীয় পণ্যের টিকে থাকতে হবে। দেশীয় শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ দরকার এটা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু বম্বে, নাগপুর প্রভৃতি স্থানের কাপড়ের কল কত বৎসর ধরে চলছে কিন্তু বিলাতি কাপড়ের যে সমান হতে পারেনি সেজন্য দেশীয় পণ্যের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতিতে ক্রমবর্ধিত মুনাফা অর্জন ছিল যাদের লক্ষ্য, শাসনে-শোষণে-লুণ্ঠনে সম্পদ পাচার করা যে প্রভুদের ছিল বৈশিষ্ট্য তাঁরা প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যে দেশীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, এ দিকটি গিরিশচন্দ্রের চিন্তায় উপেক্ষিতই রয়ে গেল। বলা যায়, ভারতীয় জীবনযাপনে, চিন্তাচেতনায় তিনি ব্রিটিশ অবদানের বিকল্প চিন্তা করতে পারেননি। তিনি বলেন,

> "আমাদের দেশের লোকেরা সম্পূর্ণ বিলাতীবর্জ্জনের জন্য কি প্রস্তুত হইয়াছেন? বিদেশীয় হৃদয়ের ভাব, চিন্তা যাহা শতবিধ কল্যাণকর অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত, যাহা সাহিত্যে, দর্শনে, ভাষায়, চিন্তায় প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা কি পরিত্যাগ করিবার সাধ্য আছে? তাড়িৎবার্ত্তাবহ, বাষ্পীয় শকট, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা প্রভৃতি সেই অদৃশ্য শক্তির অভিব্যক্তি। সেই পাশ্চাত্য চিন্তাও ভাবরাজ্যের প্রবল স্রোত হইতে বাঙালী কবি ও লেখকগণ ভাষাকে বিমুক্ত করিতে পারিবেন কি? এবং তাহা করা কি যুক্তিযুক্ত? মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন বঙ্গীয় লেখককে বল তোমাদের বিলাতী ভাব, চিন্তা, ছন্দাদি সব বেশ পরিত্যাগ কর। যদি এইভাবে নগ্নবেশে ইঁহারা এখন দণ্ডায়মান হন বঙ্গভাষার কি শোভাই থাকে? অনেকে লেখকের ষোল আনা সাজসজ্জার মধ্যে আধ আনা টেকে কিনা সন্দেহ। যদি বর্জন অসম্ভব, তবে অনর্থক কেন দেশকে বিপন্ন করিতেছ?"[১১৪]

তাঁর মতে, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হোক এটি স্বদেশি লোকমাত্রেরই প্রার্থনা। সে প্রার্থনার সঙ্গে অপ্রেম ও হিংসা বিদ্বেষ অকল্যাণজনক। পুঞ্জ পুঞ্জ বিলাতি কাপড় পোড়ানো, জোর জবরদস্তি করে বিলাতি দ্রব্য বর্জন প্রতিজ্ঞার মধ্যে তিনি বিদ্বেষ বিষ দেখতে পেয়েছিলেন। যা ছিল উভয় জাতির জন্যই অকল্যাণকর। রাজার ওপর প্রজার জোর চলে না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের উদ্ধত আচরণ, সহিংস আক্রমণে সরকার কিছু দমন নীতি গ্রহণ করেন। সরকারের এ কাজ অনেকাংশেই আইনসঙ্গত হয়নি বলে তিনি স্বীকার করেন। সেই সঙ্গে সরকারের যথেষ্ট সহিষ্ণুতা ও উদারতার প্রশংসাও তিনি করেন। স্বদেশী আন্দোলনে বাল গঙ্গাধর তিলক 'শিবাজী উৎসব' পালন করার জন্য কলকাতায় আসেন। তাঁকে নিয়ে রাজধানীতে হুলস্থূল ব্যাপার ঘটে। তিনি

গোলদীঘিতে বিরাট সভা করেন এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে ব্যাপকতর রূপে চাঙা করার জন্য উত্তেজনাকর লিফলেট বিলি করেন। ইংরেজ সরকার কঠোরহস্তে তা দমন করতে পারতেন কিন্তু তাঁরা প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। এতে গিরিশচন্দ্র সরকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, "কত উদারতা! কত ক্ষমা! প্রজার স্বাধীনতার প্রতি কত সম্মান প্রদর্শন?"[১১৫]

গিরিশচন্দ্রের রাজভক্তি উগ্রভক্তিবাদেরই সামিল। আধুনিক যুগের সূচনা পর্ব থেকে সকল প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কলকাতার বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বলতে তখন ব্রাহ্মসমাজকেই বুঝাত। স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের উন্মেষলগ্নে প্রগতিশীল ব্রাহ্মরা একাত্ম হবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। গিরিশচন্দ্র তাঁদেরকে আক্রমণ করতেও পিছু পা হননি। ইংরেজ সমর্থক ব্রাহ্মদের যারা বিলাতি দ্রব্য গ্রহণ করতেন স্বদেশী আন্দোলনবাদী ব্রাহ্মরা তাঁদের একঘরে করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র 'একঘরে' করা ব্যবস্থাকে 'কুৎসিৎ দলাদলি' বলেছেন। এসব আন্দোলন গিরিশচন্দ্রের মনঃপুত নয়। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, আমি বিপিনপাল প্রচারিত 'অরন্ধন নিয়ম' এবং 'রাখিবন্ধন' বিধি পালন করিনি। তাতে কোনো রকম যোগদান ও সহানুভূতি প্রকাশ করিনি।

গিরিশচন্দ্র বঙ্গভঙ্গের অনিবার্যতা সম্পর্কে ছিলেন দ্বিধাহীন। পূর্ববঙ্গে উন্নয়নের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনে বঙ্গবিভাগ ছিল তাঁর কাছে আনন্দের। যাঁরা বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে আন্দোলনে মেতে উঠেছেন, যাঁরা ইংরেজ বিরোধিতা করেছেন তাঁদের ভর্ৎসনা ও নিন্দায় তিনি মুখর হয়েছিলেন। তাঁর স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কট বিরোধিতা যদি শুধুই স্বদেশ প্রেমজাত হতো অথবা শুধুই জন্মভূমি পূর্ববঙ্গের উন্নয়ন প্রত্যাশালব্ধ হতো তাহলেও তাঁর মানসভঙ্গির একদেশদর্শিতাকে অপনোদন করা যেত। কিন্তু তাঁর বিরোধিতা ছিল অন্ধ রাজানুরাগ ও নববিধান আনুগত্যের অনুকরণ মাত্র। সরকার বিরোধী যে কোনো আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন তিনি। ভারতে ইংরেজ শাসন ঈশ্বরেরই আশীর্বাদ। সুতরাং এখানে সাধারণ প্রজার হস্তক্ষেপ ছিল তাঁর কাছে অপাংক্তেয়। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও উগ্ররাজভক্তি তাঁর প্রাগ্রসর চেতনার উন্মেষকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতার ক্রম পরিণতি যখন স্বাজাত্যবোধের প্রেরণায় জাতীয়তাবাদের তীব্র আন্দোলনে রূপ নিচ্ছিল, তখনও তিনি ভক্তিবাদের নির্দিষ্ট গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিলেন। যুগোপযোগী নব নব চেতনার ধারক তিনি হতে পারেননি।

ট. গিরিশচন্দ্রের উইল

গিরিশচন্দ্র সেন ময়মনসিংহে অবস্থানকালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর জীবনের জটিলতর পরিস্থিতিগুলো একে একে জড়ো হয়েছিল তাঁর জীবনে। প্রথমে সমাজচ্যুত একঘরে হয়ে অতি কষ্টে জীবন যাপন, তারপর স্ত্রী বিয়োগ, সংসারের প্রতি নিরাসক্ত মনোভাব, বৈরাগ্য সাধনে ধর্মের প্রতি অতিশয় আসক্তি—পরিশেষে ব্রাহ্মবন্ধুদের আচরণে মনঃকষ্ট প্রাপ্তি। ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে তিনি ময়মনসিংহের শিক্ষকতা ছেড়ে কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে প্রচারব্রত গ্রহণ করেন । পরিবারের সামান্য আর্থিক সাহায্যে জীবনের নানাবিধ জটিলতাকে অতিক্রম করে অতিকষ্টে দিন যাপন করেন। কোন প্রকার আড়ম্বরপ্রিয়তা তাঁর জীবনে ছিল না। নিরলস প্রচারকার্য চালিয়েছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন। ধর্ম সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র অভিপ্রায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ মানুষ। যৌবনেই হারিয়েছেন স্ত্রী ব্রহ্মময়ীকে। সন্তানাদিও ছিল না। ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর পর তিনি সংসারের প্রতি আর কোনো আকর্ষণ বোধ করেননি। ধর্মকে অবলম্বন করেই বেঁচেছিলেন শেষ পর্যন্ত। পৈতৃকসূত্রে তিনি বেশ কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। সেই সম্পত্তি থেকেই তাঁর জীবিকার সংস্থান হয়েছিল। তিনি তাঁর জীবন নির্বাহের জন্য প্রচার ভাণ্ডার থেকে এক পয়সাও গ্রহণ করেননি। বরং প্রচার ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। শেষ জীবনে (১৮এপ্রিল ১৯৯৯সালে) তিনি স্বজ্ঞানে তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি উইল রচনা করেছিলেন। তার বিশ্লেষণে তিনি তাঁর ‘আত্ম-জীবন’এ বলেছেন,

> “আমা কর্তৃক রচিত ও সঙ্কলিত এবং অনুবাদিত কতকগুলি পুস্তক আছে। কাহারও কাহারও এরূপ সংস্কার যে, আমি পুস্তক লিখিয়া নিজের সম্পত্তি করিয়াছি, তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতেছি; ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আমার নিজের অন্ন বস্ত্রাদির জন্য পুস্তকের উপস্বত্ব আমি গ্রহণ করি না, আমার কোন উত্তরাধিকারী সেই উপস্বত্বের ভাগী হইবে না। আমি অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া মিশনে দান করিয়াছি। তন্মধ্যে তাপসমালা প্রথম ভাগ ও স্বীয় পত্নীর জীবন চরিত নিজে অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া প্রচার ভাণ্ডারের সাহাযার্থ দান করা গিয়াছে। অধিকাংশ পুস্তক মিশনে দান না করিয়া আমি নিজের দায়িত্বে মুদ্রিত করিয়াছি। প্রচার ভাণ্ডারের সাহায্যে মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইলে দরিদ্র প্রচারভাণ্ডারের অর্থের অপ্রতুলতাবশতঃ এক এক খানা বৃহৎ পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে অসম্ভব বিলম্ব হয়, এবং আমার ইচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত হয় না। সর্ব্বজনসমাদৃত তাপসমালা ছয় ভাগ একত্র একখণ্ডে উত্তমরূপে মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া অনেকে বিশেষ দুঃখিত। দশ বৎসরেরও অধিককাল হইবে, মিশনে প্রদত্ত দেওয়ান হাফেজের অনুবাদ প্রথমার্দ্ধ মিশনের সাহায্যে ক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে, চরমার্দ্ধের অধিকাংশ অনুবাদ Manuscript আকারে প্রস্তুত আছে। উপেক্ষাবশতঃ হউক, বা মিশনের অর্থের অসচ্ছলতা প্রযুক্ত হউক এ পর্য্যন্ত তাহার একখণ্ডও মুদ্রিত হইতে পারে নাই। বলিতে কি আমার জীবনে তাহা মুদ্রিত দেখিতে পাইব না, বা পরে কখনও মুদ্রিত হইবে না আমার এরূপ সংস্কার। আমি এমন দীর্ঘসূত্রী হইয়া

কাজ করিতে পারি না। পরন্তু আমা কর্ত্তৃক রচিত ও মুদ্রিত সমুদয় পুস্তক যে, আমি প্রচারভাণ্ডারভুক্ত করিয়া দিব আমার এরূপ উদ্দেশ্য নয়। পুস্তক বিক্রয়ে এক্ষণও লাভ হইতেছে না, যে টাকা পাওয়া যায়, নতুন পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে এবং নিঃশেষিত পুস্তক পুনর্মুদ্রাঙ্কনে তাহা ব্যয়িত হয়। দিদীর প্রদত্ত দুই শত টাকা, Gratuity স্বরূপ গভর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত এক শত টাকা পুস্তকের ফন্ডে জমা আছে। তাহা না থাকিলে অর্থাভাবে মুদ্রাঙ্কনে বিঘ্ন হইত। সেই টাকারও কতক প্রচারকার্য্যে পাথেয় হিসাবে ব্যয়িত হইয়াছে। সময়ে পুস্তকে লাভ হইতে পারে। লাভ হইলে তাহার এক চতুর্থাংশ প্রচার ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে, অবশিষ্ট আমার দুঃখী জন্মভূমির অভাবমোচনে ব্যয়িত হইতে থাকিবে, মৃৎকৃত নিম্নোক্ত উইলপত্রে এরূপ নির্ধারিত হইয়াছে। সেই উইলের পাণ্ডুলিপি প্রেরিত দরবারের সম্পাদক ও প্রচার ভাণ্ডারের অধ্যক্ষকে এবং সমুদায় আত্মীয়স্বজনকে প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের সকলের অনুমোদনে লিখিত হইয়াছে, পরে রেজেষ্টরী করা গিয়াছে।”[১১৬]

উইলপত্র

“লিখিতং শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন ওলদে স্বর্গগত মাধবরাম সেন, সাকিন পাঁচদোনা পরগণা মহেশ্বরদি থানা রূপগঞ্জ মহকুমা নারায়নগঞ্জ জিলা ঢাকা, কস্য উইল পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে।

“যেহেতু আমি বার্দ্ধক্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, জীবনের স্থিরতা নাই। অতএব আমার পৈতৃক ভূসম্পত্তি ও ঘরবাড়ী ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যে যৎকিঞ্চিৎ আমার স্বত্বাধিকারে আছে, এবং জীবদ্দশা পর্য্যন্ত থাকিবে, তৎ সমুদয়ের সম্বন্ধে ও মৎপ্রণীত পুস্তক সকলের বিষয়ে একটি উইল করা আবশ্যক হইয়াছে।

“ইতিপূর্ব্বে আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তি বিষয়ে এক উইল করিয়া ঢাকা জিলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ সবরেজেষ্ট্রী অফিসে রেজেষ্টরী করাইয়াছিলাম, তাহার অনেক অংশ এক্ষণ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধে সেই উইলপত্র সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়া এই উইল করিতেছি।

“আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা নাই, একান্নভুক্ত ভ্রাতুস্পুত্রগণ উত্তরাধিকারিরূপে বিদ্যমান। আমার প্রাণ-বিয়োগের পর আমার পরিত্যক্ত পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ আমার স্বর্গগত সর্ব্বাগ্রজ ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্রগণ শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র সেন, শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র সেন ও শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীমান্ সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন তুল্যাংশে পাইয়া দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবে। উক্ত সম্পত্তির অপর এক তৃতীয়াংশ আমার স্বর্গগত অগ্রজ হরচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সেন প্রাপ্ত হইয়া দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া উপরিউক্তরূপে ভোগ দখল করিবে।

“আমার স্বকৃত কতকগুলি পুস্তক নববিধান প্রচারকার্য্যালয়ের অন্তর্গত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত আছে। যথা;- ১) কোরাণের বঙ্গানুবাদ, ২) মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনচরিত, ৩) মহাপুরুষ মুসার জীবনচরিত, ৪) মহাপুরুষ দাউদের জীবনচরিত, ৫) মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত তিনভাগ, ৬) হদিস মেস্কাতোল্ মসাবিহের বঙ্গানুবাদ চারিখণ্ড, ৭) হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ, ৮) হিতোপাখ্যানমালা দ্বিতীয় ভাগ, ৯)

নীতিমালা প্রথম ভাগ, ১০) তত্ত্বরত্নমালা, ১১) তত্ত্বসন্দর্ভমালা প্রথম ভাগ, ১২) চারিজন ধর্ম্মনেতা। এই সকল পুস্তকের চারি ভাগের তিন ভাগ উপস্বত্ব আমার জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামের নিম্নলিখিত জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। উক্ত পুস্তক সকল কলিকাতাস্থ নববিধান প্রচারকার্য্যালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইয়া বিক্রয় হইতে থাকিবে। প্রচারকার্য্যালয়ের উক্ত অধ্যক্ষ এ বিষয়ে য়েকজিকিউটার (কার্য্য সম্পাদক) হইবেন। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনাদিবাবতে ঋণ থাকিলে প্রথমতঃ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় প্রেরিত দরবারের অর্থাৎ উক্ত নামধেয় প্রচারক সভার অভিমত এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান ইন্দুভূষণ ও শ্রীমান বিপিনচন্দ্র সেনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উক্ত ঋণ পরিশোধাদি বিষয়ে অর্থব্যয়াদি করিবেন। ঋণপরিশোধ ও পুস্তক পুনর্মুদ্রাঙ্কনার্থ ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া অর্থ সঞ্চিত থাকিলে দরবার প্রচার কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা রাখিবেন, অবশিষ্ট ৭৫ পঁচাত্তোর টাকা আমার জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামের দুঃখিনী বিধবা, নিরাশ্রয় বালক বালিকা, দরিদ্র বৃদ্ধ ও নিরুপায় রোগী এবং নিঃসম্বল ছাত্র-ছাত্রীদিগের অন্নবস্ত্র, চিকিৎসা ও বিদ্যা শিক্ষার সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। জলকষ্ট দূর ও গৃহহীন দরিদ্রদিগের গৃহাভাব মোচন করার সাহায্য সেই অর্থ দ্বারা হইতে পারিবে। কোন কোন নববিধান প্রচারক মহেশ্বরদি পরগণার কোন স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলে তাঁহাদের পাথেয়াদির সাহায্য সেই পুস্তকের ফণ্ড হইতে দান করা যাইতে পারিবে। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান ইন্দুভূষণ সেন ও শ্রীমান বিপিনচন্দ্র সেন উক্ত অর্থবিতরণসম্বন্ধে য়েকজিকিউটার নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারা তাঁহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অনুজগণের এবং পাঁচদোনাগ্রামস্থ আমার খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন ও শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্র সেনের যোগে একটি কমিটী স্থাপন করিয়া সকলের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক অধিকাংশের মতে সেই সকল কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিবেন। কোন কারণে কমিটির মেম্বারগণ সকলে একত্রিত হইতে না পারিলে সম্পাদক পত্র লিখিয়া তাঁহাদের মত আনয়ন করিয়া অধিকাংশের মতে কার্য্য করিবেন। প্রথমোক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজন উক্ত কমিটির সম্পাদক ও একজন সহকারী সম্পাদক হইবেন। কমিটি আবশ্যক বোধ করিলে সেই অর্থ দ্বারা পাঁচদোনা গ্রামের সন্নিহিত অপর গ্রাম সকলের দুঃখী দরিদ্রদিগের বিশেষ বিশেষ অভাব মোচন করিতে পারিবেন। উক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের অবর্ত্তমানে তাঁহাদিগের প্রধান উত্তরাধিকারীদিগের প্রতি যথাক্রমে এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইবে। মদ্রচিত উক্ত পুস্তক সকলের উপস্বত্ব আমি যেমন নিজের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করিতেছি না, তদ্রূপ আমার উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির ভোগাদির জন্য তাহাতে কোন স্বত্বাধিকার থাকিবে না। আমার পরিশ্রমজাত অর্থ ধর্ম্মপ্রচার ও পরসেবাতে ব্যয়িত হইবে। সময়ে আমার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে কেহ একান্ত দারিদ্র্য অবস্থায় পড়িয়া উক্ত দান পাইবার উপযুক্ত হইলে দরবারের অভিমতে তাহারও পাইবার অধিকার থাকিবে। প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ আয় ব্যয়ের হিসাব পত্রাদি রাখা ও বাহুল্যরূপে পুস্তক বিক্রয় ও প্রচারজন্য আবশ্যকমতে স্থায়ী বা অস্থায়ী বেতনভোগী লোক নিযুক্ত করিবেন। উপযুক্ত কমিশনদানে কিংবা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে তিনি পুস্তক বিক্রয় করিতে পারিবেন, তিনি উহার হিসাবপত্র প্রেরিত দরবারে অর্পণ করিবেন। উপরিউক্ত পুস্তকাবলীর মধ্যে কোন পুস্তকের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন বা সংশোধন করা আবশ্যক হইলে উক্ত প্রচারক সভার মতে তাহা হইতে পারিবে। পুস্তক বিক্রয়ান্তে খরচ বাদে যাহা লাভ হইবে তাহার শতকরা ৭৫ পঁচাত্তোর টাকা প্রেরিত দরবার পাঁচদোনার উপরিউক্ত হিতকর কার্য্য সম্পাদনার্থ

উক্ত অর্থবিতরণ কমিটীর হস্তে অর্পণ করিবেন। কমিটির সম্পাদক ছয় মাস অন্তে বা বৎসরান্তে টাকা পাইবার জন্য দরবারের সম্পাদকের নিকটে পত্র লিখিবেন; ফন্ডে পুস্তকের উপস্বত্ব থাকিলে দরবার তাহা প্রদান করিবেন। পরে কোন্ কোন্ বাবতে কত অর্থ ব্যয় হইল কমিটীর সম্পাদক দরবারকে জানাইবেন। কোন পুস্তক পুনঃর্মুদ্রাঙ্কনে অর্থের অভাব হইলে দরবার উপযুক্ত অংশদানে কোন ব্যক্তিকে বা কতিপয় ব্যক্তিকে তাহা প্রকাশের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন। অর্থ ব্যয় ও বিতরণ করিবার ভার প্রাপ্ত য়েকজিকিউটারগণ নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে প্রথমতঃ দরবার তাঁহাদের ত্রুটির বিষয় তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট না হইলে দরবারের অভিমতে প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ আমার দেশস্থ দুই তিন জন উপুক্ত বিশ্বস্ত লোকের হস্তে সেই ভার অর্পণ করিতে পারিবেন। উক্ত অধ্যক্ষের নিজকার্য্যে ত্রুটি হইলে অর্থবিতরণসম্বন্ধীয় য়েকজিকিউটারগণ প্রেরিত দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া মীমাংসা করিয়া লইবেন। পুস্তকাদি সম্বন্ধে কোন নতুন ব্যবস্থা করা আবশ্যক বোধ করিলে তাঁহারা প্রেরিত দরবারের মত গ্রহণ করিয়া করিতে পারিবেন। প্রচারকার্য্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষের অবর্ত্তমানে তাঁহার স্থলবর্ত্তী যিনি হইবেন তিনিও উইল সম্বন্ধীয় প্রথমোক্ত য়েজিকিউটার হইবেন। কালক্রমে যদি দরবারের এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে যে, তাহাতে উল্লিখিত কার্য্য সকলের ব্যাঘাত হয়, বা দরবার না থাকে, কিংবা তাহার স্থলবর্ত্তী নামান্তরপ্রাপ্ত কোন প্রচারক সভার অভাব হয়, তাহা হইলে দাতব্যের জন্য নিযুক্ত গভর্ণমেন্টের বিশেষ কর্ম্মচারীর প্রতি বা অফিসিয়েল ট্রাষ্টির প্রতি উক্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইতে পারিবে। পৈতৃক সম্পত্তি ও মৎপ্রণীত পুস্তকাদি ব্যতীত অপর কোন সম্পত্তি বা অপরের রচিত পুস্তক আমার স্বত্বাধিকারে থাকিলে তাহার উপস্বত্ব পূর্ব্বোক্তরূপ দাতব্য বিভাগে ব্যয়িত হইবে।

“আমার যে সকল উর্দ্দুপুস্তক ও বক্তৃতা লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে সেই সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বলারাম ভীমবাটদ্বারা মুদ্রিত হইয়া প্রচার হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই, পরে আমার কোন উত্তরাধিকারীরও স্বত্ব থাকিবে না।

“প্রায় চারি বৎসর যাবৎ মহিলানাম্নী মাসিক পত্রিকা আমার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী দরবার, তাহার উপস্বত্বাদিতে আমার কোন স্বত্ব নাই, সুতরাং আমার উত্তরাধিকারীদিগেরও তাহাতে কোন স্বত্ব থাকিবে না।

“মদ্রচিত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রচারভাণ্ডারভুক্ত হইয়াছে। তাহার উপস্বত্ব দ্বারা দরিদ্র প্রচারক পরিবারের ভরণ পোষণাদির সহায়তা হইবে। প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের হস্তে সেই সকল পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ও অর্থ আদান প্রদানাদির ভার সম্পূর্ণ ন্যস্ত আছে। সেই সমুদায় পুস্তক প্রচারভাণ্ডারের অর্থে ও কিয়দংশ অন্যদীয় সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে। আমার উত্তরাধিকারীদিগের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই ও কখনও স্বত্ব থাকিবে না। সেই সমস্ত পুস্তক আমি প্রচারভাণ্ডারের সাহায্যার্থ অর্পণ ও দান করিয়াছি। অতঃপর আমা কর্ত্তৃক রচিত হইয়া যে কোন পুস্তক প্রচারভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা মুদ্রিত হইবে তাহাও পূর্ব্বোক্তরূপ প্রচারভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অপিচ আমার রচিত যে সকল পুস্তক ভবিষ্যতে প্রচারভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা মুদ্রিত হইবে না, অথবা আমি নিজের বা অন্যের অর্থসাহায্যে মুদ্রিত করিয়া প্রচার ভাণ্ডারে দান করিব না, পূর্ব্বোক্তরূপ তাহার উপস্বত্ব পাঁচদোনার জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

“আমার রচিত যে সকল পুস্তক প্রচারভাণ্ডারভুক্ত হইয়াছে তাহার তালিকা- ১) তাপসমালা, ৬ ভাগ, ২) দেওয়ান হাফেজের বঙ্গানুবাদ প্রথমার্দ্ধ, ৩) তত্ত্বকুসুম, ৪) কোরাণের রচনাবলী, ৫) দরবেশদিগের সাধন-প্রণালী, ৬) দরবেশদিগের ক্রিয়া, ৭) দরবেশদিগের উক্তি, ৮) দরবেশী, ৯) ব্রহ্মময়ীচরিত ১০) সতীচরিত, ১১) রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন, ১২) ঈশা কি ঈশ্বর?

এই উইল আমি সজ্ঞানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বাভাবিক অবস্থায় লিখিলাম, আমার মৃত্যুর পর ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে। ইতি সন ১৩০৬ সাল, তারিখ ৮ই বৈশাখ।” লিখক খোদ।

সাক্ষী

“শ্রীশশিভূষণ দত্ত, হাংসাং ওয়ারি, ঢাকা।

“শ্রীনলিনীভূষণ দত্ত, হাংসাং ওয়ারি, ঢাকা।

“গণেশচন্দ্র পাল, সাং কাওরাইদ, জিলা ঢাকা।”

১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসের ২০ শে তারিখ নারায়ণগঞ্জের সাবরেজেষ্ট্রারী অফিসে এই দলিল রেজষ্টরী হইয়াছে।

এই উইল কৃত হইলে, উইলে উল্লিখিত পুস্তকাবলী ব্যতীত এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল আমা কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে ;- হদিস পূর্ব্ববিভাগ ৫ম খণ্ড হইতে ১০ খণ্ড পর্য্যন্ত, এবং হদিস উত্তরবিভাগ প্রথম হইতে দ্বিতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত; এমাম হসন ও হোসয়ন; মহাপুরুষ মোহাম্মদ এবং তৎপ্রবর্ত্তিত ‘এসলাম ধর্ম্ম ; ধর্ম্মবন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য’; ধর্মসাধননীতি। সকল পুস্তক প্রচারভাণ্ডারের অর্থসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া মুদ্রিত করা গিয়াছে।”[১১৭]

ঠ. গিরিশচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত একজন নিরহংকারী মানুষ। পাঁচদোনার বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারের ছোটবাড়ির সন্তান হয়েও তাঁর চাল-চলনে, পোশাক-আশাকে জাঁকজমক বা আড়ম্বরপ্রিয়তা ছিল না। আচার ব্যবহারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ ও সাদাসিধে গোচের মানুষ। এতটুকু অহমবোধ, এতটুকু দাম্ভিকতা তাঁর চরিত্রকে স্পর্শ করেনি। তাঁর 'আত্ম-জীবন' বর্ণনায় আমরা সে আভাসই পাই- "আমি কৃতবিদ্য পণ্ডিত হই নাই, গরিবানা রূপে যৎকিঞ্চিত লেখাপড়া শিখিয়াছি, চিরকাল গরিবানা চালে চলিয়া আসিয়াছি।"[১১৮] তিনি এক টাকা/ দেড় টাকার চেয়ে বেশি মূল্যের জুতা কখনও চরণে স্পর্শ করেননি, শৈশবকালে তিন চার আনা মূল্যের তালতলার চটি জুতা ব্যবহার করতেন। তাও প্রায় সময়ই তোলা থাকত। তিনি প্রতিনিয়ত ব্যবহারের জন্য এক আনা / দেড় আনা মূল্যের কাঠের পাদুকাই ব্যবহার করতেন। কখনও কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেলে বেশি মূল্যের বিনামা জোড়া পরতেন। এভাবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জুতা ও খড়ম ব্যবহার করতেন বলে তাতে তিন চার বছর কেটে যেত। একবার তাঁর বড়দাদা মখমল বস্ত্রে জড়িত একজোড়া চটি জুতা তাঁর জন্য পাঠিয়ে দেন, তা পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। সে আনন্দের স্মৃতি তাঁর মনে অক্ষয় হয়েছিল। সে জুতা জোড়ার মূল্য ছয় আনার বেশি ছিল না। একসময় ঢাকাতে অবস্থানকালে তিনি কল্কাদার ঢাকাই চাদর ও বার্নিশ করা জুতা ব্যবহার করতেন। সে সময়ে যখন তিনি গায়ে চাদর জড়িয়ে ও পায়ে চকচকে জুতা পরে রাজপথে বের হতেন, তখন তিনি অহংকার বোধ করতেন। ছাত্রজীবনে তিনি সামান্য পিরান বা মির্জাই ব্যবহার করতেন, তাও সব সময় নয়। খাবার-দাবারের ব্যাপারেও তাঁর বিলাসিতা ছিল না। বিকেলে জলখাবারের জন্য তাঁর চিড়ে, মুড়ি, লাড়ু ইত্যাদি নির্দিষ্ট ছিল। বেশির ভাগ দিনই তিনি অর্ধ পয়সার মুড়ি দিয়ে বিকালের জল খাবার সারতেন। পরে তিনি মুড়ির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেজন্য একবছর মুড়ি খাওয়া পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি চা পান করতেন না এবং ছাত্রদের বাটিবাটি চা পান করাকে বিলাসিতা মনে করতেন। তিনি বলেন,

> "এখন ছাত্রগণ বাটি বাটি চায়ের জল পান করে, এবং সর্ব্বাঙ্গে সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া থাকে। এ সকল বিলাসিতার সঙ্গে আমার কখনও কোন সম্পর্ক ছিল না, এখনও নাই। বাল্যকালে চা কিরূপ বস্তু জানিতাম না, এখন অনেক পরিবারে চায়ের স্রোত চলিয়াছে, মেয়েরা পর্যন্ত পেট ভরিয়া চা-পানি পান করেন, কিন্তু আমাকে কেহ সহজে চা পান করাইতে পারেন না। তাহার গুণের শত গুণ বর্ণনা শুনিয়াও আমি মুগ্ধ হই না। আমি চায়ের বিরুদ্ধে অনেক সময় লেখনি চালনা করিয়াছি, তাহাতে চায়ের ভক্তগণ আমার প্রতি বিরক্ত। কিন্তু আমি রোগ বিশেষে ঔষধস্বরূপ চা পান করিয়া থাকি।"[১১৯]

গিরিশচন্দ্র নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করতেন। তিনি স্বহস্তে রান্না করে খেতেন। আজকাল স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিলাসিতা দেখে তিনি বিস্মিত হন। তাঁরা রান্নাবান্নায় একেবারেই অক্ষম। একবেলা রান্না করতে হলে তারা চারপাশে অন্ধকার দেখে। অনেকে উপবাস করতে রাজি কিন্তু রান্না করতে রাজি হয় না। আবার অনেকে রান্না করতে গেলে ভাতের মাড়ে হাত-পা পুড়িয়ে ফেলে কিংবা ডাল তরকারিতে লবণ

মসলার যোগ না করে সিদ্ধ না হতেই নামিয়ে ফেলে। শুধু যুবক ছাত্রদের নয় ছাত্রীদেরও একই দশা। প্রসঙ্গ ক্রমে ডালে ফোড়ন দিলে যে ঝাঁৎ করে শব্দ হয়, সে শব্দে তাঁর এক নাতনীর মূর্ছা যাবার উপক্রম হয় সে কথা বলেন। সে নাতনী ফোড়নের সময় দুই কর্ণে অঙ্গলি প্রবেশ করিয়ে রন্ধনশালা হতে দৌড়ে পালাত। এসব আদিখ্যেতা গিরিশচন্দ্রের কাছে অপছন্দনীয়। তিনি বাল্যকালে ও যৌবনকালে প্রতিদিন রান্না করে খেতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন'-এ বলেন,"আমি বাল্যকালে ও যৌবন কালেতে প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছি। তখন জাতিভেদের বড় আঁটা-আঁটি ছিল, এখন মুসলমানে রাঁধিলেও যেমন হিন্দুর চলে, তখন শূদ্র চাকরে রাঁধিলেও খাওয়া হইত না। পূর্ব্ববঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ সুলভ ছিল না, এখনও নয়। সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের কি আর পাঁচক রাখা ঘটিয়া উঠে? আমি যখন ছোট দাদার সঙ্গে ময়মনসিংহে স্থিতি করিতে ছিলাম, একবেলা তিনি রন্ধন করিতেন, এক বেলা আমি রাঁধিতাম।"[১২০]

গিরিশচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত মিতব্যয়ী মানুষ। বিলাস বহুল স্বেচ্ছাচারিতাকে কখনো সমর্থন করেননি। তিনি কখনো নিজের সুখ সুবিধার জন্য অর্থ শোষণ করে অভিভাবকদের ক্লেশ দিতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিতব্যয়ী। তাঁর শিক্ষাদীক্ষায় সব মিলিয়ে পৈতৃক সম্পত্তির দশ টাকাও ব্যয় হয়নি। সামান্য অর্থ ব্যয়ে লেখাপড়া শিখে তিনি সামান্য চাকুরি করেছেন এবং সেখান থেকেই কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করে প্রতিবছর বড়দাদার হস্তে সমর্পণ করতেন। সামান্যভাবে জীবন যাপন করা তাঁর চিরকালের অভ্যাস। তিনি সামান্য অন্নবস্ত্রাদিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। ব্রাশ বা চিরুনী দিয়ে তিনি কখনো কেশ বিন্যাস করেননি এবং আয়নাতে মুখাবলোকনও তাঁর জীবনে খুব একটা ঘটেনি।

আহারের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিরামিষ ভোজী। সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজী হওয়ায় তাঁর দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। সে সময় তাঁর স্ত্রী বর্তমান ছিলেন। তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থায় ডাক্তার তাঁর শরীরে আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে তাঁকে মাংস না হোক অন্তত মাছ খাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তা রক্ষা করেননি। নিরুপায় হয়ে ডাক্তার তাঁর স্ত্রীকে তাঁকে আমিষ জাতীয় খাবার খাওয়ানোর পরামর্শ দেন। এছাড়া তাঁর জীবন রক্ষা পাওয়া দুষ্কর বলে জানান। এতে তাঁর স্ত্রী ভয় পেয়ে যান। তিনি সে ডাক্তার বাবুর কথায় ভীত ও চিন্তিত হয়ে কাঁদ কাঁদ গলায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁকে অন্তত মাছ খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অগত্যা তিনি মাছ খাওয়া পুনরায় শুরু করেন।[১২১] স্ত্রীর প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। স্ত্রীর কথার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তিনি মৎসভোজন শুরু করেন বটে কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি আবার বৈরাগ্য জীবন বেছে নেন এবং মাছ খাওয়া পরিত্যাগ করেন। তিনি তাঁর 'আত্মজীবন'এ উল্লেখ করেন যে, চল্লিশ বছর যাবৎ তিনি মাছ / মাংস খাওয়া ত্যাগ করেছেন। তিনি মনে করেন, মাছ মাংস খাওয়া থেকে বিরত হওয়ায় তাঁর শরীরের মাংসের হ্রাস হয়নি ও বল ক্ষয় হয়নি। বরং মাংসবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয়েছে। শুধু ডাল চর্চরি ও ভাত খেয়ে ৭১/৭২ বৎসর বয়সে তিনি যেরূপ পরিশ্রম করতে পারেন, নিত্য মাছমাংসভোজী অনেক যুবকই সেরূপ পরিশ্রম করতে পারবেন না বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন মনে প্রাণে বাঙালি। তিনি বাংলাকে, বাঙালিকে ভালোবেসেছিলেন অকৃত্রিমভাবে। দেশকে ভালোবেসে বাঙালি হয়েই চিরদিন তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, বিদেশি গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো তাঁর কাছে ছিল অপছন্দনীয়। ষোল আনা বাঙালিয়ানা ছিল তাঁর চারিত্রিক স্বকীয়তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি

কখনো বিলাতি জুতা পায়ে স্পর্শ করেননি, কোনোদিন বিলাতি পোশাক পরেননি। তিনি ছিলেন নিরেট স্বদেশী, স্বদেশী বক্তৃতা শুনে তিনি স্বদেশী হননি। তিনি তাঁর অন্তরাত্মার উপদেশই চিরকাল মেনে চলেছেন। বাংলার বাঙালি হিন্দু মুসলিম উভয় জাতির প্রতিই তাঁর ছিল সমান দরদ। নববিধান সমাজের আচার্য দ্বারা আদিষ্ট হয়ে তিনি মুসলিম ধর্মগ্রন্থ ও মনীষীদের জীবনী নিয়ে কাজ করেন বটে কিন্তু তাঁর ধর্মীয় নিজস্বতা বজায় রেখেছেন সবসময়। এতটুকু কৃত্রিমতা তাঁর ছিল না। কাজের সুবাদে মুসলমানদের মতো তিনি কখনো শ্মশ্রুধারণ করতেন না, ইজার চাপকান পরতেন না, টুপি ধারণ করতেন না, এমনকি রসুন পলাণ্ডুর ভক্তও ছিলেন না। শুধু 'নববৃন্দাবন' নাটকে তিনি একবার মৌলবী সেজেছিলেন। তখন তিনি কিছুক্ষণের জন্য কৃত্রিম শ্মশ্রু ধারণ করেছিলেন এবং মৌলবীর পোশাক, টুপি ও ইজার চাপকান পরেছিলেন। নিজাম হায়দারাবাদে যখন উর্দু বক্তৃতা দেয়ার জন্য মুসলমানদের সভায় যাচ্ছিলেন, তখন সেখানকার কলেজের প্রফেসর ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীর অনুরোধে টুপি এবং ধুতির ওপর লম্বা চাপকান পরে সভায় গিয়েছিলেন। মুসলমানদের প্রতি তাঁর কতটা হৃদ্যতা ছিল তা রোকেয়া সাখাওয়াতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থেকেও বুঝা যায়। রোকেয়া তাঁকে 'মোসলমান ব্রাহ্ম' বলতেন। "তিনি আকৃতি প্রকৃতি ভোজ্য পরিচ্ছদ আচার ব্যবহারাদি দেখিয়া আমাকে মোসলমান ব্রাহ্ম বলেন নাই; আমি মোসলমান শাস্ত্রের আলোচনা করি, এবং মোসলমান জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া থাকি তজ্জন্য সেরূপ বলিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। তাঁহার সঙ্গে আমার মাতৃপুত্রসম্বন্ধ স্থাপিত। সেই মনস্বিনী মহিলা উক্ত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় নিজেই প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি আমাকে পত্রাদি লিখিতে পত্রে নিজের নাম না লিখিয়া নামের পরিবর্তে 'মা' বা 'আপনার স্নেহের মা' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। কিন্তু মাতা অপেক্ষা পুত্রের বয়ঃক্রম দ্বিগুণেরও অধিক, মাতার ২৬/২৭ বৎসর বয়ঃক্রম, পুত্রের ৭১/৭২ বৎসর বয়স।"[১২২]

গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন সত্যনিষ্ঠ এক বলিষ্ঠ পুরুষ। যেখানে তিনি মিথ্যার বেসাতি দেখেছেন সেখানে তিনি আতঙ্কিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনী রচনাতে ভ্রম এবং সত্যের অপলাপ হতে পারে ভেবে তিনি নিজেই 'আত্ম-জীবন' রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন' গ্রন্থের ভূমিকার এক পর্যায়ে লিখেছেন– খ্যাতিমান ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর পর সচরাচর সত্যকে অতিক্রম করে অতিরিক্ত বর্ণনা করা হয়। সত্যের প্রতি এতটুকু আদর থাকলে এই প্রকার ভাবুকতা ও কল্পনার প্রাধান্য হতে পারে না। তাই জগতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক, মিথ্যা ও কল্পনার স্রোত বন্ধ হয়ে যাক, এই ছিল তাঁর প্রার্থনা। নিজের জীবনের সত্য বর্ণনাতেও তিনি এতটুকু কুণ্ঠিত ছিলেন না। শৈশব ও কৈশোরের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি তাঁর সমাজের নৈতিক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছিলেন। তিনি লিখেছেন, তাঁর গ্রামে নারী পুরুষের কোনো নৈতিক আদর্শ ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর নিজ চরিত্রের নৈতিক স্খলনের কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁর চরিত্রে যে নীতির বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছিল তা তিনি অকুণ্ঠিত বলিষ্ঠতায় স্বীকার করেছেন। আবশ্যক হলে তিনি মিথ্যে কথা বলতেন, সুস্বাদু খাদ্য ও মিষ্টান্নাদি চুরি করে খেতেন, প্রয়োজন হলে অন্যান্য বস্তুও চুরি করতেন। এতে তাঁর কোনো পাপ বোধ ছিল না। তাঁর চারপাশের পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। তাঁদের আচার আচরণে– সৌন্দর্য, শালীনতা ও মার্জিত বোধের একান্ত অভাব ছিল। সবসময় তিনি চারপাশে কুকথা শ্রবণ করতেন ও কুদৃষ্টান্ত দর্শন করতেন। কুপ্রভাব ও কুচিন্তায় তাঁর অন্তর

কলুষিত হয়েছিল এবং চরিত্রের স্খলনও ঘটেছিল। সত্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ছিল বলেই জীবনের লুকায়িত সত্যগুলোকে তুলে ধরার দুঃসাহস তিনি দেখাতে পেরেছেন। বলা যায়, অকম্পিত হৃদয়ে জীবনের অপ্রিয় সত্যকে প্রকাশ করার দৃঢ় মনোবল তাঁর ছিল।

গিরিশচন্দ্র প্রতি বৎসর মাতৃদর্শনের জন্য পাঁচদোনা গ্রামে কিছুদিন অতিবাহিত করতেন। নারীদের উন্নতির জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরই ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁরই পরিবারস্থ মহিলাগণ হস্তাক্ষর, বাংলা রচনা, কাগজে কাটা ছবি ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন এবং অনেক পুরস্কার লাভও করেছিলেন। ময়মনসিংহে শিক্ষকতা করার সময় তারই উদ্যোগে মুড়াপাড়া জমিদারদের সহায়তায় পাঁচদোনা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কেশবচন্দ্রকে তিনি গুরু জ্ঞানে ভক্তি করতেন, তাঁর প্রতি ছিল তাঁর একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণ। তাই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করার পর যত বিদ্রোহ-আন্দোলন দানা বেঁধেছে সবসময় তিনি কেশবচন্দ্রকে সমর্থন করেছেন। এমনকি 'কোচবিহার বিবাহ' উপলক্ষে আন্দোলনবাদী আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি পর্যন্ত হয়েছিল কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তির এতটুকু নড়চড় হয়নি। তিনি আজীবন কেশবচন্দ্রের পক্ষে অবস্থান করেছেন, কেশবচন্দ্রের প্রত্যাদেশেও ছিল তাঁর গভীর আস্থা। মানবিকতা, প্রগতির প্রবহমানতা, যুগ-প্রয়োজনীয়তা সব কিছু তিনি অস্বীকার করেছেন উগ্রবাদী কেশব ভক্ত হয়ে। এখানে এসে তাঁর চেতনার সীমাবদ্ধতা সুপরিস্ফুট। গিরিশচন্দ্র ধর্মীয় ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন গোঁড়া শাক্ত, পরবর্তী জীবনে হয়েছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্ম। তাঁর নাতনি প্রিয়বালা আত্মজীবনী মূলক রচনা 'স্মৃতিমঞ্জুষায়' গিরিশচন্দ্রের গোঁড়ামি সম্পর্কে বলেন,-

"ছোটছোট দুখানা রামরাজা ও দুর্গার ছবি ঘর সাজাবার উৎসাহে দাদা মশায়ের ঘরে টানিয়ে রেখেছিলাম। দাদা মশাই তখন ঘুমুচ্ছিলেন। দুপুরবেলা যখন তিনি ঘুমুচ্ছিলেন সে সময় তার পায়ের দিকের দেয়ালে ছবি দুখানা মহা উৎসাহে টাঙিয়ে দূর থেকে বার বার করে দেখে নিজের কৃতিত্বে নিজেই গর্বিত হয়ে নিজেদের ঘরে সবে ফিরে এসেছি। ঘুম থেকে উঠে দাদা মশাই ছবি দুখানার কত প্রশংসা করবেন এইসব ভাবছি। 'বৌমা!'- ওরে বাবা এ যে একেবারে বাজ পড়ার মত আওয়াজ আসছে ওঘর থেকে! ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেছি। 'শিগগিরি এসো! যতো সব-!' মা ত ত্রস্ত ব্যস্তে ছুটে গিয়েছেন- 'কী বলছেন?' বলছি আমার মাথা আর মুন্ডু। কে নিয়ে এসেছে এই দুটো? নিয়ে যাও শিগগির এ ঘর থেকে। ওসব পুতুল টতুলগুলো তোমাদের ঘরে সাজিয়ে রাখগে ছাই! শিগগির নিয়ে যাও!' শ্রী মুখের সেকি বাণী? ... মনে মনে আমার খুব রাগ হয়েছিল। কি বলবো, ও দুটো ত ঠাকুর-দেবতার ছবিই ছিল, তবে তিনি এত রাগ করলেন কেন? দাদামশাইদের ধর্মের প্রতি ছিল এমনি গোঁড়ামি।"[১২৩]

গিরিশচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, অত্যন্ত সাধারণ, সাদাসিধে, চির-অভ্যস্ত, গতানুগতিক জীবনাচরণকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। উদার মানবিকতায় ব্রাহ্মধর্মকেই জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। আজীবন নারীর কল্যাণ কামনা করেছেন, শিক্ষাদীক্ষায় তাঁদের অগ্রযাত্রাকে তরান্বিত করতে চেয়েছেন। জন্মস্থান পাঁচদোনার প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ দরদ। পাঁচদোনার উন্নতি কল্পে তিনি তাঁর স্থাবর-

অস্থাবর সম্পত্তির একটি অংশ দান করেছেন। মাতৃভূমি পূর্ববঙ্গের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। পূর্ববঙ্গের উন্নয়ন হোক, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁরা এগিয়ে যান এটি তিনি মনে-প্রাণে চেয়েছেন। সেজন্যই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর এ উন্নত মানস প্রেরণায় কোনো বৈপ্লবিক চিন্তা চেতনার অবকাশ তাঁর ছিল না, নতুনকে গ্রহণ করার ঔদার্যও তাঁর ছিল না। উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন একান্তই ব্রাহ্মধর্মের একনিষ্ঠ সেবক। শাণিত বুদ্ধি, যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাব আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে কোনো কিছু বিচার বিশ্লেষণ করা এবং তার গ্রহণ যোগ্যতা যাচাই করা গিরিশচন্দ্রের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। কেননা তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, জীবনবোধ এবং চিন্তা-চেতনাকে তিনি ধারণ করেননি। যুগমানসকে তিনি লালন করতে পারেননি। অভ্যস্ত জীবনাচরণেই তিনি করেছেন কালাতিপাত।

ঙ. পরলোক গমন

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন সুস্থ, সবল, নীরোগ দেহের অধিকারী। 'আত্ম-জীবন' এর বর্ণনানুযায়ী তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে- শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকালে কোনো বড় ধরনের অসুখে পতিত হননি। সবল দেহ ও মনে তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি বিপর্যয়কে মোকাবিলা করেছেন। কখনো রোগে-শোকে কাতর হননি। খাদ্যাভ্যাসের বিলাসিতা তাঁর ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আজীবন একবেলা নিরামিষ ভাত, তরকারী, আর একবেলা অন্য কিছু খেতেন।...চা চুরুট কোনো নেশা ছিল না।[১২৪] ধর্মজীবনে প্রতিদিন প্রত্যূষে নিয়মিত উপাসনা করতেন। ঈশ্বরের প্রতি ধ্যানে জ্ঞানে মগ্ন ছিলেন। সংসার বিবাগী সর্বত্যাগী ব্রাহ্মের জীবন তিনি বেছে নিয়েছিলেন। প্রাপ্তি কিংবা প্রত্যাশার মায়াজাল তাঁকে আবিষ্ট করতে পারেনি। ধর্ম সাধনাকে কর্ম জীবনের অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। নিরলস পরিশ্রমে সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু যখন বয়স হয়েছে, বার্ধক্য এসেছে "দেহ কোষ ও রক্তের স্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ডে এসেছে শৈথিল্য। এবার রোগেরা বেড়াজাল বিস্তার করে তাঁকে আক্রমণ করেছে।"[১২৫] ১৯০০ সালের দিকে মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে Erysipelas বা বিসর্প রোগে আক্রান্ত হন। লাহিরিয়া সরাই নগরে ডিপুটি কালেক্টর ব্রাহ্মবন্ধু শ্রী ব্রহ্মদেব নারায়ণ মহাশয়ের বাড়িতে অবস্থান কালে তাঁর বাম পায়ে এ রোগের সঞ্চার হয়। এ রোগের ফলে পায়ে বিষম ক্ষত হয়েছিল এবং পা ফুলে অত্যন্ত স্ফীত হয়ে উঠেছিল। এ রোগ তাঁর পায়ে দেখা দিলে দ্বারভাঙা মহারাজের হাসপাতালে প্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনচন্দ্র তাঁর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। প্রায় চার মাইল দূর হতে এসে তিনি প্রতিদিন গিরিশচন্দ্রকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যেতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে গিরিশচন্দ্র আরও অসুস্থ হতে থাকেন। তিনি পা নাড়াচাড়াতে নিতান্ত অক্ষম এবং শক্তিহীন হয়ে পড়েন। টেলিগ্রাফ পেয়ে কলকাতা হতে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং শ্রীমান যোগানন্দ রায় দুজনে একত্রে তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য লাহিরিয়া সরাইয়ে আসেন। ব্রাহ্ম ভাইদের সেবা শুশ্রূষায় তাঁর পায়ের কিছুটা উপশম হয়। এরপর তাঁরা আরানগরে ডি. কালেক্টর কে.জি. গুপ্তের বাসায় অবস্থান করেন। কে.জি গুপ্তের স্ত্রীর সেবাযত্ন আর সেখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন নৃত্যগোপাল মিত্রের চিকিৎসায় অনেক ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করে প্রায় দুই মাস পর তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেন।

এরপর অতিবাহিত হয় বেশ কয়েকটি বছর। Erysipelas রোগমুক্ত হয়ে তিনি আবার মহোৎসাহে ধর্মসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। একাধারে প্রচারকার্য ও রচনাদিতে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯১০ সালে মাঘোৎসবের সময় কলকাতা নগরে অবস্থান কালে নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। তখন বগুড়া জেলার সিভিল সার্জন রায় বাহাদুর শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় তিন মাসের ছুটিতে কোলকাতায় অবস্থান করছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ রোগে তাঁর জীবনসংশয় হয়েছিল। সংশয়াপন্ন জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে-

> "সেই রোগে আমার জীবন সংশয় হইয়াছিল। আামি এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, নিজে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারিতাম না; এক বিন্দু দুগ্ধ গলাধঃকরণ করিতে কষ্টবোধ

করিতাম; মাসাধিকাল শয্যাগত ছিলাম। কিন্তু রোগের আক্রমণ হইতেই আমি অন্তরে এরূপ এক অশব্দ বাণী শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, 'ভয় নাই, এবার মরিবে না, আরও কিছুদিন বাঁচিবে ও কাজ করিবে।'"[১২৬]

অন্তরাত্মার অভয় বাণীতে রোগশয্যাতেও তিনি তাঁর শারীরিক কষ্ট ও ক্লেশ ভুলে গিয়েছিলেন। অতিশয় নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্ল মনে পরবর্তী জীবনের প্রত্যাশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এ উজ্জীবিত হওয়াকে নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপের দপ্ করে জ্বলে উঠার সাথে তুলনা করতে পারি। কেননা তাঁর রোগের অবস্থা দেখে ডাক্তার ভীত ও চিন্তিত ছিলেন।

নিউমোনিয়া রোগে তিনি এতটাই কাতর ছিলেন যে, খাবার খাওয়ার শক্তিও তাঁর ছিল না। মেয়েরা Feeding cup দিয়ে সযত্নে গলায় দুধ ঢেলে দিত, তৃষ্ণায় মুখ শুকিয়ে আসলে মুখে আঙ্গুর রস অর্পণ করত। সেবিকাদের সেবাযত্নে তিনি তাঁর মায়ের আদর স্নেহ স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন। মায়ের পরম স্নেহ ভালোবাসার স্পর্শ এতটা নিবিড় করে এর আগে তিনি কখনোই উপলব্ধি করেননি। কখনো কখনো তাঁর মনে হতো দেহ হতে আত্মা স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিরাজ করছে। আর শরীর বিগত প্রাণ হয়ে শয্যায় পড়ে আছে। অসুস্থতার কারণে তিনি নিজে মন স্থির করে উপাসনা করতে পারতেন না। কোনো ব্রাহ্মবন্ধু এলে তাঁকে প্রার্থনা করতে অনুরোধ জানাতেন এবং সে প্রার্থনার সঙ্গে একাত্ম হতেন। সে মহাসঙ্কট অবস্থাতেও তিনি ডাক্তারের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করতেন।

মাস খানেক পরে কিছুটা সুস্থ হলে ফাল্গুন মাসে বায়ু পরিবর্তনের জন্য পালামোতে যান। তখন ডাক্তার নবীনচন্দ্র দত্ত পালামোর সিভিল সার্জন ছিলেন। পণ্ডিত তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে গিরিশচন্দ্র পালামোতে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে অবস্থান করেন। ডাক্তার বাবুর আতিথ্য ও সেবায় তাঁর বাড়িতে মাস খানেক থেকে সুস্থ ও সবল দেহে কলকাতায় ফিরে আসেন। গিরিশচন্দ্র সেনের অন্তিম অবস্থা সম্পর্কে সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,

"১৯০৮-১৯০৯ খৃ: তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং হৃদরোগ দেখা দেয়। ধর্মবন্ধুগণ ও প্রচারাশ্রমের যুবকেরা তাঁহার সেবার জন্য ব্যস্ত হন। শ্রদ্ধেয় রায়বাহাদুর ডা: মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে নিজের পরিবারে কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে এনে সেবা শুশ্রূষা করেন। ভাই গিরিশচন্দ্রের ভাগিনেয় স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত আই.সি.এস কোন্নগরে গঙ্গার ধারে এবং পুরীতে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিছুতেই বিশেষ উপকার হইল না। তখন ভাই গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন যে এই রোগ আর সারিবার নয়, পরলোক হইতে আহবান আসিয়াছে। তাঁহার অন্তরে স্বদেশ প্রেম ছিল প্রবল। তিনি স্বদেশ ঢাকায় শেষ দিনগুলি কাটাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।"[১২৭]

স্বদেশের প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমত্ববোধ। স্বদেশ আর স্বদেশের মানুষকে ভালোবেসে তাঁদের কোলে মাথা রেখেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর প্রায় মাস খানেক আগে তাঁকে ঢাকা শহরে আনা হয়েছিল। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। চিরচেনা পরিবেশে আত্মীয়তার স্পর্শ যেন তাঁর অন্তরাত্মাকে সজীব করে তুলেছিল। মৃত্যু ভাবনা সে

সজীবতাকে এতটুকু মলিন করতে পারেনি। পরিশেষে ১৫ আগস্ট ১৯১০ খ্রি. (৩০ শ্রাবণ) সকাল দশটায় জন্মভূমির মাটিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আর এভাবেই শেষ হয় এক সর্বত্যাগী সংসার বিবাগী ধর্মযাযকের জাগতিক জীবন কাহিনি। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'নব্যভারত' পত্রিকা তাঁর মূল্যায়নে বলেন,"নববিধান বাঁচিয়া থাকে যদি, তবে গিরিশচন্দ্র অমর; বাঙ্গালাভাষা বাঁচিয়া থাকে যদি, গিরিশচন্দ্র অমর; মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র বাঁচিয়া থাকে যদি, তবে গিরিশচন্দ্র অমর এবং নির্ভয়ে লিখিতেছি, পুণ্য, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, ভক্তি, চরিত্র এবং স্বদেশপ্রেম বাঁচিয়া থাকে যদি, তবে গিরিশচন্দ্র অমর! অমর-জীবনের অমর কাহিনী পাঠক নিবিষ্ট-চিত্তে একবার অধ্যয়ন কর, জীবন সার্থক হইবে।"[১২৮] মানুষের কল্যাণ ও এক ঈশ্বরের আরাধনাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। অবিশ্বাস্য মানসিক শক্তি, অবিচল কর্তব্য নিষ্ঠা, কঠোর অধ্যবসায়, গভীর গুরু ভক্তি তাঁর জীবনকে মহিমাময় করেছিল। জীবন ও জগতের মহৎ কর্মযজ্ঞে একেশ্বরবাদী ধারণায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে মহান দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছিলেন তা মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও তাঁকে অমরত্বের আস্বাদ দিয়েছে। মহাকালের জাগতিক পথ পরিক্রমায় গিরিশচন্দ্র চিরদিন শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবেন।

তথ্যসূত্র

১. গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর জন্মসন নিয়ে সংশয়ান্বিত ছিলেন। তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন'এ বলেন, "১৩১৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৭১ বা ৭২ বছর হইয়া থাকিবে। বহুকাল হইল আমার জন্মপত্রিকা হারাইয়া গিয়াছে, আমি নিজের বয়স নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চয় ৭০ অতীত হইয়াছে। মা বলিয়াছেন, আমি বৈশাখ মাসে মঙ্গলবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কোন্ সালের বৈশাখ মাসে এবং বৈশাখ মাসের কোন্ তারিখে জন্মিয়াছিলাম; তিনি আমাকে বলেন নাই, আমিও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হই নাই, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে তখন প্রয়োজনবোধ হয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলেও যে, তিনি সন তারিখ বলিতে পারিতেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। জন্মবার মঙ্গলবার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জন্মবারে কোথাও যাত্রা করিতে নাই, যাত্রা করিলে অমঙ্গল হয় ভাবিয়া মাতৃদেবী মঙ্গলবারে বিদেশে আমাকে যাত্রা করিতে দিতেন না। আমি বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বড়দিদী ছোটদিদী প্রভৃতি সকলেই বলিয়াছেন, উহা নিশ্চিত।" *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; খণ্ড-৩ প্র. প্র. মার্চ ২০০৩; গিরিশচন্দ্রের জীবনীকাল ১৮৩৫-১৯১০ সাল উল্লেখ আছে। বাংলা একাডেমি ; *চরিতাভিধান*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭-এ গিরিশচন্দ্রের জন্মমৃত্যু ১৮৩৫-১৯১০ পাওয়া যায়।

২. প্রিয়বালা গুপ্তা; স্মৃতি মঞ্জুষা; দে'জ পাবলিশিং কলকাতা; প্র. প্র. ডিসেম্বর, ১৯৯৯; পৃ.-৪।

৩. রণজিৎ কুমার সেন; মওলানা ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; ৩৭,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি,২০০২, পৃ.-১১।

৪. সরকার আবুল কালাম সম্পাদিত; অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থের; মহেশ্বরদীর ইতিহাস; বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; প্রকাশকাল-১৪ এপ্রিল, ২০১৪; পৃ.-১৮০।

৫. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; আত্ম-জীবন; কলিকাতা; ১৩১৩ সাল ২২ পৌষ; পাদটীকা; পৃ.-২।

৬. ঐ; পৃ.-২।

৭. ঐ; পৃ.-২-৩।

৮. প্রিয়বালাগুপ্তা; প্রাগুক্ত; পৃ.-৪।

৯. উদ্ধৃত; রণজিৎ কুমার সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৪।

১০. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত ; পৃ.-৩।

১১. ঐ; পৃ.-৩-৪।

১২. ঐ; পৃ.-৫।

১৩. ঐ; পৃ.- ৬-৭।

১৪. প্রিয়বালা গুপ্তা; প্রাগুক্ত ; পৃ.-৭।

১৫. ড. সফিউদ্দিন আহমদ; *কোরানের প্রথম অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*; বিশ্বসাহিত্য ভবন; ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০; প্র.প্র. বইমেলা ২০১২ ; পৃ.-৩৬।

১৬. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত ; পৃ.-১-২।

১৭. আবুল আহসান চৌধুরী ; ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; বাংলা একাডেমি ঢাকা; প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি-১৯৮৯; পৃ.-১৪।

১৮. ড. সফিউদ্দিন আহমদ; প্রাগুক্ত; পৃ.-৪১।

১৯. রণজিৎ কুমার সেন; প্রাগুক্ত ; পৃ.-২০।

২০. রঞ্জন গুপ্ত ; *ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:,৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা; প্রথম

সং. জানুয়ারি ২০০৯; পৃ.-৩৯-৪০।

২১. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত; পৃ- ১৫।

২২. ঐ; পৃ.-১২।

২৩. ঐ; পৃ.-১৪।

২৪. ঐ; পৃ.-১৬-১৭।

২৫. রঞ্জন গুপ্ত ; প্রাগুক্ত ; পৃ.-৫৭।

২৬. প্রিয়বালা গুপ্তা; প্রাগুক্ত; পৃ.-৩১-৩।.

২৭. ঐ; পৃ.-৩২।

২৮. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ; প্রাগুক্ত; পৃ.-২৪।

২৯. রঞ্জন গুপ্ত; প্রাগুক্ত; পৃ.-৫৯।

৩০. আবদুল হক সম্পাদিত ; কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী; বাংলা একাডেমী ; ঢাকা; দ্বিতীয় খণ্ড; প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর ১৯৮৬; পৃ.-২০৭.

৩১. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.-৩১-৩২।

৩২. ঐ; পৃ.-৩৩।

৩৩. ঐ; পৃ-৩৪।

৩৪. ঐ; পৃ.-৩৫-৩৬।

৩৫. ঐ; পৃ.-৩৬।

৩৬. প্রিয়বালা গুপ্তা; প্রাগুক্ত; পৃ.-৩৫।

৩৭. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ; প্রাগুক্ত; পৃ.-৩৯।

৩৮. ড. সফিউদ্দিন আহমদ; প্রাগুক্ত; পৃ.-৪৭।

৩৯. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.-২২।

৪০. ঐ; পৃ.-২৩-২৪।

৪১. ঐ; পৃ.- ২৬-২৭।

৪২. ঐ; পৃ.-২৮।

৪৩. ঐ; পৃ.-৩০।

৪৪. ঐ; পৃ.-৪২।

৪৫. ঐ ; পৃ.-৪৩।

৪৬. ঐ; পৃ. ৪৫-৪৬।

৪৭. রঞ্জনগুপ্ত; প্রাগুক্ত; পৃ.-৭৮।

৪৮. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.- ৬৫-৬৬।

৪৯. ঐ; পৃ.-৬৮।

৫০. রঞ্জনগুপ্ত; প্রাগুক্ত; পৃ.-৯৫।

৫১. ঐ; পৃ.- ৯৭।

৫২. উদ্ধৃত; বারিদবরণ ঘোষ; ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; দ্বিতীয় সংস্করণ ও প্রথম নিউ এজ প্রকাশনা ২০০৯; ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা; পৃ.-১০৫।

৫৩. আবদুর রাউফ ও অন্যান্য সম্পাদিত ; *রোকেয়া রচনাসংগ্রহ* ; বিশ্বকোষ পরিষদ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি ,২০০৮ ; পৃ.- ১৬।

৫৪. ভারতী রায় সংকলিত ও সম্পাদিত; *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা*; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা; দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল-২০১২; পৃ.-৬৬।

৫৫. প্রসাদরঞ্জন রায় সম্পাদিত ; *রাজারামমোহন রচনাবলী*; হরফ প্রকাশনী; কলেজ স্ট্রীট মার্কেট; কলকাতা- ৭০০০০৭; প্র. প্র. ডিসেম্বর ২০০৮ ; পৃ.-২৩৫।

৫৬. প্রবীর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত; বাঙালির শিক্ষাচিন্তা; তারাশঙ্কর তর্করত্ন (শর্মা); নির্বাচিত লেখাপত্র; প্রথম খণ্ড : প্রথম ভাগ; ২০ কেশব সেন স্ট্রিট; দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩; পৃ.-৪৯।

৫৭. সোনিয়া নিশাত আমিন; নারী ও সমাজ; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত ; বাংলাদেশের ইতিহাস; তৃতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; দ্বিতীয় প্রকাশ ফ্রেব্রুয়ারি ২০০০; পৃ.-৭১১।

৫৮. বিনয় ঘোষ; বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ; ওরিয়েন্ট ব্লাকসোয়ান প্রাইভেট লি. ২০১১; পৃ.-২১২-২১৩।

৫৯. ছবি বসু (রায়) ; বাঙলার নারী আন্দোলন; দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩; প্রথম দে’জ সংস্করণ:আগস্ট ২০১২; পৃ.- ৩৫।

৬০. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়; *উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য;* ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা; প্র. প্র. জুলাই ১৯৯৯; পৃ.-১৩।

৬১. উদ্ধৃত; প্রবীর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত; *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা*; প্রাগুক্ত; পৃ.- ৫৪।

৬২. স্বপন বসু; *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*; পুস্তক বিপণি; ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯; পঞ্চম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০১৪; পৃ.-১৭৪-১৭৫।

৬৩. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৬।

৬৪. বিনয়ঘোষ; প্রাগুক্ত; পৃ.-২১১।

৬৫. উদ্ধৃত; রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৯।

৬৬. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৭।

৬৭. ঐ; পৃ.-১৭-১৮।

৬৮. ঐ; পৃ.-৬১।

৬৯. উদ্ধৃত; ঐ; পৃ.-২০।

৭০. ঐ; পৃ.-৮২-৮৩।

৭১. প্রিয়বালা গুপ্তা; প্রাগুক্ত; পৃ.-৩৭।

৭২. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.- ৫২-৫৩।

৭৩. ঐ ; পৃ.-৫৩।

৭৪. ঐ; পৃ.-৫৪-৫৫।

৭৫. ঐ; পৃ.-৫৬।

৭৬. বিপিনচন্দ্র পাল; নবযুগের বাংলা; পরিবর্ধিত পরিমার্জিত চিরায়ত সংস্করণ আগস্ট ২০১২; চিরায়ত : ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা; পৃ.-৮৮-৮৯।

৭৭. উদ্ধৃত; লক্ষ্মীনারায়ণ রায়; ব্রাহ্মধর্মের পরম্পরা ও ইতিবৃত্ত ; প্রথম প্রকাশ; কলকাতা বইমেলা, ২০০৪; পৃ.-১১০।

৭৮. উদ্ধৃত ; ঐ; পৃ.-১১৪।

৭৯. উদ্ধৃত ; ঐ; পৃ.-১১১।

৮০. বারিদবরণ ঘোষ; প্রাগুক্ত; পৃ.-৭৬।

৮১. উদ্ধৃত ; ঝরা বসু; কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ; ৫২/২ই, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা; দ্বিতীয় মুদ্রণ:১লা বৈশাখ, ১৪২০; পৃ.-৮০।

৮২. উদ্ধৃত; শিবনাথ শাস্ত্রী; আত্মচরিত; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; ২১১ বিধান সরণি, কলিকাতা; পুনর্মুদ্রণ ২০০০; পৃ.-১৮১।

৮৩. ঐ; পৃ.-১৮১, পাদটীকা-১।

৮৪. উদ্ধৃত ; ঝরা বসু; প্রাগুক্ত; পৃ.-৮১।

৮৫. ঐ; পৃ.-৮২।

৮৬. শ্রীনাথ চন্দ; ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর; ভারত মহিলা প্রেস, ঢাকা; ১৯১১ সালে প্রকাশিত; পৃ.-১৯৩-১৯৪।

৮৭. ঐ; পৃ.-১৯৭-১৯৮।

৮৮. ঝরা বসু; প্রাগুক্ত; পৃ.-৮৪।

৮৯. বারিদবরণ ঘোষ; প্রাগুক্ত; পৃ.-৯১।

৯০. শ্রী বারিদবরণ ঘোষ; সাহিত্য সাধক-শিবনাথ শাস্ত্রী; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত; পরিশিষ্ট ক; পৃ.-৩০৭।

৯১. ভাই গিরশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.-১০৩।

৯২. ঐ; পৃ.-১০৩।

৯৩. ঐ; পৃ.- ১০৪।

৯৪. শিবনাথ শাস্ত্রী; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৮১-১৮২।

৯৫. শ্রীনাথ চন্দ; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৯৬।

৯৬. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.-১১০।

৯৭. ঐ; পৃ.-১১২।

৯৮. ঐ; পৃ.- ১১২-১১৩।

৯৯. ঐ; পৃ.-১১৫।

১০০. ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য; *বাংলাদেশের ইতিহাস*; ৫,বাংলাবাজার, ঢাকা; ষষ্ঠ সংস্করণ; মে ১৯৯৭; পৃ.-৪৫৩।

১০১. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত; *বাংলা পিডিয়া*; ৬ষ্ঠ খণ্ড; বাংলাদেশ এশিয়াটিকসোসাইটি; প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০০৩; পৃ.-২০২।

১০২. উদ্ধৃত; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক; *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ জুন-২০০৯; পৃ.-১১৮।

১০৩. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত; *বাংলা পিডিয়া*; ৬ষ্ঠ খণ্ড; প্রাগুক্ত; পৃ.-২০৩।

১০৪. উদ্ধৃত; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক; প্রাগুক্ত; পৃ.-১১৬।

১০৫. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য; প্রাগুক্ত; পৃ.-৪৫৭।

১০৬. উদ্ধৃত; কঙ্কর সিংহ; *সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট*; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ; বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; দ্বিতীয় সংস্করণ এবং প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭; পৃ.-১৯।

১০৭. সুপ্রকাশ রায়; *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*; তৃতীয় র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ; কলকাতা; আগস্ট ২০১৩; পৃ.-১১৫।

১০৮. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৩১।

১০৯. ঐ; পৃ.-১১৯-১২০।

১১০. ঐ; পৃ.-১২০।

১১১. ঐ; পৃ.-১৪৪।

১১২. ঐ; পৃ.- ১৩৬-১৩৭।

১১৩. ঐ; পৃ.-৫০।

১১৪. ঐ; পৃ.-১২৪।

১১৫. ঐ; পৃ.-১৪৩।

১১৬. ঐ; পৃ.-৫৯-৬০।

১১৭. ঐ ; পৃ.-৬০–৬৫।

১১৮. ঐ; পৃ.-১২।

১১৯. ঐ: পৃ.-১২।

১২০. ঐ: পৃ.-১৩।

১২১. ঐ; পৃ.-৪৯।

১২২. ঐ; পৃ.-৫০-৫১।

১২৩. প্রিয়বালা গুপ্তা; প্রাগুক্ত; পৃ.-৩৮-৩৯।

১২৪. ঐ ; পৃ.-৩৫।

১২৫. ড. সফিউদ্দিন আহমদ; প্রাগুক্ত ; পৃ.-২৫৭।

১২৬. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন;প্রাগুক্ত; পৃ.-৯৮।

১২৭. উদ্ধৃত; আবুল আহসান চৌধুরী; প্রাগুক্ত; পৃ.-৩৪।

১২৮. উদ্ধৃত; ঐ; পৃ.-৩৫।

তৃতীয় অধ্যায় : ব্রাহ্মসমাজ ও গিরিশচন্দ্র সেন।

ক. ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস

জীবনের বৈচিত্র্যময় পথ পরিক্রমা শেষে ১৮১৪ সালে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বিশ্বজনীন বিশ্বাসে যুক্তিবাদের আলোকে বাঙালির কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জরাজীর্ণ, সনাতনপন্থী জীবনযাত্রা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের আরাধ্য চেতনার শাণিত ঔজ্জ্বল্যে তিনি বাঙালিকে আধুনিক জীবনবোধের আলোকে অবগাহন করাতে চেয়েছিলেন। মাত্র পনেরো বছর /১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত (অর্থাৎ রংপুর থেকে এসে কোলকাতায় বসতি আরাম্ভ ও বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত) ছিল তাঁর ধর্ম ও কর্মজীবনের বর্ণাঢ্য পরিসর। চল্লিশ বছর বয়স পার করে পরিপক্ব মেধা-মননে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রয়াসে তিনি এগিয়ে আসেন।[১] মানব-মুক্তি তথা ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-বৌদ্ধিক-নৈতিক-শিক্ষামূলক ও নারীকল্যাণ কামনায় ব্যাপ্ত ছিল তাঁর মানসলোক। অথচ তিনি জন্মেছিলেন এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা রামকান্ত রায় অসম্ভব গোঁড়া, ঈশ্বর বিশ্বাসী, মূর্তিপূজায় আসক্ত মানুষ। মাতা তারিণী দেবী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, রক্ষণশীলা ও দেবদ্বিজে নিবেদিত প্রাণা। অত্যন্ত রক্ষণশীল গোঁড়া পরিবারের সন্তান রামমোহনের শিক্ষারম্ভ হয়েছিল গুরু মহাশয়ের পাঠশালায়। এরপর ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠী ও মৌলবীদের কাছে আরবি ফারসী শিক্ষা লাভ করেন। নয় বছর বয়সে পাটনা সাহেবে ফারসি শিক্ষার জন্য যান। সেখানে গিয়ে তিনি আরবি শিক্ষারও দুর্লভ সুযোগ পান। আরবি শেখার প্রয়োজনে তিনি গ্রিক থেকে আরবিতে অনূদিত প্লেটো এরিস্টটল প্রভৃতির দার্শনিক রচনাবলি, ইউক্লিডের জ্যামিতি, টোলেমির ভূগোল ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। সে সময়ে তিনি আরবিতে লেখা অষ্টম নবম শতাব্দীর যুক্তিবাদী সম্প্রদায় মুতাফাল্লিমিনদের রচিত মুতাজিলা দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এ সময় তাঁর মনোজগতে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। এমনকি তাঁর চলন, বলন, পোশাক-আশাকেও পরিবর্তন আসে। তারপর তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করার জন্য বারানসীতে যান- "বারাণসীতে বেদ-বেদান্ত পাঠ করে রামমোহন দেখলেন ইসলামের ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধীয় ধারণার সঙ্গে বেদ-বেদান্তে বর্ণিত সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধীয় ধারণার মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য। উভয় শাস্ত্রেই ঈশ্বর এক ও নিরাকার রূপে উপলব্ধ।"[২] স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্যকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চাইলেন। আর তখনই সম্ভবত তাঁর চেতনায় একেশ্বরবাদের ধারণার জন্ম হয়। একেশ্বরবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮০৩ সালে মুর্শিদাবাদ অবস্থানকালে তিনি 'তোহফাতুল মুওয়াহহেদিন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর অর্থ হলো একেশ্বরবিশ্বাসীদের জন্য উপহার। এটি লিথো প্রেসে মুদ্রিত হয় বলে অনুমান করা হয়। "এছাড়া 'আরবি ভাষায় 'মন্‌জারাত্‌-উল্‌-আদিয়ান' নামে একটা বড়ো কিতাব লিখেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। তুহ্‌ফাৎ-এ যা সংক্ষেপে বলতে গিয়ে অস্পষ্ট হয়েছিল তা এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখিত হয়েছিল বলে জানা যায়।"[৩] তোহফাতুল গ্রন্থ রচনায় তাঁর উপলব্ধজাত স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভিব্যক্তিতে বিভেদ বিভাজনকে তিনি অলীক, অপাংক্তেয় বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মতে, ঈশ্বরের অখণ্ড অনুভবকে খণ্ড খণ্ড সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে অবসিত করা

না হলে এদেশবাসীর উন্নয়ন অসম্ভব। তিনি তাঁর ‘তোহফাতুল মুওয়াহহেদিন’ এ বলেন, “প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ গুণবিশিষ্ট এক বা বহু দেবতার দিকে আকর্ষণ, এবং কোন বিশেষ উপাসনা বা পূজা প্রণালীর বশবর্ত্তী হওয়া,– এ সমস্তই বাহ্য লক্ষণ, যেগুলি অভ্যাস ও দলগত শিক্ষা থেকেই উদ্ভূত। এ সকলেই বাইরের জিনিষ–অবান্তর গুণ মাত্র।”[৪] ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরে, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ও আচার প্রণালী পর্যবেক্ষণ করে তিনি এ বিশ্বজনীন বিশ্বাসকে ধারণ করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, পৃথিবীর সকল ধর্মই সৃষ্টির আদিকারণ ও তার বিধাতা বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে এক পরমসত্তাকে বিশ্বাস করে। শুধু বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে পার্থক্য বিদ্যমান। সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বাসগত প্রণোদনায় প্রতিটি মানুষের মধ্যেই পরমসত্তারূপী স্রষ্টার প্রতি আত্মগত আকর্ষণ বোধ থাকে– এটি প্রত্যেক ধর্মের একটি সত্যতম অনুভূতি। ইহুদি, খ্রিস্ট, ইসলাম, সনাতনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমতে সমস্ত জগৎ সংসার এবং সৃষ্টি কুলের স্রষ্টা একজনই মাত্র, তিনি এক ও অদ্বিতীয়।[৫] ১৮০৫ সালে ডিগবি যখন রামগড়ের ম্যাজিস্ট্রেটের রেজিস্টার পদে নিযুক্ত হন রামমোহন তখন তাঁর ব্যক্তিগত মুনশী পদে যোগদান করেন। ডিগবির সঙ্গে তিনি প্রায় নয় বছর অতিবাহিত করেন। তাঁর সংস্পর্শে থাকাকালে ইংরেজি তথা পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে রামমোহন পরিচিত হন। একদিকে, সুফী ও মুতাজিলাদের বে-শরা বা শাস্ত্র বহির্ভূত চিন্তাধারা অন্যদিকে, খ্রিস্ট ধর্ম এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব রামমোহনকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন মানুষে পরিণত করল। এক নব্য আলো রামমোহনের চিন্তার জগৎকে করে তুলল পরিপক্ব এবং মানবিক। যার ফলে তিনি বেদ ও উপনিষদের আলোকে যুক্তি শাস্ত্রের বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক তথাকথিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। রাজা রামমোহন সেই প্রাচীন ঋষিপন্থার অনুসরণ করে আধুনিক সময়োপযোগী এক সমীচীন বেদান্তসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন।[৬] উদাত্ত মানবিকতা ও আধুনিক মনস্বতার সমীকরণে বাঙালি চিত্তকে উদ্বোধিত করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি তত্ত্বজ্ঞান ও ভারতের সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য ‘আত্মীয় সভা’ স্থাপন করেছিলেন। ‘আত্মীয় সভা’ ১৮১৫ সালে প্রথমে রামমোহনের মানিকতলার উদ্যানগৃহে বসত। পরে সে স্থান পরিবর্তিত হয়ে রামমোহনের ষষ্ঠীতলার বাড়িতে সভা বসতে শুরু করে। এর কিছুদিন পর তাঁর সিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভা বসে পুনরায় মানিকতলার উদ্যানে সভা স্থানান্তরিত হলো। সন্ধ্যার সময় ‘আত্মীয় সভা’তে বেদপাঠ ও ব্রহ্ম সংগীত হতো, কিন্তু বেদব্যাখ্যার নিয়ম তখনো প্রচলিত ছিল না। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করতেন ও গোবিন্দমাল ব্রহ্মসংগীত গান করতেন।[৭] এক ব্রহ্মের উপাসনা করা ও পৌত্তলিকতা হতে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে ‘আত্মীয় সভা’ গঠিত হয়েছিল। তবে পরবর্তী সময়ে তা সমাজ সংস্কারের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। “হিন্দু সমাজে যে ধর্মাচরণ চলেছে, তার সঙ্গে মনুষ্যত্বের যোগ নেই। সতীদাহ, গঙ্গা সাগরে সন্তান বিসর্জন, জগন্নাথের চাকার নীচে মৃত্যুবরণ ইত্যাদি কুসংস্কার ও বাহ্যিক আচার, ধর্মের পক্ষে ‘has become fashionable’। তাছাড়া কৌলিন্য প্রথা প্রভৃতি সম্পর্কিত অনাচার ধীরে ধীরে সমাজের কাঠামোতে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল। তিব্বতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করে এবং উপনিষদাদি গ্রন্থসমূহ পাঠ করে তাঁর স্পষ্টতই মনে হয়েছিল, পৌত্তলিকতা একটা অযৌক্তিক আচারমাত্র।”[৮] এই অযৌক্তিক আচার সর্বস্ব ধর্মীয় গোঁড়ামিকে সংস্কার করে মানুষের মধ্যে আধুনিক মনোভঙ্গি

তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর এই সংস্কার প্রয়াসের সঙ্গী হয়েছিলেন কলকাতা ও তাঁর পাশ্ববর্তী অঞ্চলের কিছু ধনিক শ্রেণির উদারপন্থী মানুষ। জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর, পাথুরিয়া ঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী, তেলিনিপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জী, ভূকৈলাশের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, বৃন্দাবন মিত্র, কাশীনাথ মল্লিক, ব্রজমোহন মজুমদার, নন্দকিশোর বসু, রাজনারায়ণ সেন, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি বিখ্যাত মানুষের পদচারণায় 'আত্মীয় সভা' মুখরিত হয়ে উঠত। 'আত্মীয় সভা'র সাথে তাঁরা প্রকাশ্যে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন বলে রক্ষণশীল সমাজপতিরা তাঁদেরকে নাস্তিক বলে গালি দিতেন। ১৮১৯ সাল পর্যন্ত 'আত্মীয় সভা' টিকে ছিল। সামাজিক প্রতিকূলতার সাথে সাথে পারিবারিক বিরোধিতা বিশেষ করে ভ্রাতুস্পুত্রদের বিরুদ্ধমনোভাব, সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা রাজা রামমোহনের মানসিক স্থিরতা নষ্ট করে দিয়েছিল। 'আত্মীয় সভা' বন্ধ হয়ে যায় বটে কিন্তু 'আত্মীয় সভা' ও রাজা রামমোহনের মতাদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে এক ব্যাপিস্ট মিশনারী ইউলিয়াম অ্যাডাম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' নামক সভা স্থাপন করেছিলেন। এখানে একত্ববাদী খ্রিস্টান মতানুযায়ী উপাসনা হতো। রামমোহন ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী সে উপাসনায় যোগ দিতেন। একদিন রামমোহন অ্যাডাম সাহেবের সভা হতে ফিরছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব। তাঁরা রামমোহনকে নিজেদের একটি উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। কথাটি রামমোহনের খুব ভালো লাগল। এ বিষয়ে তিনি তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও টাকি নিবাসী রায় কালীনাথ মুন্সীর সাথে পরামর্শ করলেন। পরে তাঁর বাড়িতে এ বিষয়ে একটি পরামর্শ সভা বসে। সেখানে দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং হাবড়া নিবাসী মথুরানাথ মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই এ মহৎ কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করতে একমত হলেন।[৯] এভাবে তাঁর কৈশোরের জিজ্ঞাসা, যৌবনের সংস্কার চিন্তা-ভাবনা, 'আত্মীয় সভা'র একেশ্বরবাদী উপাসনা সমাজের উচ্চবর্ণের মহতী উদ্যোগে বাস্তবায়নের পথ পেল। 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি মানব কল্যাণে বিশ্বায়নের প্রতিফলনে এক মহাবিপ্লব সাধন করলেন। 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব আরোপ করে কালিক বর্ণনায় শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল বলেন,

> "বর্তমান যুগের প্রারম্ভে, সমগ্র ভারতসমাজ অগাধ অবসাদে নিমগ্ন ছিল। ধর্ম্ম প্রাণহীন, অনুষ্ঠান অর্থহীন, প্রকৃতিপুঞ্জ জ্ঞানহীন, সমাজ আত্মচৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ঘোরতর তামসিকতা শ্রেষ্ঠতম সাত্তিকতার ভাণ করিয়া, ভীতিকে শম, নির্ব্বীর্য্যতাকে দম, নিদ্রালস্যসম্ভূত নিশ্চষ্টতাকে নির্ভর বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছিল। ভারতসমাজের এই ঘোরতর তামসিকতাচ্ছন্ন অবস্থায় ইংরেজের শাসন, খৃষ্টীয়ানের ধর্ম্ম, য়ুরোপের সাধনা এক অভিনব আদর্শের প্রেরণা লইয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নতুন শক্তি-সংঘর্ষে এই তামসিকতা অল্পে অল্পে নষ্ট হইয়া অভিনব রাজসিকতা জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই বিচিত্র যুগসন্ধিকালে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়।"[১০]

উনিশ শতকী তামসিকতার বিরুদ্ধে মুক্ত আলোর আবাহনে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক মানবিক দ্বার উন্মোচনে রাজা রামমোহন রায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। কোনো ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ নয়, সকল ধর্মের প্রতি সম্মান

প্রদর্শন করে যুক্তিবাদের নিরপেক্ষতায় ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে এবং উন্নত মানবীয়বোধের স্বপক্ষে তাঁর অবস্থান। কোনো ধর্ম শাস্ত্রকেই তিনি অপৌরুষেয় বা অভ্রান্ত বলে মনে করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক ধর্ম শাস্ত্রেই পূর্বযুগ সঞ্চিত কতগুলো সত্য নিহিত আছে।[১১] আর এ বিশ্বাসকেই তিনি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট তিনি জোড়াসাঁকো এলাকার চিৎপুর রোডে কমলবসুর বাড়ি ভাড়া নিয়ে 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সভা বসত। দুজন তৈলাঙ্গ ব্রাহ্ম বেদ উচ্চারণ করতেন, শ্রী উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করতেন আর রামচন্দ্র বিদ্যা বাগীশ ব্যাখ্যান করতেন। সবশেষে ব্রহ্ম সঙ্গীত হয়ে সমাজের কার্য সম্পন্ন হতো। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক ছিলেন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য উন্মুক্ত ছিল ব্রাহ্মসমাজের দ্বার। "রামমোহন রায় বলিলেন 'ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন, সকলে এস, ভ্রাতৃবন্ধনে বন্ধ হইয়া এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কর। যে জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়ভুক্ত লোক কেন হও না, সকলে এস, সার্ব্বভৌমিকভাবে একমাত্র নিরাকার, অগম্য, অনাদ্যনন্ত পরব্রহ্মের পূজা কর।"[১২] হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান-এর একাসনে বসে উপাসনা করার এমন বিরল দৃষ্টান্ত সম্ভবত এটিই পৃথিবীতে প্রথম। অল্পকালের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের সাফল্য আসে। তারপর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কাছ থেকে আপার চিৎপুর রোডের কাছের একখণ্ড জমি ক্রয় করা হয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য পাকাগৃহ নির্মাণ প্রকল্পে। ৮ জানুয়ারি ১৮৩০ সালে (১১ মাস ১৮৫১ শকে) ব্রাহ্মসমাজের Trust deed সম্পাদিত হয়েছিল। এভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় মানবীয় বোধে ধীর পদে যাত্রা হলো ব্রাহ্মসমাজের। রামমোহন রায় নতুন কোন ধর্মের প্রবর্তন করেননি। তিনি স্বধর্মে অবস্থান করে ধর্মীয় অনাচারগুলোকে সংস্কার করেছিলেন মাত্র। পৌত্তলিকতার অযৌক্তিক দিকগুলো তুলে ধরে সকল ধর্মের সমন্বয়ে এক উদার পরিমণ্ডল নির্মাণ করেছিলেন। জাতীয় চেতনা বোধের শাণিত সত্তায় তিনি ছিলেন ভারত পথিক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "...তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত মানুষের এক মহদরূপ অন্তরে দেখেছিলেন। ভারতের উদার প্রশস্ত পন্থায় তিনি সকলকে আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে।"[১৩] তাঁর এ মহৎ উদ্যোগের প্রেরণা মানবীয় চেতনায় সমৃদ্ধ ছিল। যাই হোক, অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' এগিয়ে চলে। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রথম আচার্যের মর্যাদা পেয়েছিলেন। রামচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সাপ্তাহিক অধিবেশনে রামমোহন রচিত অথবা স্বরচিত উপনিষদ ব্যাখ্যান পাঠ করতেন। ১৮৩০ সালে রামমোহনের বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত এ ব্যাখ্যানের সংখ্যা ছিল ৯৮। ১৮৩০ সালে রামমোহনের বিলাত যাত্রায় ব্রাহ্মসমাজের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রামমোহন ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে পরলোক গমন করেন। ফলে 'ব্রাহ্মসমাজ' কাণ্ডারিহীন গতি শূন্য হয়ে পড়ে। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থে এ সম্পর্কে জানতে পারি,

> "১৭৫৫ শকের আশ্বিন মাসে ইংলন্ড দেশে রাজা রামমোহন রায়ের পরলোক প্রাপ্তি হয়, মাঘ মাসে তাহার সম্বাদ কলিকাতা নগরে প্রাপ্ত হইল। ১৭৫৬ শকের পৌষমাসে শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ রায় পিতৃপাপ্য ধন আনিবার জন্য দিল্লীনগরে যাত্রা করিলেন। এই সময় ব্রাহ্ম

সমাজের প্রতি সকলেরই উপেক্ষা হইল। সমাজের জন্ম দিবসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি ধন বিতরণ একাল পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে হইয়া আসিতেছিল, ১৭৫৫ শকে তাহা নিরস্ত হইল। এই সময় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নির্ব্বাহকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের এই ম্লান অবস্থা প্রায় দশবছর ক্রমাগত রহিল। পরন্তু ১৭৬১ শকের আশ্বিন মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইয়া ব্রহ্মোপসনা প্রচারের আন্দোলন পুনর্ব্বার আরম্ভ হওয়াতে ১৭৬৫ শকের মধ্যেই পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রতি অনেকেই যত্নবান হইলেন।"[১৪]

রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় ১১ বছর পর দেবেন্দ্রনাথের স্পর্শে ব্রাহ্মসমাজ নব জীবন লাভ করে। ব্রাহ্মসমাজ আর দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু, শিষ্য এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলনের একজন প্রধানতম সহকারী। রাজা রামমোহন রায় যতদিন এদেশে ছিলেন, ততদিন তিনি যেমন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কাজ করেছিলেন, তেমনি তাঁর ইংল্যান্ড যাত্রার পরও তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে সমাজের ভার গ্রহণ (১৮৩৩-৪৩) করেছিলেন। তিনিই মূলত ব্রাহ্মসমাজের নিভু নিভু অস্তিত্বকে আগলে রেখেছিলেন। রামমোহন থেকে দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস তাঁরই হাত ধরে গতি পেয়েছিল। তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহদাতা এবং দীক্ষাদাতা। "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাঁকেই প্রথম 'আচার্য পদে অভিষিক্ত করেন মহর্ষি ১৬৬৫ (খ্রী. ১৮৪৪) শকের ফাগুন মাসে এবং স্মরণীয় যে, ঐ বছরেই ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব মাঘোৎসব রূপে পালিত হয় সর্বপ্রথম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্যযোগ্য যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী' সভারও প্রথম আচার্য ছিলেন এ পণ্ডিত বিদ্যাবাগীশ।"[১৫]

দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পারিবারিক সূত্রে পূর্ব থেকেই রামমোহনের সাথে পরিচিত ছিলেন। তাঁর স্কুলে তিনি পড়াশুনা করতেন। তাঁর বাগানে গিয়ে মনের আনন্দে লিচু আর কড়াইশুঁটি ভেঙ্গে খেতেন। রামমোহনের আদর্শিক চিন্তা-ভাবনাকে তিনি খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। যেদিন তাঁর মধ্যে আধ্যাত্ম ভাবনা কাজ করল তখনই তিনি বুঝলেন যে, ঈশ্বরের শরীর নেই, তাঁর প্রতিমা নেই, তখন হতে তাঁর মনে পৌত্তলিকতার ওপর ভারি বিদ্বেষ জন্মেছিল। রামমোহন রায়কে তাঁর স্মরণ হলো, তাঁর চেতন হলো। তিনি তাঁর অনুগামী হয়ে প্রাণ ও মন সমর্পণ করলেন।[১৬] তাঁর এই সমর্পিত ভার আরও তীব্র হয়ে উঠল যখন তাঁর সামনে দিয়ে সংস্কৃত পুস্তকের একটি পাতা উড়ে গেল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যখন সে সংস্কৃত পাতার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন 'ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর।' তখন তাঁর আকুলতা আরো বেড়ে গেল। তিনি তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলেন ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন করতে পারলে আর অপবিত্রতা কোথায়? তা হলে সবই পবিত্র হয়। জগৎ মধুময় হয়। তিনি যা চেয়েছিলেন তা-ই যেন পেলেন।[১৭] রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শিক্ষা আর অন্তরজাত অধ্যাত্ম ভাবনার সম্মিলনে সংসার বিবাগী এক নবতর ভাবনায় দেবেন্দ্রনাথ ডুবে থাকতেন সারা দিনমান। দেবেন্দ্রনাথের এ আধ্যাত্মিক বিহ্বলতা দ্বারাকানাথের চোখ

এড়ায়নি। তিনি বিদ্যাবাগীশকে দোষারূপ করে বলেছিলেন, "আমি তো বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম; কিন্তু এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কাণে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। একে তাঁর বিষয়-বুদ্ধি অল্প,–এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্ম্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না।"[১৮] ব্রহ্মজ্ঞানে অধীর হয়ে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন অর্থাৎ ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সকল শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বিদ্যার প্রচার। তত্ত্ববোধিনী সভারও প্রথম আচার্য ছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তত্ত্ববোধিনী আর ব্রাহ্মসমাজ যদিও দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন দুটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য একই– ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনীসভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যোগ হলো। ১৭৬৪ শকে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। এর আগে অবশ্য তিনি ব্রাহ্মসমাজ দেখতে যান কোনো এক বুধবারের সন্ধ্যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'আত্মজীবনী'তে বলেন,

> "আমি গিয়া দেখি যে, সূর্য অস্ত হইবার পূর্ব্বে সমাজের পার্শ্বগৃহে একজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ উপনিষৎ পাঠ করিতেছেন; সেখানে কেবল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং আর দুই তিন জন ব্রাহ্মণ উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন; শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার নাই। সূর্য্য অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন সমাজের ঘরে প্রকাশ্যে বেদীতে বসিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতিরই সমান অধিকার ছিল। দেখিলাম, লোকের সমাগম অতি অল্প। বেদীর পূর্ব দিকে ফরাস চাদর পাতা, তাহাতে পাঁচ ছয়জন উপাসক বসিয়া রহিয়াছে। আর বেদীর পশ্চিম দিকে কয়েকখানা চৌকি পাতা রহিয়াছে, তাহাতে দুই চারিজন আগন্তুক লোক। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন উপনিষৎ ব্যাখ্যা করিলেন, এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বেদান্ত দর্শনের মীমাংসা বুঝাইতে লাগিলেন। দেবীর সম্মুখে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এই দুই ভাই মিলিয়া একস্বরে ব্রাহ্মসঙ্গীত গান করিলেন। রাত্রি ৯ টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।"[১৯]

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা নিজে প্রত্যক্ষ করলেন এবং ১৭৬৫ শকে ৭ই পৌষে ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর শ্রীধর ভট্টাচার্য, শ্যামচরণ ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র নন্দী, লালা হাজারী লাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি ২১ জন বন্ধুর সঙ্গে ধর্মান্তরিত হয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম ব্রত গ্রহণ করলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মজীবনে' এ প্রসঙ্গে বলেন,

> "সেখানে একটি বেদী স্থাপিত হইল; সেই বেদীতে বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলাম। আমাদের মনে এক নূতন উৎসাহ জন্মিল; অদ্য আমাদের প্রতি-হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ রোপিত হইবে। আশা হইল, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ হইবে, এবং যখন ইহা ফলবান হইবে, তখন ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় আমরা অমৃত লাভ করিব। 'নিশ্চয় অমৃত লাভ সে ফল ফলিলে'। এই আশা উৎসাহে পূর্ণ হইয়া বিদ্যাবাগীশের সম্মুখে আমি বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া একটি

বৃক্ততা করিলাম। 'অদ্য এই শুভক্ষণে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সকলে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি। যাহাতে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন'।"[২০]

অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মার প্রতি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীদের একাগ্রতা দেখে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং আনন্দাশ্রুতে তাঁর চোখ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রামমোহনের আদর্শকে বাস্তবায়নের পথে পুনরায় পরিচালিত হতে দেখে তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেন। তবে একটু পার্থক্য রয়ে গেল। রামমোহন 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে সকল ধর্মের মানুষ নিঃসংশয়ে নিজ নিজ উপাসনা করার অধিক পেয়েছিল। রামমোহনের কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছিল না, নতুন ধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্টির অভিলাষও তাঁর ছিল না। অ-পৌত্তলিক নিরাকার, সার্বজনীন একেশ্বরবাদের সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রহ্মসভার' ভজন সাধনকে একটি স্বতন্ত্র ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করলেন। ব্রাহ্মসমাজের জন্য এটি সম্পূর্ণ নতুন একটি ব্যাপার। আগে এটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল, দেবেন্দ্রনাথের চিন্তার পরিণতিতে এটি ব্রাহ্মধর্ম রূপে আত্ম-প্রকাশ করল। তাঁর মতে, "ব্রহ্মব্যতীত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম্ম ব্যতীতও ব্রহ্ম লাভ হয় না। ধর্ম্মেতে ব্রহ্মেতে নিত্য সংযোগ। সেই সংযোগ বুঝিতে পারিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইলাম, এবং ব্রাহ্মসমাজের সার্থক্য সম্পাদন করিলাম।"[২১]

দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে রামমোহনের মতো উপনিষদ ও অপোরশ্রেয় বেদ-বেদান্তের পৌত্তলিক হিন্দু জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। যখন উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপসনা প্রাপ্ত হলেন এবং এ উপনিষদই ভারতবর্ষের প্রামাণ্য শাস্ত্র বলে জানলেন তখন উপনিষদের প্রচার দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের সংকল্প নিলেন। ক্রমে বেদে ব্রহ্মোপসনায় দেবেন্দ্রনাথের সন্দেহ উপস্থিত হলো। এ সন্দেহ নিরসনের জন্য মহর্ষি চারজন বাঙালি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বেদ পড়বার জন্য কাশীতে প্রেরণ করলেন। তারা কাশীতে বেদ পড়ে এসে মহর্ষিকে জানালেন, মানুষের রচিত গ্রন্থে যেমন সত্য অসত্য মিশে আছে। বেদেও তেমনি সত্যাসত্য মিশে আছে। এটি শুনে মহর্ষি বেদের প্রামাণ্য বর্জন করলেন। তাঁর মনে হলো- যিনি আত্মার অন্তর্যামী ব্রহ্ম এবং যিনি প্রতিনিয়ত মানবাত্মায় জ্ঞানধর্ম প্রেরণ করেন, তিনিই 'সত্যং জ্ঞাননমন্তং ব্রহ্ম'।[২২]এ প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৪০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ' এ লিখেছেন-

"সত্যই ব্রহ্মের শাস্ত্র। প্রচলিত কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই সর্ব্বাশেং সত্যে পূর্ণ নহে এবং প্রচলিত কোনো একখানি মাত্র ধর্ম্মগ্রন্থে সকল মানুষের সকল অবস্থার উপযোগী উপদেশ লাভ করা সম্ভব নহে। এজন্য প্রচলিত কোন ধর্ম্মগ্রন্থবিশেষকে ব্রাহ্মগণ অভ্রান্ত বা একমাত্র শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। পৃথিবীতে যত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, অথবা হইবে, তাহার মধ্যে যাহা কিছু সত্য আছে বা থাকিবে, সে সমুদয়ই ব্রাহ্মের শাস্ত্র।

"প্রচলিত কোন শাস্ত্রই অপৌরুষেয় বা ঈশ্বর-লিখিত নয়; সমুদয় শাস্ত্রই মনুষ্য লিখিত। মনুষ্য অল্পজ্ঞান বলিয়া অল্পাধিক পরিমাণে ভ্রান্ত; সুতরাং তাহাদের লিখিত শাস্ত্রও অল্পাধিক পরিমাণে ভ্রমযুক্ত হইবার সম্ভাবনা"।"[২৩]

দেবেন্দ্রনাথ এ সত্য মানতেন আর মানতেন বলেই বেদ ও উপনিষদের সারসত্য নিয়ে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রকে আপ্ত বলে না মানলেও শাস্ত্রের যে দরকার আছে, এটি স্বীকার করতেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থই তার সাক্ষী। তিনি বেদকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে পারেননি, আবার উপনিষদকেও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে পারেননি। তবে উভয় শাস্ত্রের সত্যগুলোকে তিনি বিশ্বাস করতেন। যার ফলে "বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য তাহা লইয়াই ব্রাহ্ম ধর্ম (গ্রন্থ) সংগঠিত হইল।"[২৪]

দেবেন্দ্রনাথের কর্মতৎপরতায় এবং আন্তরিকতায় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বেড়ে চলল। ১৭৬৭ শকের পৌষ মাসের মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে ব্রাহ্ম হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের উত্তরোত্তর প্রভাব বৃদ্ধিতে অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানমনস্ক লেখক। তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা করতেন। তাঁর রচনা বুদ্ধিদীপ্ত, কৌতূহলোদ্দীপক, হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। তাঁর রচনাশৈলীর ওজস্বীতার কারণেই তিনি দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মতো লোককে পেয়ে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আশানুরূপ উন্নতি করেন। তাঁর রচনা সৌষ্ঠব তৎকালে বিরল ছিল। তখন সমগ্র বাংলা জুড়ে মাত্র কয়েকটি সংবাদপত্রই বিখ্যাত ছিল। কিন্তু সেসব পত্রিকায় জনহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোনো প্রবন্ধ প্রকাশ পেত না। একমাত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ই সর্বপ্রথম সেই অভাব পূরণ করে। শুধু তা-ই নয় বেদ-বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা দেবেন্দ্রনাথের যে মুখ্য সঙ্কল্প ছিল, এ পত্রিকায় তা-ও সম্ভব হয়েছিলো।[২৫]আর এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয় দত্তের সাথে দেবেন্দ্রনাথের মতের বিরোধ ছিল যথেষ্ট। বলা যায়, আকাশ পাতাল প্রভেদ। অক্ষয় দত্ত ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী। নিছক জ্ঞান পিপাসু হয়েই তিনি জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন। মহর্ষি যখন খুঁজতেন 'ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ' তখন তিনি খুঁজতেন 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ'। ব্রাহ্মধর্মে অক্ষয় দত্তের অবদান সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম হিসেবে বেদান্তধর্মকেই গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মরা বেদের অভ্রান্ততাতেই বিশ্বাস করতেন। অক্ষয়কুমার এর প্রতিবাদ করে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। প্রধানত তাঁরই আগ্রহে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রালোচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন । বেদান্ত ধর্ম ও বেদের অভ্রান্ততা সম্পর্কে তাঁকে সংশয়ান্বিত করতে অক্ষয়বাবুকে বহু বেগ পেতে হয়। ১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবু অবলম্বিত মতকে যুক্তিসিদ্ধ বলে মেনে নেন এবং বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করেন।[২৬] তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তিনি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ততে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

রাজনারায়ণ বসু ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বস্ত বন্ধু, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের বন্ধুর পথে নির্ভরযোগ্য সহকর্মী। রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহনের মতালম্বী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করুক। কিন্তু রাজনারায়ণের ধর্মে কর্মে তেমন আস্থা ছিল না। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্মে যোগদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> "যেদিন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সেদিন আমি স্বগ্রামের দুই একজন বয়স্ক ব্যক্তির সহিত তাহা করি। যেদিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সেদিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতি বিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য এরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্য পান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল।"[২৭]

প্রথমে তিনি ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' সভার ইংরেজি অনুবাদকের কাজে নিয়োজিত হন। ছয়মাস পর ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কর্মে নিযুক্ত হলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থে দেবেন্দ্রনাথ সব সময় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তিনি কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বের উপনিষদ ইংরেজিতে তরজমা করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 'ইংরাজী খাঁ' বলে ডাকতেন। রাজনারায়ণের কর্মশক্তির ওপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপরিসীম আস্থা ছিল। সমস্যা সঙ্কুল পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে তিনি রাজনারায়ণের ওপর পরম বিশ্বাসে নির্ভর করতেন। তাই তিনি ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দেই রাজনারায়ণকে একখানি পত্রে লেখেছিলেন "এ সময়ে যদি তোমাকে পাই তবে ইহা হইতে অধিক আহ্লাদ আর কিছুতেই নাই। তোমার মুখের প্রতিই আমি চাহিয়া আছি।"[২৮] রাজনারায়ণ বসু ইংরেজিনবীশদের মতো প্রখর যুক্তিবাদী ও মুক্তমনা মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই আধুনিকতার নামে নাস্তিকতার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেননি। উন্নতমনা সংস্কারবাদী চেতনায় তিনি স্বজাত্যভিমানের অনুশীলনই করেছিলেন। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বিষয়ক বক্তৃতা তাঁর স্বজাত্যভিমানের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন দেবেন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন। রাজনারায়ণ তাঁর পিতা নন্দ কিশোর বসুর মৃত্যুর পর অশৌচ অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের সাথে দেখা করেন। দেবেন্দ্রনাথ তখনই তাঁকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর আন্তরিকতায় ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকার্যে ভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম চেতনার সঙ্গে অক্ষয় দত্তের বিজ্ঞান মনস্বিতা আর রাজনারায়ণের স্বজাত্যবোধ যুক্ত হয়েছিল বলে সে কালে ব্রাহ্মধর্ম দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। ১৮৪৩ সালের মাঘ মাস থেকে দেবেন্দ্রনাথ 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের' আচার্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৮৪৫ সালে ব্রাহ্মসভ্যের সংখ্যা বেড়ে ৫০০ তে দাঁড়ায় এবং 'তত্ত্ববোধনী' পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ৭০০ তে উত্তীর্ণ হয়। ব্রাহ্মধর্ম বঙ্গদেশে যে প্রচারিত এবং প্রসারিত হয়েছিল তা সময়োপযোগী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব জীবনমুখী ছিল। আধুনিক শিক্ষার প্রসার, পৌত্তলিক বিরোধী মনোভাব, বর্ণবৈষম্যর ফলে সৃষ্ট বিভাজন, এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে প্রতিবন্ধন করার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ সক্রিয় ছিল। বিশেষ করে ১৮৪৫ সালে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার বন্ধ করার ক্ষেত্রে এবং স্ব-অর্থায়নে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ যে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা-ই ব্রাহ্মধর্মকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা

দিয়েছিল। ১৮৪২-৫৯ খ্রি. এর মধ্যে বঙ্গদেশে মোট (আদি কেন্দ্র বাদে) তেরটি সমাজ স্থাপিত হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্ম মূলত সমাজের উচ্চবিত্তদের ধর্ম ছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধর্ম প্রসার লাভ করেনি। ব্রাহ্ম বলতে সে যুগের বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকেই বুঝানো হতো। নব্য অভিজাত শ্রেণির ধর্মরূপে ব্রাহ্ম ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। অমানবীয় প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধে বুদ্ধিদীপ্ত মানবীয় জাগরণে বিশ্বাসী ছিল ব্রাহ্মরা। সে কারণেই ১৮৫২ সালে রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্মের উপবীত রাখা অসঙ্গত ভেবে উপবীত ত্যাগ করেছিলেন।

আধুনিক যুগ সমাজ সংস্কারের যুগ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগ, ব্যক্তি প্রতিভা স্ফূরণের যুগ। সে যুগের বলিষ্ঠ চিত্ত, অসাধারণ বাগ্মী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন তেজস্বি যুবা কেশবচন্দ্র সেন। যুগের মানসপুত্র কেশবচন্দ্র নিজেই অর্জন করেন এক যুগোপযোগী কর্মদক্ষতা। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসে তিনি নব ব্রহ্মানুভূতি লাভ করেন। এই ব্রহ্মানুভূতি অদ্ভুত-বিপুল শক্তি তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনকে অগ্নিময় করে তোলে। তাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে, ধর্ম সাধনার পথে সকল সাধনাকে অগ্রাহ্য করে নির্ভীক ও নিস্পন্দ চিত্তে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।[২৯] ১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। মহর্ষি তখন হিমালয়ে। কেশবচন্দ্র গোপনে প্রতিজ্ঞাপত্র সই করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এক পত্রের মাধ্যমে কেশব মহর্ষিকে 'ধর্মতাত' বলে বরণ করে নেন। ১৮৫৮ সালে মহর্ষির সঙ্গে কেশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। বরিদবরণ ঘোষ এ সাক্ষাৎকে ঐতিহাসিক গুরুত্বপুর্ণ বলেছেন। তাঁর মতে পারে দুটি যুগ চিত্ত এক মহৎ অধ্যাত্মসূত্রে বাঁধা পড়ল।[৩০] বাংলা, ইংরেজি উভয় ভাষায় কেশবচন্দ্রের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও জোরালো বাগ্মিতায় ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে লাগল। কেশবচন্দ্রের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সমবয়সী মেধাবী তরুণরা সে সময় সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। নব উৎসাহ উদ্দীপনায় এবং তাঁর কর্ম তৎপরতায় ১৮৪৯ সালের ৫০০ জন ব্রাহ্ম থেকে ১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মের সংখ্যা ২০০০এ পৌঁছে যায়। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আত্মপ্রত্যয়ী কেশবচন্দ্র অল্পকালের মধ্যেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন এবং অন্যেরা তাঁর শাণিত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নেতা বলে বরণ করে নেন। দেবেন্দ্রনাথও কেশবচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ভালবাসায় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন। এদিকে ১৮৫৯ সালের ৮ মে তারিখে ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং একই বছরের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে স্থাপিত অধ্যক্ষ সভার কার্যে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে অন্যতম সহায়ক হিসেবে পেয়েছিলেন। "দেবেন্দ্রনাথ এই প্রথম ধর্মকে সমাজ সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করলেন। তাঁর মনে বহুদিন থেকেই একটি বাসনা রূপ নিচ্ছিল সমাজ ও ধর্মের উপর যেসব মৃত আচার ও সংস্কার জমা হয়ে জাতীয় জীবনকে ঠেসে মারছিল তিনি সেসব জীর্ণতা দূর করতে চাইলেন। ব্রাহ্মরা শুধু যেন উপাসক না থাকে– ব্রাহ্মরা সমাজের অংশ–সমাজ সমস্যার সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করবার একটা প্রেরণা পাচ্ছিলেন– এরজন্য প্রয়োজন একদল ধর্মোৎসাহী যুবক। এ কাজে কেশবকে সে যুগের যুবনেতাকে তিনি যোগ্য বলে বিবেচনা করলেন।"[৩১]

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজে দ্রুত গতি সঞ্চারিত হলো। তিনি ব্রাহ্মসমাজের ভেতরে এবং বাইরে আধুনিকরণ শুরু করলেন। আর এখানেই চরম হয়ে উঠল দেবেন্দ্র-কেশব দ্বন্দ্ব। ১৮৬২ সালের পর থেকেই

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ঘটতে শুরু করেছিল। কেশবচন্দ্র আধুনিক সংস্কারবাদী পুরুষ। জাতিভেদ তাঁর কাছে চরম অবমাননাকর। সুতরাং জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিনি সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন। দেবেন্দ্রনাথও যুগের এ দাবীকে অস্বীকার করতে পারেননি। ১৩ এপ্রিল ১৮৬২ সালে অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্রকে তিনি উপাচার্যের বেদীতে বসালেন। শুধু তাই নয়, কেশবচন্দ্রের দাবী মেনে নিয়ে তিনি সূত্রধারী ব্রাহ্মণদের উপবীত ত্যাগ করে বেদীতে বসার নিয়ম করলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখের ন্যায় উপবীত ত্যাগ করলেন। এখানেই শেষ নয়, অমিতাবেগে প্রাণচঞ্চল তারুণ্যদীপ্ত কেশব নিত্যনতুন পরিবর্তনে ব্রাহ্মসমাজের উন্নয়নে অগ্রসর হলেন। প্রধানত তিনটি কারণে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল– "প্রথমতঃ কেশবচন্দ্র চাইছিলেন সপ্তাহান্তে একবার মাত্র উপাসনার পরিবর্তে প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, মহর্ষির নির্ভর ছিল কেবলমাত্র হিন্দু শাস্ত্র। কিন্তু কেশবচন্দ্র ধর্মচিন্তাকে বিশ্বের ধর্মচিন্তা-প্রবাহের সঙ্গে মিলিত করতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়তঃ, ট্রাস্টীর বয়ান বলে সমাজে উপাচার্যাদি নিয়োগের ব্যাপারে সর্বকর্তৃত্ব ছিল দেবেন্দ্রনাথের হাতে। এই অধিকার কেশবচন্দ্রের মনঃপুত হয়নি। তিনি একটি প্রতিনিধি সভার হাতে এই ভার দিতে চাইলেন।"[৩২] কাজেই বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এর ওপর আবার কেশবচন্দ্রের অসবর্ণ বিবাহ প্রচারের আঘাত। মহর্ষির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি স্বভাবতই রক্ষণশীল মানুষ ছিলেন। তাঁর উপদেশ ও সাধনে সর্বদাই হিন্দুভাব বজায় ছিল। তিনি ট্রাস্টীর অধিকার বলে- পুনরায় সূত্রধারী ব্রাহ্মণদের বেদীতে বসালেন। তিনি হিন্দু ধর্মের আদর্শকে খর্ব করতে নারাজ ছিলেন। কারণ তিনি খ্রিস্টধর্ম ঘেঁষা কেশবপন্থী উন্নতশীল ব্রাহ্মদের হিন্দুধর্মের আদর্শিক প্রতিবন্ধকতা ভেবেছিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মসমাজ ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। "দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে লিখলেন, 'আমি তোমার কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। কেশবচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লেখলেন, 'যতদিন আপনার সংস্কার অন্যায় ও অনিষ্টকর বোধ হইবে, ততদিন তাহাকে নির্যাতন করা, তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য।' এবং শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের কাছে পৃথক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন।"[৩৩] এরই প্রেক্ষিতে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন। ইউরোপীয় যুক্তিবাদের মধ্যে যে উদার বিশ্বজনীন ভাব আছে, মহর্ষির ব্রাহ্মসিদ্ধান্তে বা ব্রহ্মসাধনে তা রক্ষিত হয়নি। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্তে ও সাধনায় যুগধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে উঠে। ফলে কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মত, সিদ্ধান্ত, সাধনাদি, সব কিছুই মহর্ষির মত, সিদ্ধান্ত ও সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠে। মহর্ষির একতন্ত্র প্রভুত্বের প্রতিবাদ করতে গিয়েই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্ম।[৩৪]

'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' থেকে বেরিয়ে কেশবচন্দ্র 'স্বতন্ত্র' সমাজ গড়ার পর 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের' নাম হয় 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। এ ঘটনার পর দেবেন্দ্রনাথও নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে ফেলেছিলেন। 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' থেকে অনেকটা অবসৃত হয়ে ব্যক্তিগত উপাসনায় গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন। ফলে 'আদি ব্রাহ্মসমাজের'

গতি মন্থর হয়ে এসেছিল। পরবর্তী সময়ে রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারও পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আদি ব্রাহ্মসমাজের' দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এদিকে, 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার পর আত্মপক্ষ সমর্থনে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তাঁর বাগ্মীতায়, তাঁর সার্বজনীন অধ্যাত্ম চেতনায়, তাঁর কর্ম দক্ষতার অনুপ্রেরণায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' আধুনিকতার প্রধান স্তম্ভ রূপে আত্মপ্রকাশ করল। শিক্ষার বিকাশে, নারী অধিকার সচেতনতায়, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, স্বাধিকার আন্দোলনের উদগাতা হিসেবে সর্বোপরি প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থার ধারক হয়ে উঠল এ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। তখনকার সময়ে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বলতে এ ব্রাহ্মসমাজকেই বুঝাত। ১৮৬৯ সালে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের দিনে কেশবচন্দ্রের কাছে শিবনাথ শাস্ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর আগে অবশ্য ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' অপেক্ষা আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিই তাঁর বেশি আকর্ষণ ছিল। এ আকর্ষণের কারণ ছিল তিনটি। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে,

> "আমার যতদূর স্মরণ হয়, আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (যিনি আদিসমাজের ব্রাহ্ম ও তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন এবং আমার নিকট সর্বদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসা ও উন্নতশীল ব্রাহ্মদেশের নিন্দা করিতেন) তিনিই এই আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিলেন। আমার মাতুল স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও উন্নতিশীল দলের পক্ষে ছিলেন না, তাহাও একটা কারণ হইতে পারে। সেই কারণে উন্নতিশীলদের কথাবার্তা, কাজকর্ম যেন ভাল লাগিত না। বস্তুতঃ উন্নতিশীল দলের সঙ্গে আমি অধিক সংশ্রব রাখিতাম না। তবে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ ত্যাগ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম।"[৩৫]

কিন্তু ১৬৬৮ সালে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে যে নগরকীর্তন বের হয় তা দেখে শিবনাথ এ সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সহাধ্যায়ী বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সে দলে ছিলেন। "গোঁসাইজি আমাকে দেখিয়াই "কি ভাই!" বলিয়া আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিলেন। সেই আমাকে উন্নতিশীল দলের সঙ্গে যেন বাঁধিয়া ফেলিলেন।"[৩৬] এরপরই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মধর্মে তাঁর দীক্ষা গ্রহণ। ১৮৬৮ সালে মুঙ্গের হতে নরপূজার আন্দোলন উঠেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী এ আন্দোলনে কেশবচন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এলে ভারতসংস্কার সভার মাধ্যমে সে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করলেন তাতে শিবনাথ একেবারে আত্মসমর্পণ করলেন। ১৮৭২ সাল পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের সকল কার্যকে শিবনাথ সমর্থন করে গেছেন। তিনি কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়ত্রী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ করেছেন। এমনকি ১৮৭২ সালের আইন (Act III of 1872) এ কেশবচন্দ্র যখন ঘোষণা করেছিলেন 'আমি হিন্দু নই' তখন বাংলার হিন্দু সমাজে বিতর্কের প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক প্রবন্ধ লেখে এর তীব্র বিরোধিতা করেন। এসময় শিবনাথ শাস্ত্রী রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে কেশবচন্দ্রকে সমর্থন করেন। যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি এসব বক্তৃতার অসারতার কথা স্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৬৮ সাল থেকে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' সময়ের ঘুর্ণাবর্তে পরিবর্তিত হতে থাকে। সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত চেতনার নামই প্রগতি। প্রগতিশীল চেতনার বাঁকে বাঁকে যা আজ আধুনিক কাল

তারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অত্যন্ত প্রগতিশীল, বিশ্বজনীন চেতনার ধারক কেশবচন্দ্র সময়ের উত্তরণে নিজের উত্তরণ ঘটাতে পারেননি। স্বভাবতই তাঁর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বিরোধ অবধারিত রূপে দেখা দিয়েছিল।

প্রথমত, কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রভুত্ব এবং একনায়কতন্ত্রতা লক্ষ্য করেছিলেন বলে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র নিজেও সেই আভিজাত্য বোধ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তিনি তাঁর দলের ভেতরেও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নিয়মতন্ত্র গঠন করতে পারেননি। ফলে ব্রাহ্মসমাজে বিদ্রোহ দানা বাঁধতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র অত্যাগ্রসর ব্রাহ্মরা স্ত্রী স্বাধীনতা তথা স্ত্রী পর্দা মোচনের পক্ষে ছিলেন। তাঁরা কেশবচন্দ্রের কাছে আবেদন জানালেন, তাঁরা উপাসনাকালে মন্দিরে পর্দার বাইরে আপন পরিবারস্থ মহিলাগণকে প্রকাশ্যে বসাতে চান। এতে রক্ষণশীলরা আপত্তি জানান। দারোয়ানরা নাকি মহিলাদের সঙ্গে অসম্মানসূচক ব্যবহার করেছিল। ফলে বৌবাজারে পৃথক উপাসনা মন্দির বসেছিল। রাজনারায়ণ বসু উপাচার্যের কাজ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র উদ্যোগী হয়ে মহিলাদের প্রকাশ্যে বাইরে বসার ব্যবস্থা করে দেন।

তৃতীয়ত, কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভারত আশ্রমে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শিক্ষাদান বিষয়ে মত পার্থক্য ছিল।

চতুর্থত, ১৮৭৪ সালে ভারত আশ্রমে সংঘটিত একটি অবাঞ্ছিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ বিদ্রোহে রূপ নেয়। এ সময় মজিলপুরের হরনাথ বসু স্বপরিবারে ভারতাশ্রমে বাস করতেন। অমিতব্যয়িতার কারণে তিনি আশ্রমের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আশ্রম ছেড়ে যাওয়ার সময় ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ভক্তরা তাঁর গাড়ি আটকে রাখে। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর গায়ের গহনা খুলে নিয়ে ভৃত্যরা নিভৃত হয়। এ ঘটনায় কেশবচন্দ্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কতটা জড়িত ছিলেন তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কিন্তু এ নিয়ে কেশবচন্দ্র তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। এ সময় 'সমদর্শী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তীব্র বিরোধিতায় কুৎসা রটনায় সংবাদপত্র ছেয়ে গেল। এ ঘটনার জের আদালত পর্যন্ত গড়ায়। কলকাতার ট্রেনিং একাডেমির কক্ষ বিরুদ্ধ বক্তৃতায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে।

পঞ্চমত, মুঙ্গেরে নরপূজা আন্দোলন। সেখানে কেশবচন্দ্র প্রেরিত ঈশ্বরাবতার রূপে পূজিত হলেন। যা প্রগতিশীল, বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী ব্রাহ্মরা সুনজরে দেখেননি।

সবশেষে ব্রাহ্মসমাজের সবচেয়ে বড় আঘাতটি আসে 'কোচবিহার বিবাহকে' কেন্দ্র করে। ১৮৬৮ সালে মুঙ্গেরে নরপূজাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে 'কোচবিহার বিবাহে' তা প্রচণ্ড ঝড়ের আকারে বিধ্বংসী হয়ে ফেটে পড়ে। এর আগে অবশ্য ১৮৭২ সালে তিন আইন পাশ হওয়ার পর কেশব বিরোধিরাও তাঁকে আন্তরিক সমর্থন জানান। প্রগতির উন্নয়নে, সমাজ সংস্কারে, স্বাধীনতার প্রতিফলনে অত্যাগ্রসর ব্রাহ্ম দল সব সময়ই একাত্ম ছিলেন। কিন্তু যেখানেই সত্যের অবমাননা, যুক্তিবাদ খণ্ডিত, ব্যক্তি স্বকীয়তা পরান্মুখ, সেখানেই তাঁরা আন্দোলনে মেতে উঠেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রাণের দাবীতে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, কেশবচন্দ্রকে সমর্থন করেন কিন্তু যুগের দাবীকে অস্বীকার করে কেশবচন্দ্র যখন আত্ম প্রতিষ্ঠায় মগ্ন, তখন অত্যাগ্রসর ব্রাহ্ম সমাজ তা মেনে নিতে পারেননি। শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন এ অত্যাগ্রসর দলের নেতা।

কেশবচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব প্রচার আর প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি 'কোচবিহার বিবাহ'কে একটা অতিপ্রাকৃত রূপ দিতে চেয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী করেছিলেন কিন্তু কেশবচন্দ্রের এ দাবী দেবেন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বিপিনপাল বলেন,

> "মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই ক্রমে বিশেষ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী করিয়া, আপনাদিগের উপদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটা বিশেষ ও অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য-মর্য্যাদা দান করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহর্ষির এই দাবীর অন্তরালে একটা সংযত ও সশ্রদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ও অনুগত শিষ্যগণের নিকটেই প্রসঙ্গক্রমে তিনি এই দাবীর উল্লেখ করিয়াছেন, জন সাধারণের মধ্যে কখনও প্রকাশ্য ভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। কেশবচন্দ্র, অন্যদিকে, কেবল এদেশে নয়, সমগ্র জগতের সমক্ষে তাঁর অনন্য সাধারণ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী জাহির করিয়াছেন এবং মানবেতিহাসের প্রথমাবধি যুগে যুগে ঈশ্বর প্রেরিত মহাজনেরা এই ঈশ্বরানুপ্রাণতার সাহায্যে যেমন যুগধর্ম্ম প্রবর্তিত করিয়াছেন, তিনিও তাঁহার "প্রেরিত মণ্ডলী" সেইরূপই বর্ত্তমান যুগের "নববিধানকে" প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছেন, নানা দিকে ও নানাভাবে, এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।"[৩৭]

এ মতের পূর্বপথ ধরে আসে 'কোচবিহার বিবাহের' প্রত্যাদেশ। এর পেছনে অবশ্য একটু ঘটনা আছে, কেশবচন্দ্র ১৮৭২ সালে তিন আইন সিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জোরালো ভূমিকা রাখেন। বলা যায়, তাঁরই প্রচেষ্টাতে এ আই প্রণয়ন হয়েছিল। এ আইনে ভারতবর্ষীয় পাত্র এবং পাত্রীর বয়স নির্ধারিত হয়েছিল ১৮ এবং ১৪ বছর। তখন তিনি একে প্রত্যাদেশ বলে ঘোষণা করেন। আবার কেশবচন্দ্র তাঁর নিজ কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কোচবিহার যুবরাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের বিয়েতে সে বিধি লংঘন করেন এবং একেও প্রত্যাদেশ বলে ঘোষণা করেন। আর এ প্রত্যাদেশের মূল নায়ক ছিলেন ইংরেজ সরকার। ভারতবর্ষে তখন শিক্ষিত অভিজাত বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বলতে ব্রাহ্মদেরকেই বুঝানো হতো। কপট, সুচতুর ইংরেজ সরকার অতি কৌশলে ব্রাহ্মদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির পাঁয়তারা করছিল। সে সুযোগ তারা পেয়ে গেল 'কোচবিহার

বিবাহ'কে অবলম্বন করে। কেশবচন্দ্র প্রথমে বিয়েতে সম্মতি প্রদান না করলেও সরকারের কাছ থেকে বার বার এ বিয়েতে সম্মতি দানের জন্য তাগিদ আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে আবেগী প্রতারণার ফাঁদে ফেলা হয়। আর কেশবচন্দ্র তখন কুসংস্কার অন্ধত্বে পূর্ণ কোচবিহারের সংস্কারে যেন আত্মার সায় পেয়েছিলেন এবং ইংরেজদের টোপ গিলেছিলেন। তিনি বিয়েতে সম্মতি প্রদান করেছিলেন। এ সংবাদে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ২৬ জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত পত্র কেশব বাবুকে প্রেরণ করা হলো। কেশব বাবু কোনো বিষয়ে কর্ণপাত করলেন না। এ বিয়েকে প্রত্যাদেশ বলে চালিয়ে দিলেন। পরিশেষে ইংরেজ সরকারের উদাসীনতা, আর কোচবিহার রাজপরিবারের কাছে চরম লাঞ্ছনা স্বীকার ও অপমানিত হয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন বিধ্বস্ত অবস্থায়। এদিকে, 'সমদর্শী' পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায় এবং 'সমালোচক' এর জন্ম হয়। প্রচণ্ড বাক বিতণ্ডা ও বাদ-প্রতিবাদে কলকাতার আকাশ বিষাক্ত কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। স্ত্রী স্বাধীনতার দল, সমদর্শী দল, নিয়মতন্ত্রের দল একত্রিত হয়ে কেশবচন্দ্রের অপসারণের দাবী করলেন। সকলে কেশবচন্দ্রকে একটি মিটিং ডাকার জন্য বলতে লাগলেন "আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্র এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের সাহায্যে একটা মিটিং ডাকলেন- 'Babu Keshub Chander Sen will propose, that Keshub Chander Sen be deposed.' সভায় কেশবচন্দ্রের অপসারণের দাবী জানিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী সেই প্রস্তাব তুললেন, অমনি কেশবচন্দ্র সপার্ষদ সভা ত্যাগ করলেন এবং পরে পুলিশের সাহায্য নিয়ে মন্দিরে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন।"[৩৮] কেশবচন্দ্রের এই স্বেচ্ছাচারি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিশীল দল আর অত্যাগ্রসর দলের মিলনের সকল পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেবেন্দ্রনাথের নামকরণের সমর্থনে এ নামকরণ করা হয়েছিল। ছাব্বিশটি সমাজের মধ্যে তেইশটির সমর্থনে, ৪২৫ জন ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকার মতানুকূল্যে এবং ২৫০টি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম পারিবারের মধ্যে ১৭০টি পরিবারের সম্মতিক্রমে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিবচন্দ্র দেব সম্পাদক, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রথম সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। অন্যদের মধ্যে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ মোট ৩৫ জন সাধারণ সভার সভ্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া এ সভায় আরো একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল- "'দুই মাসের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনের জন্য নতুন নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়া সভ্য সাধারণের বিচারের জন্য উপস্থিত করা চাই।' অর্থাৎ যে নিয়মতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রচেষ্টা চলছিল, তার রূপায়ণের জন্য সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। দেবেন্দ্রনাথ ও শিবনাথকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে একটি পাকা Constitution-এ বদ্ধ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।"[৩৯] নিয়মাবলী রচনায় শিবনাথ ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী। কিন্তু সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ছিলেন আনন্দমোহন বসু। ব্যারিস্টার হওয়ার সুবাদে তিনি সম্ভবত ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের দিকে তাকিয়েই ১৮৭৮ সালে এ সংবিধান রচনা করেন। যা পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের সংবিধানকে অনেকাংশেই অনুপ্রাণিত করেছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে এর মুখপত্র হিসেবে ২৯ মে 'তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা' আত্মপ্রকাশ করে। তাছাড়া ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন তো ছিলই। ১৪নং কলেজ স্কোয়ারে গুরুচরণ মহলানবিশের বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ কমিটির অধিবেশন বসত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপন্থী প্রগতিশীল আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এ সময়ে অনেক যুবক এসে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ৪৫, বেনিয়াটোলা লেনের ভাড়া বাড়িতে এ সমাজের উপাসনা চলছিল। এভাবে অতিবাহিত হলো ১৮৭৮ সাল। একটি স্থায়ী গৃহ নির্মাণের জন্য ২১২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে একখণ্ড ভূমি ক্রয় হলো। উপাসনা গৃহ নির্মাণের জন্য সভ্যেরা প্রত্যেকেই একমাসের বেতন দান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দান করলেন সাত হাজার টাকা। এছাড়া সিন্ধিয়া, পাঞ্জাবের সর্দার দয়াল সিংহ প্রভৃতি ব্যক্তি মন্দিরগৃহ নির্মাণ কল্পে মুক্ত হস্তে দান করলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গণেশচন্দ্র ঘোষ, রামকুমার বিদ্যারত্ন ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রচারকের পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। ১৮৮৬ তে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আরও পরে রামকুমার বিদ্যারত্ন সমাজ ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। গণেশচন্দ্র ঘোষও মৃত্যুবরণ করেন। একমাত্র শিবনাথ শাস্ত্রীই আমৃত্যু সমাজের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।
১৮৮০ সাল থেকে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' 'নববিধান' নামে আত্মপ্রকাশ করে। নববিধানের ক্রিয়া কর্মে কেশবচন্দ্র দেববাদকে স্বীকার করে নেন। ফলে 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজ মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে তিনি অচিরেই সরস্বতী কালি প্রভৃতি দেব দেবীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। সত্যান্বেষী, বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত কেশবচন্দ্র শেষ পর্যন্ত অতীত সংস্কারেই আত্মসমর্পণ করেন এবং পৌত্তলিকতাকেই স্বীকার করে নেন। ফলে সত্যালোকে আত্মার অনিন্দ্য আনন্দ লাভ করার যে সৌভাগ্য লাভ ব্রহ্মানন্দ করেছিলেন তা থেকে সত্যোপলব্ধ জ্ঞানান্বেষু ব্যক্তি মাত্রই বঞ্চিত হয়। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী যুগন্ধর মানব কেশবচন্দ্র তাঁর বাগ্মিতার চৌম্বকত্বের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন বিশ্বের দরবারে। যার রন্দ্রে রন্দ্রে ছিল মানবীয় আবেদন, যিনি শাস্ত্রের চেয়ে মানুষকে বড় করে দেখতেন, যিনি প্রভুত্ববাদের বিরোধিতা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, যিনি সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজাল ভেঙ্গে ব্যক্তি স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার জয়গান গেয়েছেন, সে কেশবচন্দ্র শেষ জীবনে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করেছেন, পৌত্তলিকতাকে স্বীকার করেছেন, এবং এককেন্দ্রিকতায় মগ্ন থকেন, যা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

অপরদিকে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু আদর্শ গ্রহণে যদিও আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে পৃথক ছিল তথাপি এ সমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজের আশীর্বাদ লাভে পুষ্ট হয়েছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সর্বাত্মকরণে তৎপর ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি নিজেও বলেছেন- "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ।"[৪০] বস্তুত সমাজ সংস্কারে, শিক্ষার আধুনিকায়নে, নারীর অধিকার প্রতিফলনে, সমাজে প্রগতির উত্তরণে, দেশাত্মবোধে বিপ্লব সংগঠনে সর্বোপরি দেশ ও জাতির ভেতর

বাহির বিনির্মাণে ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলা যায়, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকেই শেষ অবধি লালন করেছিল ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’।

খ. পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ

কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল ভারতবর্ষের প্রথম দেশাত্মবোধ ও বৌদ্ধিক জাগরণ। ব্রাহ্মদের এবং নব্যপন্থী শিক্ষিতদের কর্মতৎপরতায় মাত্র এক শতকে বাংলায় যে নবজাগরণ সূচিত হয়, পৃথিবীর আর কোনো দেশে এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে এরকম আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। ১৮২৮ সালে রামমোহনের তত্ত্বাবধানে তৎকালীন অভিজাত শিক্ষিত সমাজ বাঙালির নবতর জীবনধারার অগ্রযাত্রায় যে অবদান রেখেছিলেন তার ধারাবাহিকতায় পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজও ছিল অগ্রসরমান।

ব্রজসুন্দর মিত্রের হাত ধরে ১৮৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর 'ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার ব্রাহ্মসমাজের যাত্রা শুরু। "এইরূপে কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের ১৮ বৎসর ৩ মাস ১৭ দিন পরে ঢাকা নগরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।"[৪১] ব্রজসুন্দর মিত্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতি কীভাবে আগ্রহী হলেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় যে, তিনি তাঁর মাসতুত ভাই (দীননাথ ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) শীতলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে এই নব ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। শীতলচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হবার কিছুদিন আগে কলকাতায় বাস করতেন। সেখানে অবস্থানকালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সাথে পরিচিত হন এবং ব্রাহ্মধর্মের ধ্যান-ধারণাকে আয়ত্ত করেন। এমনও হতে পারে, ব্রজসুন্দর স্বয়ং কোলকাতায় অবস্থানকালে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন। যেভাবেই হোক ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগ জন্মানোর পর তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হন এবং ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে থাকেন। কালক্রমে পত্রযোগে 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের' নেতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্য জন্মে। এভাবে ব্রজসুন্দর ব্রাহ্মধর্মের চিন্তা-চেতনাকে পূর্ববঙ্গে বিস্তারে অনন্য অবদান রাখেন।[৪২] ব্রজসুন্দর মিত্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেয়ার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শিবনাথ বলেন,

> "'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা পড়েই ব্রজসুন্দর সমাজ গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন। খারাপ যাতায়ত ব্যবস্থা এবং প্রচারকের অভাবে ঐ সময় ব্রাহ্মসমাজের বিকাশে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। ঢাকার সমাজ স্থাপনের পর অবশ্য কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল এবং পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম বিস্তারে কলকাতার সমাজ নানাভাবে সহায়তা করেছিল। শুধু তাই নয়, কলকাতার ব্রাহ্মদের জোরের কারণ ছিল ঢাকার এই সমাজ।"[৪৩]

ব্রজসুন্দর মিত্রের উদ্যোগে প্রথম ছোট্ট উপাসনার মাধ্যমে 'ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তা আরো বিকশিত হয়ে 'পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ' নাম ধারণ করেছিল। ঢাকা সমাজ স্থাপনের পর পূর্ববঙ্গে অতিদ্রুত ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপিত হতে শুরু করে। ১৮৭০ সালের মধ্যে পূর্ব বঙ্গে প্রধান প্রধান শহরগুলোতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারক

পাঠানো হয়। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতায় ময়মনসিংহ (১৮৫৪), কুমিল্লা (১৮৫৪), চট্টগ্রাম (১৮৫৫), ফরিদপুর (১৮৫৭), পাবনা (১৮৫৭), বগুড়া (১৮৫৮), রাজশাহী বোয়ালিয়া (১৮৫৯), বরিশাল (১৮৬১), ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১৮৬৩) , কিশোরগঞ্জ (১৮৬৬), জঙ্গলবাড়ি (১৮৭৫) ও টাঙ্গাইল (১৮৮৭) প্রভৃতি শহরে ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয়েছিল। ১৮৭৭ সালের তালিকা অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা ছিল ২০টি। ১৮৯২ সালে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সব মিলিয়ে ৪২টিতে।[৪৪] ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি কল্পে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন নামিদামি ব্রাহ্মনেতারা পূর্ববঙ্গে প্রচারাভিযানে এসেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরনাথ গুপ্ত, কালীনারায়ণ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রচারক পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। প্রচারক ছাড়া ব্রাহ্মরাও সমাজের উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্যই ছিলেন শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণির। তাঁরা ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন পদে চাকরিরত ছিলেন। পূর্ববঙ্গে কোনো ব্রাহ্ম চাকরির বদলিতে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গেলে সেখানে একটি বিদ্যালয় এবং একটি গ্রন্থাগার নির্মাণের চেষ্টা করতেন। তবে এটা স্বীকার্য যে, সমাজ সংস্কারে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম আন্দোলন কলকাতার ব্রাহ্ম আন্দোলনের মতো আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। ব্রজসুন্দর মিত্র এবং তাঁর অল্প সংখ্যক বন্ধু সে আন্দোলনকে গতি দিতে পারেননি। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম আন্দোলনকে ব্রজসুন্দরের পর দীননাথ, তারও পরে বঙ্গচন্দ্র রায়, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বেগবান করে তুলেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মের সংখ্যা খুব বেশি বাড়েনি। অনেকেই ব্রাহ্মসমাজে আসতেন, দেখতেন এবং চলে যেতেন। সামাজিক নিপীড়নের ভয়ে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের সাথে একাত্ম হতে পারেননি। তবুও সভ্যতার অগ্রযাত্রায়, দেশ ও সমাজ গঠনে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের গুরুত্ব অবিস্মরণীয়। পূর্ববঙ্গের প্রভাবশালী ব্রাহ্মসমাজ যথা: ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ, বাঘ আঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ এর গতি প্রকৃতি ও কার্যপ্রণালীর বিবরণের সম্যক পরিচয়ের ওপর আলোকপাত করা হলো−

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ

ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ রূপায়ণে, চেতনার প্রতিফলনে, কার্য সম্পাদনে 'কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে'র পরই ছিল 'ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে'র স্থান। প্রতিষ্ঠার দিকে থেকেও 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে'র পরই 'ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হয়েছিল। তৎকালীন ঢাকার আবগারী বিভাগের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ব্রজসুন্দর মিত্র ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে ৬ ডিসেম্বর ১৮৪৬ সালে শাঁখারি বাজারে নিজ বাস ভবনে একটি উপাসনা সভা স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। ঐ দিনটিই 'ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের' প্রতিষ্ঠার দিন বলে গণ্য হয়ে আসছে। ব্রজসুন্দর মিত্র ও তাঁর বন্ধু গোবিন্দ্রচন্দ্র বসু, রামকুমার বসু, বিশ্বম্ভর দাশ ও যাদবচন্দ্র বসুর পরিকল্পনায় ১৮৪৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ব্রজসুন্দরের গৃহে প্রথম উপাসনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধব ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করেন। তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে কৌতূহলবশত বহুলোকের সমাগম ঘটে। কিন্তু স্থানাভাব থাকায় অনেক লোকের সংকুলান সম্ভব হয়নি। ফলে অনেকেই ফিরে যেতে বাধ্য হন। 'কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা লগ্নে যেমন পক্ষে বিপক্ষে তুমুল আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছিল ঢাকার ব্রাহ্মসমাজও

এর ব্যতিক্রম হয়নি। যদিও "লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করাই উক্ত উপাসনা সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য"[৪৫] ছিল, তথাপি তাঁদের এই কাজের বিরুদ্ধে লোকজন স্বোচ্চার হয়ে উঠেছিল। রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরোধিতার কারণে তাঁরা নিজ নিজ গৃহ ও স্ব স্ব সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের বিরোধিতার কারণে প্রথম তিনমাস তাঁরা যাদবচন্দ্র বসুর বাসায় উপাসনা করতেন। 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্রে' এর বিবরণ পাওয়া যায়-

> "সভ্যগণ নানা যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও ক্লিষ্ট না হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য সাধনে দৃঢ়রূপে তৎপর ছিলেন। ধর্ম্মবিপক্ষগণের ভয়ে তাঁহারা প্রকাশ্য রূপে কিয়দ্দিবস সভা আহ্বান করণে অশক্ত হইয়া প্রতি শনি বাসরে শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বসুর গৃহে গোপনে ব্রাহ্মসমাজ করণে প্রবৃত্ত ছিলেন, এবং সন্ধ্যাকালাবধি রাত্রি নয় ঘন্টা পর্য্যন্ত পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। এইকালে সভার পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত উদয়চন্দ্র আঢ্য মহাশয় সভাভুক্ত হইয়া সভ্যগণকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। এবং কর্ম্মতঃ ব্রাহ্মগণের সদাচরণ লোকের চাক্ষুষ হওয়াতে তৎবিপক্ষ লোকের ক্রোধ ক্রমে খর্ব্বতা হওয়া প্রযুক্ত সভ্যগণেরও পুনর্ব্বার উৎসাহ বৃদ্ধি হতে লাগিল। ৩০শ ফাগুনের পর প্রকাশ্যরূপে সভা আহবান করণে তাঁহারা সক্ষম হইলেন এবং প্রথমতঃ ঐরূপ করিলে যে বিপদ্ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় এই দুর্ভাগ্য গ্রস্ত ধর্ম্ম জ্ঞান বিহীন দেশের প্রতি মহা মহিমান্বিত জগদ্বিভুর মহান আগ্রহের চিহ্ন অতি স্থূল জ্ঞানীরও অবধারণীয় বটে।"[৪৬]

১৮৪৭ সালের ৭ই মার্চ যাদবচন্দ্র বসুর বাড়িতে ব্রজসুন্দর মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র বসু, রামকুমার বসু ও বিশ্বম্ভর দাস আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এ দীক্ষানুষ্ঠানে হুগলীর যাদবচন্দ্র বসু, হালিশহরের ব্রজেনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ত্রিপুরার কীর্ত্তিনারায়ণ শর্ম্মা উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন বেলা দশটার সময় ডালবাজারের রাইমোহন রায়ও নিজ বাড়িতে ব্রজনাথ চ্যাটার্জ্জি ও গোবিন্দচন্দ্র বসুর সামনে প্রতিজ্ঞা পাঠ করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন।[৪৭] কোনো প্রতিকুল অবস্থাই তাঁদেরকে তাঁদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাঁরা তাঁদের বিবেকের আদেশে সত্যপথে চলাকেই পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

ইতোমধ্যে উদয়চন্দ্র আঢ্য ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করলেন। তাঁর উৎসাহে ১৮৪৭ সালের ১৩ মার্চ হতে প্রতি শনিবার বাংলাবাজারের শ্রীশচন্দ্র দাসের 'ত্রিপলী' নামক বাড়িতে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্রম চলতে থাকে। সভার কাজ চালানোর জন্য একজন 'বেদবিৎ পণ্ডিতকে' উপাচার্যের কাজে, একজন গায়ককে ব্রহ্ম সংগীতের কাজে নিয়োগ করা হয় এবং নিয়মাবলী প্রণয়ন ও চাঁদার ব্যাপারেও বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিত রামকুমার বেদপঞ্চানন এবং যাদবচন্দ্র বসু ছিলেন যথাক্রমে সমাজের প্রথম উপাচার্য ও সম্পাদক।[৪৮] ১৮৪৭ সালের ১৩ মার্চ হতে শুরু করে দুই বছরেরও বেশি সময় 'ত্রিপলী' নামক বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের কাজ চলতে থাকে। ১৮৫০–৫১ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় বছরখানেক সময় ব্রাহ্মসমাজের কাজ নির্দিষ্ট কোন স্থানে হয়নি।

সুবিধামত ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে এর সভা বসত। এ সময় ব্রজসুন্দর বাবু ঢাকা থেকে কুমিল্লা বদলী হয়ে গেলে সমাজের কাজ স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কয়েক বছরের মধ্যে এর অস্তিত্ব বিলীন প্রায় হয়ে পড়ে। বঙ্গচন্দ্র রায় লিখেছেন- "যে রূপে ব্রাহ্মসমাজে কাজ চলিতেছিল, তাহা নিতান্তই নিরুৎসাহজনক। পুস্তক পাঠ করিয়া উপাসনা ও উপদেশ হইত; রাত্রি নয় ঘটিকার সময় 'অয়ি সুখময়ী' উষে, কে তোমাকে নিরমিল ইত্যাদি গান হইত। আজ আমাদের কি আনন্দের দিন, আজ আমাদের বেহালা সমাজের সম্বাৎসরিক' এইরূপ উপদেশ পাঠ হইত।"[৪৯]

১৮৫১-৫২ সালে বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতালের পশ্চিমে নলগোলা নদীর ঘাটে যাওয়ার রাস্তার পাশে ব্রজসুন্দরের ভাড়াটে বাড়িতে আবার নিয়মিত রূপে ব্রাহ্মসমাজের কাজ শুরু হয়। ১৮৫৫ সালে ব্রজসুন্দর ঢাকায় ফিরে এসে তিনি পুনরায় পুনরুদ্যমে ব্রাহ্মসমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৫৫ সালে ১৬ অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মসমাজের ভাব' দেখার জন্য পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ এবং কোন্নাগর নিবাসী দয়ালচন্দ্র শিরোমণিকে নিয়ে নৌকাযোগে ঢাকায় আসেন। ঢাকা থেকে ফেরার সময় দয়ালচন্দ্র শিরোমণিকে তিনি ঢাকার উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন। উপাচার্যের মাসিক ব্যয়ের জন্য চার বছর তিনি ঢাকা ব্রাহ্মসমাজকে ১৫ টাকা হারে সাহায্য পাঠাতেন। ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লেখেন,

> "শ্রীযুক্ত বাবু বজ্রেসুন্দর মিত্র এখানকার সমাজের প্রাণস্বরূপ এবং অতি ভদ্রলোক। ... শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র শিরোমণিকে তথায় রাখিয়া আইলাম... যদিও এখানকার সমাজ প্রতি বুধবারে হইয়া থাকে তথাপি আমি সেই পর্য্যন্ত এখানে থাকিলে প্রত্যাগমনের কাল বিলম্ব হয় এজন্য গত দিবসেই এক অতিরেক সমাজ হইয়াছিল।"[৫০]

১৮৫৬-৬২ সালের মধ্যে 'ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে' কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধলোক গুরুপ্রসাদ সেন, শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি, দীননাথ সেন, দীনবন্ধু মৌলিক, রামকুমার বসু, ভগবানচন্দ্র বসু, গোবিন্দ ও প্রসাদ রায়, গিরিশচন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার যোগদান করেন। ফলে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের গতি আরো শক্তিশালী ও বেগবান হয়ে উঠে।

১৮৫৭ সালে ব্রজসুন্দর মিত্র ঢাকার আরমানিটোলায় একটি বাড়ি ক্রয় করে তাঁর একটি অংশ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ব্যবহারের জন্য প্রদান করেন। এ বাড়ির দোতলার বড় একটি কক্ষে প্রতি বুধবার সন্ধ্যাকালে উপাসনাদি হতো। হারানচন্দ্র সরকার ও দেবেন্দ্রনাথ প্রেরিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি উপাচার্যের কাজ করতেন।

১৮৬১ সালে দীননাথ সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও গোবিন্দপ্রসাদ রায় 'ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে'র সংশ্রবে ছাত্রদের জন্য একটি শাখা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা 'ঢাকা প্রকাশ'-এ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ধর্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশ শোনার জন্য ছাত্রদের আহ্বান জানান এবং কারো মনে কোন সংশয় জন্মালে তা মীমাংসা

করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[৫১] দীননাথ বাবু এখানেই থেমে থাকেননি। সমাজ সংস্কারে তিনি বিদ্যাসাগরের মতো পূর্ববঙ্গে 'বিধবা বিবাহের' উদ্যোগ নেন, দুর্নীতিগ্রস্ত ছাত্রদের সঠিকপথ নির্দেশকল্পে তিনি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম শিক্ষা প্রবর্তনে প্রয়াসী হন। তিনি "ব্রজসুন্দর বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া তাঁহারা এজন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্রজসুন্দর বাবু মাসিক ৩০ টাকা সাহায্য করিতে ও বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য আরমানিটোলার গৃহের নীচের কয়েকটি ঘর ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হন।"[৫২]

১৮৬৩ সালে দীননাথ সেনের উদ্যোগে তাঁর তাঁতি বাজারের বাসায় প্রথম দৈনিক উপাসনা আরম্ভ হয়। বঙ্গচন্দ্র রায়, তারকবন্ধু চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর ঘোষাল তাঁরা একত্রে বাস করতেন এবং সমবেত হয়ে দৈনিক উপাসনায় বসতেন।

১৮৬৩ সালের শেষভাগে বরিশাল থেকে ঢাকায় আসেন দুর্গামোহন দাস ও কালীমোহন দাস। তাঁরা ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে 'ভ্রাতৃসমাজ' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদ প্রথার কুপ্রভাব দূর করা। প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার, শিবচন্দ্র নাগ এবং আরো কিছু শিক্ষিত যুবক 'ভ্রাতৃসমাজ' এর সভ্য হয়ে প্রকাশ্যে জাত পরিত্যাগ করেন। ফলে সনাতন সমাজ প্রবল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু করে।

১৮৬৪ সালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য অঘোরনাথ গুপ্তকে ঢাকায় পাঠান। এসময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ধর্ম প্রচারের কাজে ঢাকা আসেন। ফলে হিন্দু সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তবুও বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেনের মতো সদেস্যরা এবং কালীমোহন দাস, দুর্গামোহন দাস দুই ভাইও যোগ দেন। এর কিছুদিন পরে এসেছিলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন। ফলে সমস্ত ঢাকা উদ্বেলিত হয়ে উঠে।[৫৩] বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রচার শুধু ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর অগ্নিঝরা বক্তব্যে শিক্ষিত সমাজ টলে উঠে। ১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র সেন ঢাকায় এলে কোলকাতার অনুকরণে এখানেও স্থাপিত হয় 'সঙ্গত সভা'। বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেন, তারকবন্ধু চক্রবর্তী, আদিনাথ দাস 'সঙ্গত সভার' প্রথম সভ্য। ক্রমে 'সঙ্গত সভার' সভ্য বাড়তে থাকে। প্রসন্ন কুমার রায়, কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত, প্যারীমোহন গুপ্ত, কালীনারায়ণ গুপ্ত, কালী নারায়ণ রায়, রজনী কান্ত ঘোষ, বসন্তকুমার বসু, কালীপ্রসন্ন বসু, অম্বিকাচরণ সেন, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বরদানাথ হালদার, সরদাকান্ত হালদার, বিহারীলাল সেন, কৈলাসচন্দ্র নন্দী, কেদারনাথ রায় 'সঙ্গত সভার' সভ্য হয়েছিলেন। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় 'সঙ্গত সভার' অধিবেশন আরম্ভ হতো এবং পাঠ, আলোচনা, প্রার্থনা, সভ্যগণের দিনদিপি পাঠ, কখনো ব্যক্তিগত লিপিতে স্বীয় দোষ স্খলন প্রভৃতি আলোচনা, এবং উপাসনা ও সঙ্গীত হতো।[৫৪]

জালালউদ্দিন মিয়া এক দরিদ্র ছাত্র, ব্রাহ্ম মেসে থেকে ব্রাহ্ম স্কুলে পড়তেন। তিনি 'সঙ্গত সভার' একজন সভ্য ছিলেন। 'সঙ্গত সভার' সদস্য প্রসন্নকুমার সেন বিয়ে করে ফিরে এসে মেসের বন্ধুদের জন্য একটি ভোজের আয়োজন করেন। জালালউদ্দিনও সেখানে নিমন্ত্রিত হন। বঙ্গচন্দ্র রায়, কৃষ্ণগোবিন্দ ও ভুবনমোহন দাস বন্ধুরা মিলে জালালের সঙ্গে একত্রে আহার করেন। বিষয়টি জানাজানি হলে শহরে হুলস্থূল পড়ে যায়। হিন্দুরা সামাজিক নির্যাতনে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু কোনো প্রতিকূলতাই ব্রাহ্মসমাজের গতিকে রুদ্ধ করতে পারেনি। ষাটের দশকে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ ছিল অত্যন্ত জমজমাট। এ প্রসঙ্গে ব্রজসুন্দরকে অঘোরনাথ গুপ্ত একটি চিঠিতে লেখেন (১৭.০৭.১৮৬৫)

> "...আজকাল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র। এখন কিঞ্চিৎ জীবন্তভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের মধ্যে উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। সম্প্রতি উপাসক সংখ্যা অধিক হওয়ায় সমাজে আর স্থান বা আসনের সমাবেশ হয় না। তাড়িত ব্রাহ্মদিগের নিমিত্ত যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহার আর প্রয়োজন হইতেছে না। ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। প্রাচীনদিগের কাল্পনিক বল আর কতদিন থাকিবে।"[৫৫]

লালবাগ, বাংলাবাজার ও আরমানিটোলা এ তিন স্থানে ছিল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়। কিন্তু সমাজের সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপাসনার জন্য একটি স্বতন্ত্র মন্দিরের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। প্রায় ১৫ হাজার টাকা ব্যয়ে তৎকালীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়েছিল বর্তমান জগন্নাথ কলেজের পাশে।[৫৬] ১৮৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর মন্দিরের দ্বার উদ্বোধন করা হয়েছিল।

৬ ডিসেম্বর ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাংবাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়েছিল। এ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে কেশবচন্দ্র তৃতীয় বা শেষবারের মতো ঢাকায় আসেন। ৬ ডিসেম্বর উপাসনা, ধর্ম ও সংস্কার বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা হয়ে রাত দশটায় সভা শেষ হয়। ৭ ডিসেম্বর কেশবচন্দ্রের কাছে ৬৬ জন উৎসাহী ব্রাহ্ম দীক্ষা লাভ করেন। এ দীক্ষা অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মের সংখ্যা কত ছিল এ নিয়ে শ্রী বঙ্কবিহারী কর নিজেও কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। তিনি তাঁর 'পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের 'পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার উৎসব' অধ্যায়ের শেষের প্যারায় দীক্ষা গ্রহণকারী ব্রাহ্মের সংখ্যা বলেন ৬৬। আবার একই প্যারায় নামের একটি তালিকা দিয়ে ৩১ জনের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে জানান। ঠিক পরের লাইনেই 'ধর্ম্মতত্ত্বে লেখা হইয়াছে ৩৬জন দীক্ষা গ্রহণ করেন' বলেও জানান। ব্রাহ্মের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করার সঠিক তথ্য উপাত্ত যেমন বঙ্কবিহারী করের নাগালের বাইরে ছিল, তেমনি কালের বিবর্তনে তা আরো দুর্লভ হয়ে উঠেছে। ফলে সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা আমাদের জন্যও দুরূহ ব্যাপার।

যাই হোক ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৮ সালের 'কোচবিহার বিবাহ' ঝড়ের আগ পর্যন্ত 'ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ' অপ্রতিবোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছিল। সমাজ সংস্কার, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, কুলীনকন্যা উদ্ধার, বাল্যবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি সামাজিক কার্যে 'ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ' সাফল্য অর্জন করেছিল। এ কর্মকাণ্ড

পরিচালনায় ব্রাহ্মসমাজের নবীণ প্রবীণদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। ছোটখাট বিরোধ দানা বেঁধেছিল আবার মিটেও গিয়েছিল। কিন্তু ১৮৭৮ সালে কেশবচন্দ্রের 'কোচবিহার বিবাহের' আত্মবিধ্বংসী সিদ্ধান্ত কলকাতার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাথে সাথে 'ঢাকার ব্রাহ্মসমাজকে'ও দুভাগে বিভক্ত করে ফেলে। বঙ্গচন্দ্র রায় ছিলেন উপাচার্য, তিনি তখন মুঙ্গেরে অবস্থান করছিলেন। কেশবচন্দ্রের কন্যার বিয়ের প্রতিবাদ না করাতে তিনি বেদীচ্যুত হন, তাঁকে সদলে 'পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ' হতে বহিস্কৃত হতে হয়।[৫৭] কেশবচন্দ্রের কন্যার বিয়ের প্রতিবাদী দল যেমন কোলকাতায় তেমন ঢাকাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার পর 'পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজ' ঐ সমাজের সহযোগী সমাজ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর নববিধান সমাজ পরে আরমানিটোলায় নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র উপাসনাগার তৈরি করেছিল। অতঃপর দুই সমাজ পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ সমাজের উন্নতি সাধনে পরবর্তী দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যত্নবান হয়েছিলেন।

ময়মনসিংহের ব্রাহ্মসমাজ

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন 'ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ' এর ইতিবৃত্তের প্রথম অধিনায়ক। ১৮৫৩ সালে ময়মনসিংহে গভর্মেন্ট ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এ স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে আসেন। তখন আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিতদের ধর্মসংস্কার সমগ্র বাংলা জুড়েই তুমুল আলোড়ন তুলেছিল, ময়মনসিংহেও সে জোয়ার লেগেছিল। ভগবান বসুর সার্বিক সহযোগিতায় কালীকুমার মোক্তারের বাড়িতে প্রথম সাপ্তাহিক উপাসনা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীনাথচন্দ্র বলেন-

> "ঐ স্থানে কালী গাঙ্গুলী নামক একজন মোক্তার বাস করিতেন; তাঁহার বাসায় ইংরেজী স্কুলের শিক্ষক বাবু ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস ও বাঙ্গালা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুহ মহাশয়দিগের বিশেষ উদ্যোগে ১৮৫৪ সনের ৭ই জানুয়ারি প্রথম ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয়।"[৫৮]

ভগবানচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, গোবিন্দবাবু এবং মানিকগঞ্জ নিবাসী ত্রিপুরাসঙ্কর গুপ্ত 'ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের' প্রথম সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরই তা ভগবানচন্দ্র বসুর বাসায় উঠে গিয়েছিল। তখন সমাজের নির্দিষ্ট কোনো সভাগৃহ ছিল না। বিভিন্ন সভ্যের বৈঠকখানায় উপাসনার কাজ চলত। এভাবে অতিক্রান্ত হয়েছিল দশবছর। তখন ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে আদি সমাজের পদ্ধতি অনুসরণে ব্রহ্মোপাসনা হতো এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠ ও রামমোহন রায়ের বৈরাগ্য সঙ্গীত গাওয়া হতো। তখনকার ব্রাহ্মসমাজে শুধুমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা হতো, ধর্মসাধন তখনও শুরু হয়নি, অনুষ্ঠানাদিরও সূত্রপাত হয়নি।[৫৯]এ সময়ে পূর্বোক্তরা ছাড়াও পার্বতীচরণ রায়, জগদানন্দ সেন, পরমানন্দ সেন, প্রভৃতি শিক্ষকবর্গ এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কালিকাদাস দত্ত, খাজাঞ্চি ও জমিদার বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল বাবু কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, জানকীনাথ কর, হেডক্লার্ক বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাস ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। শেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীও ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৮৬৫ সালে ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি বাড়ি ক্রয় করা হয়। একই সনের ১২ মার্চ থেকে ঐ বাড়িতে ব্রহ্মোপাসনা চলতে থাকে। ১৮৬৫ সালে বাবু কালিকাদাস দত্ত, কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ ও পার্বতীচরণ রায় একটি 'লিটারেচর ক্লাব' স্থাপন করেন। এ সভায় স্থানীয় শিক্ষিতগণ উচ্চ মার্গের সাহিত্য, সমাজ ও নীতি বিষয়ক বক্তৃতা করতেন। স্থানীয় শিক্ষিত ব্রাহ্মরা নানা প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে তা প্রাণস্পন্দন পায়নি। সেই বছর ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহে আসেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু তিনি তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেননি। এর দুবছর পর ১৮৬৭ সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর বক্তৃতার বিজয়ভেরীতে ময়মনসিংহ নগরকে কম্পিত করে তোলেন। "১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে অগ্নি প্রধূমিত রাখিয়া যান, ১৮৬৭ সালের প্রথম ভাগে মহাতেজস্বী প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ এখানে আসিয়া সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় যেন অগ্নিবৃষ্টি হইত। উহাতে মৃত জীবনে নবচেতনার সঞ্চার হইত।"[৬০] তাঁর বক্তৃতা ময়মনসিংহ শহরের সনাতনী ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে জাতিভেদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, জমিদার রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজ্ঞাপনী পত্রিকার সম্পাদক জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী উপবীত ত্যাগ করেন। ময়মনসিংহ নগরীতে সে সময় ধর্ম সংস্কারকে কেন্দ্র করে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মদের মন তখন নবোন্মাদনার নব শিহরণে উদ্বেল হয়ে উঠে। গিরিশচন্দ্র সেনও ছিলেন তাঁদের একজন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ওজস্বী বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে অন্যান্য ব্রাহ্মের মতো তিনিও উপবীত ত্যাগ করেন এবং তাঁদের সঙ্গে পংক্তিভোজনও করেন।[৬১]

ব্রাহ্মসমাজের এহেন আচরণে সনাতনী হিন্দুসমাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। হাজার বছরের প্রাচীন রীতিনীতিকে ভেঙ্গে একদল উচ্ছৃঙ্খল পথভ্রষ্ট যুবক হিন্দুসমাজকে বিপথে নিয়ে যাবে তা সনাতনীরা মানতে পারেননি। তাঁদের গতিকে রুদ্ধ করার জন্য তারা প্রতিরোধ সভা গড়ে তোলেন এবং ব্রাহ্মদের ওপর সামাজিক অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু করেন। তাঁদেরকে একঘরে ও সমাজচ্যুত করে ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতিকে তারা রোধ করতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শ্রী কেদারনাথ মজুমদার তাঁর 'ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহ বিবরণ' গ্রন্থে বলেন,

> "১৮৫৪ সনে শহরের ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, ত্রিপুরাশঙ্কর গুপ্ত, গোবিন্দচন্দ্র গুহ প্রভৃতি শিক্ষিত লোক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ করিয়া সহরে তুমুল আন্দোলন স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। নিষ্ঠাবান হিন্দুরা আপন আপন ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র ভাগিনেয় প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বাসায় বাসায় যেখানে সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বার বৎসর কাটিয়া গেল। ব্রাহ্মধর্ম্মের কোলাহল সহর জয় করিয়া পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ করিল।"[৬২]

এ সময় জেলাস্কুলের কয়েকজন ছাত্র– শ্রীনাথ চন্দ, রামসুন্দর গুণ, অনাথবন্ধু গুহ, প্রসন্নকুমার সেন ও কৃষ্ণকুমার সমাজে যাতায়ত করতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি গভীর আকর্ষণে তাঁরা ১৮৬৭ সালের ২৩ আষাঢ় ময়মনসিংহ শাখা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। কালক্রমে শাখা সমাজের অনেকেই ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম আন্দোলনকে প্রধানত বেগবান করেন সেখানকার স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ।[৬৩]

১৮৬৮ সালে শীত ঋতুতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তৃতীয়বারের মতো ময়মনসিংহে আসেন। তাঁর আগমনে ময়মনসিংহ উত্তাল হয়ে উঠে। "বস্তুতঃ তখন বিজয়কৃষ্ণের অগ্নিময় বক্তৃতা, সুমধুর উপাসনা ও ভক্তি-রস-পূর্ণ সংকীর্ত্তনে এই নগর যেন টলমল করিতেছিল। তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রসঙ্গ ভিন্ন লোকের মুখে অন্য কথা ছিল না।"[৬৪] এ সময় পুরনো মন্দির জীর্ণ হওয়ায় জমিদার চৌধুরীর অর্থ সাহায্যে নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং ১৮৬৯ সালের ৫ই পৌষ ময়মনসিংহ ব্রাহ্মমন্দির উদ্বোধন করা হয়েছিল।

১৮৭০ সালে অঘোরনাথ গুপ্ত আসাম প্রচারার্থে বাইর হন। তাঁর প্রচারাভিযানের কথা জানতে পেরে ময়মনসিংহের ব্রাহ্মগণ ময়মনসিংহকেও তাঁর প্রচারযাত্রার অঙ্গীভূত করার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। ব্রাহ্মদের ইচ্ছানুযায়ী তিনি নৌপথে ময়মনসিংহে আসেন। সে বার তিনজন বয়স্ক ব্যক্তি ও চারজন তরুণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন বাবু কালীকুমার বসু, হরমোহন বসু, ললিতমোহন রায়, শরৎচন্দ্র রায়, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, দীননাথ চক্রবর্তী ও শ্রীনাথ চন্দ। এরপর ব্রাহ্মদের ওপর হিন্দুদের অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা অনড় থাকলেন এবং ১৮৭৮ সাল নাগাদ নিজেদের জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন স্বতন্ত্র আবাসস্থল, দোকান, স্কুল এমনকি সংবাদ পত্রও।[৬৫] ব্রাহ্মদের এ আলাদা উদ্যোগ কালের সাক্ষী হয়ে এখনো 'ব্রাহ্মপল্লী' হিসেবে ময়মনসিংহে পরিচিত।

১৮৭৮ সালের 'কোচবিহার বিবাহ' ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজকেও তছনছ করে দিয়েছিল। ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শেষ পর্যন্ত চরম বিরোধের আকার ধারণ করেছিল। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের মধ্যে প্রতিবাদকারী ছিলেন সংখ্যা গরিষ্ঠ আর কেশবভক্ত ছিলেন মাত্র চার জন। এ চার জনই ব্রাহ্মমন্দির নিজেদের দখলে রাখলেন, অধিকাংশ সভ্য এবং বহু সংখ্যক নিয়মিত উপাসক মন্দির পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।[৬৬] অবশেষে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। পরে অবশ্য আপোষ মীমাংসা হয়েছিল। ১৮৮২ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের স্বতন্ত্র্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সেই থেকে উভয় ব্রাহ্মসমাজ আলাদাভাবে তাঁদের উপাসনা ও প্রচারব্রতে মগ্ন থাকতেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ

১৮৬০ সালে রামতনু লাহিড়ী বরিশাল জেলা স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে আসেন। তাঁর আগমনের মাধ্যমেই বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত ঘটে। রামতনু অবশ্য দীর্ঘদিন বরিশালে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর আধুনিক চিন্তা-ভাবনা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও ধর্মচেতনা ছাত্রদের ওপর সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। রামতনুরই ছাত্র রাখালচন্দ্র রায় পরে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতিতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তিনি বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্মী হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। এ রাখালচন্দ্র ছিলেন লাখুটিয়ার জমিদার নন্দন।

ঢাকা নর্মাল স্কুল থেকে পাস করা ব্রজসুন্দর মিত্রের আদর্শে প্রভাবিত পাঁচজন যুবক ১৮৬০ সালের এপ্রিলে বরিশালে এসে মিলিত হন। এঁরা হলেন নন্দকুমার সেন, হরিশচন্দ্র মজুমদার, গোপীনাথ রায়, বিদ্যাধর রায় এবং ললিতমোহন সেন। এ পাঁচজনের সঙ্গে অন্নদাচরণ বর্মা নামক একজন প্রগতিশীল যুবকও যুক্ত হয়েছিলেন। এ ছয়জনের সঙ্গে রাখালচন্দ্র রায় মিলে তাঁর পিতৃগৃহে প্রথমে ব্রহ্মোপাসনা শুরু করেন। তাঁদের ব্রহ্মোপাসনার মধ্য দিয়েই 'বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৭] রাখালচন্দ্রের বাবা উকিল রাজচন্দ্র রায় যখন তা জানতে পারলেন, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং উপাসনার কাজে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। এরপর তাঁরা প্রতি বুধবার গাছের ছায়ায় বা নদীর তীরে মিলিত হয়ে উপাসনা করতে লাগলেন।"এ সময় তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্যামচন্দ্র বোস। তিনি তাঁর বাড়ির একটি ঘর এদের উপাসনার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। একই সময় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বরিশালে এসে সমাজের কাজে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারাপ্রসাদ তাঁর বাড়ির একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে ছিলেন ব্রাহ্মদের কাজের জন্যে এবং সে থেকে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মেরা কাজকর্ম শুরু করেছিলেন।"[৬৮]

১৮৬৫ সালে সরকারী উকিল কাশীশ্বর দাসের ছেলে দুর্গামোহন দাস 'বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে'র সভ্য হলেন। দুর্গামোহন দাস শুধু বরিশাল ব্রাহ্মসমাজেই নয় সামগ্রিক ব্রাহ্মসমাজের উন্নয়নে এক অবিস্মরণীয় নাম। দুর্গামোহন তখন একেশ্বরবাদ এবং থিয়েডোর পার্কারের ভাবনায় তন্ময় ছিলেন। আদর্শিক মিলের কারণে তিনি নিবেদিত প্রাণ ব্রাহ্মে পরিণত হন। দুর্গামোহন দাসের একাত্মতায় আর অন্নদাচরণ খাস্তগীর, হরিশচন্দ্র মজুমদার, সর্বানন্দ দাসের সহযোগিতায় বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ উজ্জীবিত হয়ে উঠে। দুর্গামোহন সভাপতি আর সর্বানন্দ দাস সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ সালের নভেম্বর মাসে স্থানীয় জমিদার চণ্ডীচরণ মজুমদার প্রদত্ত একখণ্ড জমির ওপর নির্মিত হয় বরিশাল ব্রাহ্মমন্দির। সেই বছর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রচারাভিযান চালিয়ে তাঁর বক্তৃতায় সমগ্র উপমহাদেশে নবপ্রাণ সঞ্চার করেন। রাখালচন্দ্র তাঁকে বরিশালের নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান এবং প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্মে তাঁর সস্ত্রীক বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর ছোট ভাই প্যারীলাল রায়ও একইমতে বিশ্বাস স্থাপন করেন।[৬৯]

১৮৭১ সালে দুর্গামোহন কোলকাতায় চলে যান। তখন বরিশাল জেলা স্কুলের হেডমাস্টার জগৎবন্ধু লাহা ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করেন। সঙ্গত সভা,স্ত্রী উন্নতি সভা, বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি সামাজিক সংস্কার তিনি করেন অত্যন্ত সিদ্ধ হস্তে। দুর্গামোহন দাস প্রসঙ্গে ঝরা বসু বলেন,

> "বরিশালের দুর্গামোহন দাস ও তাঁর স্ত্রী ব্রাহ্ম আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের ফলে বরিশালের আপামর জনসাধারণ সমাজ সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতির পথিকৃৎ বরিশাল। বরিশালের ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই পৌত্তলিকতার সংশ্রব ত্যাগ করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ব্রহ্ম উপাসনা করতেন না– কিন্তু সমাজ সংস্কার ও সাহিত্য সৃষ্টির কাজে তাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন। 'ব্রাহ্মবাদী' পত্রিকাটি শুধু বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র মাত্র নয়, এটি সাহিত্য পত্রিকারূপে বিবেচিত হতে পারে। বরিশালের অনেক মুসলমান পরিবার এগিয়ে এসেছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। দুর্গামোহন দাস বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অনেক কাল। পরে তিনি কোলকাতা এসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাল ধরেন।"[৭০]

১৮৭৮ সালে 'কোচবিহার বিবাহে'র বিরুদ্ধে ছিল 'বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ'। স্বাভাবিক কারণেই এ সমাজ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'কে সমর্থন করেছিল।

বাঘ-আঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ

যশোহর জেলার বাঘ-আঁচড়া একটি বিখ্যাত গ্রাম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গ্রাম হিসেবে বাঘ আঁচড়া সমধিক খ্যাত ছিল। ১৮৬০-৬৩ সালের মধ্যে এ গ্রামে ব্রাহ্মসমাজের ভাবধারা অনুপ্রবেশ করে। ১৮৬৪ সালে গোস্বামী ডাক্তারি পড়ছিলেন। পরীক্ষা নিকটে। কিন্তু তিনি যখন শুনতে পেলেন বাঘ আঁচড়ার কয়েকটি পরিবার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে চায় কিন্তু আচার্যের অভাবে সেটি সম্ভব হচ্ছে না, তখনি তিনি ছুটলেন বাঘ-আঁচড়া গ্রামে। ব্রহ্মনাম প্রচারকেই তিনি আশু কর্তব্য বলে স্থির করেছিলেন। বাঘ-আঁচড়া গ্রামে নয় দিন ছিলেন। তেইশটি পরিবারকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।[৭১] কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, গোবিন্দচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এখানে 'সঙ্গত সভা' ধরণের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রামের মল্লিক পরিবার এ এলাকায় সমাজ স্থাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কোলকাতা ব্রাহ্মসমাজের কাজে বিজয়কৃষ্ণকে চলে আসতে হয়েছিল বলে এখানকার ব্রাহ্মসমাজের কাজ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। 'নরপূজা আন্দোলন'কে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের মতভেদ দেখা দিলে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন। এতে বাঘ-আঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ কিছুটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।[৭২] বাঘ-আঁচড়া গ্রামের ব্রাহ্মরা বেশিরভাগই দরিদ্র অশিক্ষিত। ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের জন্য শিক্ষার সুযোগ এনে দেয়। এ সমাজ থেকে ব্রাহ্ম আচার্য হিসেবে শিক্ষিত হবার জন্য শশধর হালদারকে ম্যাঞ্চেস্টার বৃত্তিসহ অক্সফোর্ডে পাঠানো হয়েছিল।[৭৩] বাঘ-আঁচড়ার ব্রাহ্মসমাজ ছিল সাধারণ মানুষের ব্রাহ্মসমাজ। তাদের জীবন থেকে কুসংস্কার অন্ধত্ব দূর করে প্রগতিশীলতার আলো পৌঁছে দেওয়াই ছিল এ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য।

১৮৭৮ সালে 'কোচবিহার বিবাহ' আন্দোলনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাঘ-আঁচড়ায় থেকেই প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হলে বাঘ-আঁচড়া এ সমাজে পরিণত হয়েছিল এবং এ সমাজ থেকেই পরবর্তী কার্যক্রম চালিয়েছিল।

পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন ১৮৪৬ সালে শুরু হলেও তা গতি পেয়েছিল ১৮৬০ সালের দিকে। ১৮৬০ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত সময়কে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলনের স্বর্ণযুগ বলা চলে। ঐ সময় পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের কর্মদক্ষতা বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে, নারীর কল্যাণে, ধর্মসংস্কারে, মানবীয় মূল্যবোধে সর্বোপরি দেশ জাতির অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। তাঁরা আধুনিকতার অবগাহনে দেশ ও জাতির অন্তরাত্মায় বিশুদ্ধ আলোর প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁরা যে অবিস্মরণীয় সার্থকতা অর্জন করেছিলেন তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

গ. ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ভাই গিরিশচন্দ্রের সম্পৃক্ততা

একজন পাকা হিন্দুর মতো আচরিত ধর্মবোধে কেটেছিল গিরিশচন্দ্রের প্রথম জীবন। জাতিভেদের জ্ঞানও ছিল তাঁর প্রবল। ঠাকুর দেবতার প্রতি অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধায় তিনি ছিলেন সনাতনী পূর্বসূরীদেরই যোগ্য প্রতিনিধি। পূজা অর্চনায় নিমগ্ন গিরিশচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর পারিবারিক ধর্মবোধেই অবরুদ্ধ ছিল। প্রথম যৌবনে এসে অবশ্য তিনি ধর্মকর্মে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। "তখন আমার কোন ধর্ম্মে কোনরূপ বিশ্বাস ছিল না, আমি একজন অদ্ভুত জন্তুর স্বভাব ধারণ করিয়াছিলাম।"[৭৪] ছাত্রজীবনে ময়মনসিংহে অবস্থানকালে তিনি ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর ভগ্নিপতি কালীনারায়ণ গুপ্ত উক্ত সমাজের একজন সভ্য ছিলেন। গিরিশচন্দ্র তখন ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন মানবতাবাদী যুগন্ধর পুরুষ। কোনো ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। মানব সেবাই ছিল তাঁর জীবনের পরম ব্রত। কখনো প্রগতির উত্তরণে, কখনো মানব সেবায় সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধর্ম প্রবক্তার সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। আর সেযুগে ব্রাহ্মরা ছিল কলকাতার সবচেয়ে শিক্ষিত এবং উন্নতমনা ধনাঢ্য শ্রেণি। স্বাভাবিক কারণেই ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর উঠাবসা ছিল। গিরিশচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থাদি পড়তেন। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্রাহ্ম সমাজের একজন সভ্য তখন তাঁর অন্তরে তাঁর প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা জন্মেছিল। এমনকি বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বোধোদয়' স্পর্শ করতেও তিনি সঙ্কুচিত হতেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর ছিল এতটাই ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা। গিরিশচন্দ্রের এহেন মনোভাব দেখে তাঁর ভগ্নিপতি বলেছিলেন "মরুভূমিতে ফুলের বাগান হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু ইহার কঠিন হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।"[৭৫]

এসময় গিরিশচন্দ্র কোনো ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। আর ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তো ছিলেন একান্তই অনাগ্রহী। ময়মনসিংহে ব্রাহ্মধর্মের প্রসার তখন সবে মাত্র শুরু হয়েছে। শিক্ষিত মানুষগুলোর আনাগোনা ক্রমশ বাড়ছে এবং সমাজের কার্যপ্রণালীতে অগ্রগতিও দেখা দিয়েছে। একদিন গিরিশচন্দ্র তাঁর কিছু ছাত্র বন্ধুর সঙ্গে কৌতূহলবশত ভগবান বাবুর আবাসে ব্রাহ্মদের উপাসনা দেখতে যান। সেদিন ভগবান বাবুদের উপাসনা পদ্ধতি তাঁদের কাছ অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয়েছিল। তারপর অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর কোনো ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেনি। এদিকে, মুড়াপাড়ার জমিদার ক্যালেক্টরীর খাজাঞ্চি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছোটদাদা হরচন্দ্রের বদান্যতায় একটি পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সে পরিবারে তিনি প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। রামচন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় ব্রাহ্মসামজের উপাসনা হতো। রামচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরে ব্রাহ্মসমাজে তাঁর যাতায়ত বাড়তে লাগল এবং ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতেও যোগ দিতে লাগলেন। সমাজের ব্যাখ্যান ধীরে ধীরে তাঁর কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হতে লাগল। তিনি আগ্রহ সহকারে ব্যাখ্যান শ্রবণ করতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর অন্তরের বিদ্বেষ দূর হতে লাগল। তিনি প্রত্যহ স্নানান্তে 'নমস্তে সতে তে জগৎকরুণাময়' এই ব্রহ্ম স্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন।[৭৬]

এ মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি আত্মিকভাবে ব্রাহ্মসমাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিলেন, বাকি ছিল অনুষ্ঠানিকতা। ১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহে কৃষি প্রদর্শনী মেলা চলাকালীন ব্রাহ্মসমাজের নবজীবনদাতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রচারার্থে পূর্ববঙ্গে আসেন। তিনি ঢাকার বিভিন্ন স্থানে প্রচারাভিযান চালিয়ে ময়মনসিংহে এসে উপস্থিত হন।[৭৭] প্রচারকার্যে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত। জাতি যাওয়ার ভয়ে ময়মনসিংহের কোনো ব্রাহ্ম তাঁদেরকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারেননি। সমাজগৃহের পাশে তাঁদের অবস্থিতির জন্য তাবু খাটানো হয়। সে বারই প্রথম গিরিশচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে দেখেন। কেশবচন্দ্র ছিলেন দীর্ঘাকৃতির ক্ষীণাঙ্গ যুবা। তাঁর বাগ্মীতার বহু প্রশংসা তিনি শুনেছিলেন। কেশবচন্দ্রকে দেখার অভিপ্রায়ে তিনি প্রতিদিন দুবেলা তাবুর কাছে যেতেন এবং ব্রহ্মানন্দের বাক বৈদগ্ধের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায় তিনি মুগ্ধ হতেন। আচার্য কেশবচন্দ্র চারদিন ময়মনসিংহে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি একদিন ইংরেজিতে ও একদিন বাংলায় বক্তৃতা দেন আর অঘোরনাথ উপাসনার কাজ করেন। কেশবচন্দ্র সেনের সান্নিধ্যে এসে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বী বক্তৃতা শুনে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন সত্য কিন্তু তখনো তিনি সামাজিক ভীতির উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। এমনকি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তিনি পংক্তি ভোজন পর্যন্ত করতে পারেননি। সে দুঃসাহস তাঁর ছিল না। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পঙক্তি ভোজন তো দূরের কথা জাত যাওয়ার ভয়ে তখন পাউরুটি পর্যন্ত তিনি ভোজন করতে পারেননি।[৭৮] কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তিনি পঙক্তি ভোজন করতে না পারলেও তাঁর ভেতর যে ব্রাহ্মধর্মের বীজ উপ্ত হয়েছিল সে বিষয়ে আমাদের আর সন্দেহ নেই। এ বীজ চারাগাছে রূপান্তরিত হয়ে অতি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্মের মহীরূহে পরিণত হয়েছিল। মাত্র দুবছর পর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রচারার্থে ময়মনসিংহে আসেন। তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতা গিরিশচন্দ্রের ভিতকে সজোরে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি এতটাই দৃঢ় মনোবল ফিরে পেয়েছিলেন যে গোস্বামীর সঙ্গে তিনি পঙক্তি ভোজন করেছিলেন। এরপর সামাজিকভাবে তিনি হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। ময়মনসিংহের সমাজ তাঁকে একঘরে করে রেখেছিল। দুর্দিনে-দুর্দশায় এমনকি ভয়ানক বিপদেও কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। ধর্মচ্যূত হওয়ার অভিযোগে পাঁচদোনার পরিবারও তাঁকে গ্রহণ করতে পারেনি। পরে অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাঁর পরিবার তাঁকে সমাজে তোলার নানা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোনো প্রতিকূলতাই তাঁর ধর্মচেতনায় প্রভাব ফেলতে পারেনি।

গিরিশচন্দ্রের ধর্মজীবনে রয়েছে গভীর নিষ্ঠাজনিত সাধনাব্রত। স্ত্রী ব্রাহ্মময়ীর মৃত্যুর পর তিনি বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করে তাঁর ধর্মসাধনাকে আরো তীব্রতর করেন। তিনি প্রচারকার্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ময়মনসিংহের ব্রাহ্মবন্ধুদের কাছ থেকে মনঃকষ্ট পেয়ে তিনি কলকাতা ভারতাশ্রমে চলে যান। সেখানে তিনি কেশবচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসেন। কেশবচন্দ্রের ধর্মনিষ্ঠা তাঁকে চুম্বকের মতো তাঁকে আকর্ষণ করত। তাঁরই অনুপ্রেরণায় গিরিশচন্দ্র ধর্মসেবাতে আজীবন নিমগ্ন ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম সেবাকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেও তিনি রীতি অনুযায়ী দীক্ষা গ্রহণ করেননি। কারণ গিরিশচন্দ্রের সময়ে তার আবশ্যক ছিল না। তিনি যখন নিম্ন-আসাম ও মধ্য-আসামে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন আচার্য কেশবচন্দ্র 'রবিবাসরীয় মিরার' পত্রিকায় তাঁর

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করে তাঁকে প্রচারক বলে জ্ঞাপন করেন। এরপর গিরিশচন্দ্র “১৭৯৬ শকের ২৬ শে ভাদ্র আমি প্রচারক সভায় প্রথম যোগদান করি, এবং উক্ত সভায় উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর আমার নাম লিখিতে হয়।”[৭৯] আর এভাবেই তিনি প্রচারব্রতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন।

কেশবচন্দ্রের আন্তরিকতায় ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। এ সম্পৃক্ততা তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অটুট ছিল। ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’-এর অন্তর্দ্বন্দ্ব, নানা আন্দোলন এমনকি ‘কোচবিহার বিবাহের’ তুমুল ঝড় ঝাপটাও সে অটুট বন্ধনকে শিথিল করতে পারেনি।

তথ্যসূত্র

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য;* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ; কলিকাতা; পুনর্‌মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৯৪; পৃ.-৮৭।

২. সুরজিৎ দাশগুপ্ত; *রামমোহন: ব্যক্তিতন্ত্র ও বিশ্বতন্ত্র;* সংস্কার; ১২এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩; জানুয়ারি-২০১৩; পৃ.-১৩-১৪।

৩. উদ্ধৃত; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; প্রাগুক্ত; পৃ.-৮৭।

৪. প্রসাদরঞ্জন রায় সম্পাদিত; *রামমোহন রচনাবলী*; রামমোহন মিশন; ১৬২/৬৯, লেক গার্ডেনস্‌, কলকাতা-৭০০ ০৪৫; নতুন সংস্করণ: নভেম্বর ২০১৫।

৫. রহমান হাবিব; *রাজা রামমোহন রায় দর্শন ও ধর্মচিন্তা;* বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ- জুন, ২০১০; পৃ.-৮৩।

৬. শ্রী বিপিনপাল; *চরিতকথা;* ৩৭ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত; কলিকাতা; ১৩২৩; পৃ.-১৪৯।

৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; প্রাগুক্ত; পৃ.-৮২।

৮. ডক্টর এম. মতিউর রহমান; *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ উনিশ শতক*; অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০; প্রথম অবসর প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৩; পৃ.-২১৭।

৯. বারিদবরণ ঘোষ; *ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস;* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন; কলকাতা ৭০০ ০০৯; দ্বিতীয় সংস্করণ ও প্রথম নিউ এজ প্রকাশনা ২০০৯; পৃ.-৫।

১০. শ্রী বিপিনপাল; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৪৭-১৪৮।

১১. শ্রী অনীলচন্দ্র ঘোষ এম.এ; *রাজর্ষি রামমোহন;* প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী; ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩; বর্তমান সংস্করণ- জুন ২০১২; পৃ.-৩২।

১২. উদ্ধৃত; নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত*; দে'জ পাবলিশিং; কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; পঞ্চম সংস্করণ: আষাঢ় ১৪২০; পৃ.-১৬৫।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; *ভারতপথিক রামমোহন রায়*; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ; কলকাতা; পুনরমুদ্রণ-বৈশাখ-১৪১৫; পৃ.-১৮।

১৪. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত; *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*; দ্বিতীয় খণ্ড; বীক্ষণ গ্রন্থন ভবন; কলিকাতা-৩২; প্রথম প্রকাশ-১৯৬৩; পৃ.-১০৮।

১৫. গৌতম নিয়োগী; *রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ*; কলিকাতা ৬ ; ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮; পৃ.-৫-৬।

১৬. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী; অলকানন্দ পাবলিশার্স; ৩৫/৩ বেনিয়াটোলা লেন; অলকানন্দ সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১২; পৃ.-২৪।

১৭. ঐ; পৃ.-২৬।

১৮. উদ্ধৃত; ঐ; পৃ.-৩৫।

১৯. ঐ; পৃ.-৩০।

২০. ঐ; পৃ.-৩৮।

২১. ঐ; পৃ.- ৩৮।

২২. ঐ; পৃ.-৭৫।

২৩. উদ্ধৃত; লক্ষ্মীনারায়ণ রায়; *ব্রাহ্মধর্মের পরম্পরা ও ইতিবৃত্ত*; দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড; ৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা; ২০০৪; পৃ.-১০।

২৪. উদ্ধৃত; শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী; *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*; পুনশ্চ; ৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন; কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ– জানুয়ারি ২০১৩ ; পৃ.-১১২।

২৫. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; প্রাগুক্ত; পৃ.-৩৩।

২৬. উদ্ধৃত; শ্রী প্রমথনাথ বিশী; *চিত্র-চরিত্র;* বোধি (তক্ষশীলার প্রকাশনা বিভাগ); ৪১ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা- ১০০০; বাংলাদেশ মুদ্রণ গ্রন্থমেলা-২০১৩ খ্রী; পৃ.-৮৫-৮৬।

২৭. রাজনারায়ণ বসু; *আত্মচরিত*; অলকানন্দ পাবলিশার্স; পৃ.-৪১।

২৮. উদ্ধৃত; শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল; *রাজনারায়ণ বসু;* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ; ২৪৩/১, অপার সারকুলার রোড; কলিকাতা; প্রথম সংস্করণ- পৌষ ১৩৫২; পৃ.-৪৬।

২৯. তপোব্রত ব্রাহ্মচারী; *ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও নববিধান*; *দশদিশি;* প্রথমভাগ; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; ২১১ বিধান সরণী; কলকাতা-৭০০০০৬; অক্টোবর ২০১৩-মার্চ২০১৪; পৃ.-১১৮।

৩০. বারিদবরণ ঘোষ, প্রাগুক্ত; পৃ.-৩০।

৩১. ঝরা বসু; *কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন ব্রহ্মসমাজ*; দ্বিতীয় মুদ্রণ; ১ লা বৈশাখ,১৪২০; পৃ.-২১।

৩২. শ্রীবারিদবরণ ঘোষ; *সাহিত্য সাধক শিবনাথ শাস্ত্রী*; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; কলিকাতা-৬; পরিশিষ্ট-‘ক’; পৃ.-৩০৩।

৩৩. উদ্ধৃত; ঐ; পৃ.-৩০৩।

৩৪. শ্রীবিপিন পাল; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৫৯।

৩৫. শিবনাথ শাস্ত্রী; *আত্মচরিত;* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; ২১১ বিধান সরণী; কলিকাতা- ৭০০ ০০৬; পুনর্মুদ্রণ-২০০০; পৃ.-১১২।

৩৬. ঐ; পৃ.-১১৫।

৩৭. শ্রীবিপিন পাল; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৭৮-১৭৯।

৩৮. শ্রী বারিদবরণ ঘোষ; সাহিত্য সাধক শিবনাথ শাস্ত্রী; প্রাগুক্ত, পৃ.-৩০৮।

৩৯. ঐ; পৃ.-৩১০।

৪০. শিবনাথ শাস্ত্রী; প্রাগুক্ত; পৃ. ১৯২

৪১. শ্রীবঙ্কবিহারী কর; *পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত*; মৌমিতা প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিকেশন্স; বাংলাদেশে পুনর্মুদ্রণ; আগস্ট ২০১৪; পৃ.-১৩।

৪২. ঐ; পৃ.-১২।

৪৩. উদ্ধৃত; মুনতাসীর মামুন; *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন*; *দশদিশি;* প্রথমভাগ; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৫২।

৪৪. ঐ ; পৃ.-১৫২।

৪৫. শ্রীবঙ্কবিহারী কর; প্রাগুক্ত ; পৃ.-১৪।

৪৬. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*; দ্বিতীয় খণ্ড; বীক্ষণ গ্রন্থন ভবন; কলিকাতা-৩২; প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৬৩; পৃ.– ৫০৫।

৪৭. শ্রীবঙ্কবিহারী কর; প্রাগুক্ত; পৃ.- ১৬।

৪৮. উদ্ধৃত; মুনতাসীর মামুন ; প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫৩।

৪৯. উদ্ধৃত; ঐ; পৃ.-১৫৩-১৫৪।

৫০. উদ্ধৃত; শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী; *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*; প্রথম সংস্করণ-জানুয়ারি ২০১৩; পৃ.-১৯৪।

৫১. শ্রীবঙ্কবিহারী কর; প্রাগুক্ত; পৃ.-২৭।

৫২. ঐ; পৃ.-৩০।

৫৩. বারিদবরণ ঘোষ; *ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস;* প্রাগুক্ত; পৃ.-১১৪।

৫৪. শ্রীবঙ্কবিহারী কর; প্রাগুক্ত; পৃ.- ৪৩।

৫৫. উদ্ধৃত; মুনতাসীর মামুন; দশদিশি; প্রাগুক্ত; পৃ.–১৫৫- ১৫৬।

৫৬. ঐ; প্রাগুক্ত ; ১৫৬

৫৭. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্মজীবন;* কলিকাতা-১৩১৩ সাল ২২ পৌষ; পৃ.-১০৬।

৫৮. শ্রী শ্রীনাথ চন্দ; *ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর;* ময়মনসিংহ ব্রাহ্মপল্লী; ১০ শ্রাবণ ১৩২০; পৃ.-২৪।

৫৯. ঐ; পৃ.-২৪।

৬০. ঐ; পৃ.- ৩২।

৬১. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্মজীবন;* কলিকাতা– ১৩১৩ সাল, ২২ পৌষ; পৃ.-২৮।

৬২. শ্রীকেদারনাথ মজুমদার; *ময়মনসিংহ ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ*; আনন্দধারা, ঢাকা-১১০০; দ্বিতীয় প্রকাশ- নভেম্বর ২০১১; পৃ.- ৯২।

৬৩. মুনতাসীর মামুন ; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৫৭।

৬৪. শ্রী শ্রীনাথ চন্দ; প্রাগুক্ত; পৃ.-৪৮।

৬৫. মুনতাসীর মামুন; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৫৮।

৬৬. শ্রী শ্রীনাথ চন্দ; প্রাগুক্ত ; পৃ.-২০৭।

৬৭. বারিদবরণ ঘোষ; প্রাগুক্ত; পৃ.-১১৮।

৬৮. উদ্ধৃত; মুনতাসীর মামুন; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৫৮।

৬৯. বারিদবরণ ঘোষ; প্রাগুক্ত; পৃ.-১১৮-১১৯।

৭০. ঝরাবসু; প্রাগুক্ত; পৃ.-১০০।

৭১. ঐ; পৃ.-৯৯-১০০।

৭২. বারিদবরণ ঘোষ; প্রাগুক্ত; পৃ.-১১৯-১২০।

৭৩. ঐ; পৃ.-১২০।

৭৪. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্মজীবন;* প্রাগুক্ত; পৃ.-২২।

৭৫. ঐ; পৃ.-২২।

৭৬. ঐ; পৃ.-২৫।

৭৭. শ্রীনাথ চন্দ; প্রাগুক্ত; পৃ.-২৫।

৭৮. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.-২৭।

৭৯. ঐ; পৃ.-৬৬।

চতুর্থ অধ্যায় : গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন ও রচনাবলীর পরিচয়

ক) সাহিত্যিক জীবন ও রচনাবলীর বিষয়বস্তু

গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম সাধনার এক প্রবাদ পুরুষ। ধর্মবোধে সমর্পিত হয়েই তিনি কাটিয়েছেন তাঁর সমস্ত জীবন। এটি শৈশব থেকেই তাঁর চেতনার গভীর স্তরে ছিল অস্তিমান। ধর্মকে তিনি এতটাই বিশ্বস্ততার সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিলেন যে এর বাইরে মনোজগতের স্বাভাবিক বিকাশে তাঁর চিন্তা-চেতনা আবর্তিত হয়নি। সময়ের বিবর্তনে তাঁর ধর্ম বিশ্বাসে পরিবর্তন এসেছে বটে; কিন্তু ঘুরেফিরে ধর্মই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন। প্রথম জীবনে পারিবারিক ধর্মবিশ্বাস তাঁর চেতনায় যে বীজ রোপণ করেছিল, পরবর্তী সময়ে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) অনুপ্রেরণাই মহীরূহে পরিণত হয়েছিল। তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েই ধর্মসাধনায় এবং ধর্মপ্রচারে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় আদিষ্ট হয়েই তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ রচনায়। তবে সাহিত্যের স্বভাবজাত প্রেরণাবোধও তাঁর অন্তর্লোকে ছিল। ছাত্র বয়সে আরবি, ফারসি চর্চার সময় তিনি 'হিতোপাখ্যান মালা' (প্রথম ভাগ) অনুবাদ করেছেন, সংস্কৃত পাঠশালায় অধ্যয়নকালে তিনি সংস্কৃতে কাব্যচর্চা করেছেন, হার্ডিঞ্জ স্কুলে নর্মাল শ্রেণিতে পড়াকালে বাংলা কবিতা রচনা করেন। সে সময় তিনি 'চিত্তরঞ্জিকা' নামক মাসিক পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে 'বনিতা বিনোদ' নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এসব তিনি রচনা করেছিলেন সাহিত্য প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে। তখনও তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেননি। তবে ধর্মজীবনে অনুপ্রবেশের পর তাঁর রচিত প্রায় সব রচনাই ছিল ধর্মভিত্তিক। তাঁর প্রথম জীবনের দু/চারটি গ্রন্থ বাদ দিলে অন্য সব রচনাই ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনে রচিত। ধর্ম প্রচারকেই তিনি তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান বলে মনে করতেন। কেশবচন্দ্র ছিলেন তাঁর পরম ধর্মগুরু আর তাঁর আদেশ ছিল গিরিশচন্দ্রের কাছে বেদবাক্য। তাঁর আদেশকে শিরোধার্য করেই তিনি গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন। ব্রাহ্ম পরবর্তী জীবনে বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনায় তিনি আর উৎসাহ দেখাননি। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল না এমন নয়, কিন্তু ধর্ম প্রচারের মহান কর্মযজ্ঞে আত্মভাবনায় তন্ময় হওয়ার অবকাশ না পাওয়াতে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবে সাহিত্যের অনন্ত প্রবহমান স্রোতস্বিনী আর উৎসারিত হয়নি তাঁর সাহিত্য ভাবনায়। অনুবাদ কর্মেই তিনি অধিকতর আগ্রহী হয়ে পড়েন। আত্মজীবনীমূলক রচনা ছাড়া তাঁর প্রায় সব রচনাই অনুবাদমূলক। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম বিষয়ক অনুবাদমূলক গ্রন্থ তিনি প্রচারব্রত গ্রহণের পরে রচনা করেছিলেন। সব মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা সত্তরটি।[১] শুধু ইসলাম ধর্ম বিষয়ক রচনাই প্রায় চল্লিশটি। এই গ্রন্থগুলো তিনি আরবি ও ফারসি থেকে অনুবাদ করেন। সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করার দিকেই তাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি। ধর্মীয় মর্মবাণীকে সাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ করার জন্য তিনি রচনাশৈলীর নান্দনিকতার চেয়ে প্রকাশভঙ্গির সহজবোধ্যতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। অনুবাদকর্মে তিনি বিদ্যাসাগরের মতোই অনন্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আক্ষরিক বা হুবহু অনুবাদ না করে তিনি মূল বিষয়কে যথাসম্ভব অনুসরণ করে অনুবাদকে যথার্থতা দান করেন। প্রয়োজনে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করেন। তাঁর

কোরআন অনুবাদ অনন্যতার গুণে বাংলার মুসলমানদের হৃদয়ে পেয়েছে স্থায়ী আসন। কোরআন অনুবাদে তাঁর গবেষণালব্ধ চিন্তাশক্তি সত্যিই অভূতপূর্ব।

ধর্ম আচ্ছন্নতার ফাঁকে ফাঁকে কখনো কখনো গিরিশচন্দ্রের মনের কোণে স্বাভাবিক কবিত্ববোধও জেগে উঠত। ছেলেবেলায় কবিত্ববোধের তীব্র আকর্ষণে তিনি 'সখী সংবাদ' গানের দলের সংশ্রবে এসেছিলেন। এ দলের একজন পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। সমস্ত রাত জেগে মহোৎসাহে গান শ্রবণ করতেন এবং গানের খাতা দেখে তাঁদের গান বলে দিতেন।[২] কিশোর গিরিশের গানের প্রতি এহেন অনুরাগ আমাদেরকে তাঁর সংস্কৃতিমনা মানসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি অন্তরাত্মার গভীর টান না থাকলে একজন কিশোর বয়সের বালকের পক্ষে সমস্ত রাত জাগার কষ্টসহিষ্ণু মনোভাব আয়ত্ত করা সহজ ছিল না। গিরিশচন্দ্র ফারসি শিখেছিলেন শানখলা পল্লীর মুন্সি বাঁকা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কাছে। তিনি ছিলেন একজন পারস্য ভাষাবিজ্ঞ। তাঁর কাছে 'তওয়ারিখ জাহাঁগির,' 'মাদনোজ্জওয়াহের', 'মহব্বতনামা', 'বহরদানেশ', 'সেকন্দারনামা', 'রোক্কাতে ইয়ার মোহাম্মদ' ইত্যাদি পারস্য গদ্য-পদ্য পাঠ করেছেন। এসব গ্রন্থ তিনি 'পুস্তকের মর্ম উপদেশ নিরপেক্ষ' হয়ে পড়তেন। 'মাদনোজ্জওয়াহের', 'মহব্বতনামা', 'বহরদানেশাদি', প্রভৃতি অশ্লীল কাব্য পড়ে তাঁর মন বিকৃত ও কলুষিত হয়ে পড়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল তৎকালীন ক্লেদাক্ত সমাজের অনৈতিক জীবন ব্যবস্থা আর কৃষ্ণচন্দ্রের মদ্যপানের নীতি বিবর্জিত উপদেশ। এ সামগ্রিক পরিস্থিতি যুবক গিরিশচন্দ্রের মানসিকতার ওপর সাময়িক প্রভাব ফেলেছিল বটে; কিন্তু তিনি তা অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন। এরপর তিনি সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত বৈদ্যপাড়া পল্লীতে একজন মুসলমান মুন্সির নিকট 'গোলস্তান' অধ্যয়ন করেন। এসব কাব্য পড়ে অনুবাদ কর্মের প্রতি তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য তখনো সাহিত্য অনুবাদ শুরু করেননি। এরপর তিনি যখন সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্র ছিলেন, তখন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সাথে তাঁর নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যাসাগর প্রণীত 'উপক্রমণিকা ব্যাকরণ ও ঋজুপাঠ' প্রথম ভাগ পড়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে সংস্কৃত 'কুমার সম্ভবম্', 'রঘুবংশম্', বাল্মীকির 'রামায়ণম্', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' ইত্যাদি পুস্তক চর্চা করেন। এসব গ্রন্থ পড়ে সংস্কৃত কাব্যচর্চায় উৎসাহিত হয়ে উঠেন এবং সংস্কৃতে কবিতা রচনা শুরুও করেন। কাব্যচর্চার পেছনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তাঁর ছোটদাদা হরচন্দ্র রায়। ছোটদাদার অনুপ্রেরণাতেই তিনি সংস্কৃত স্কুলে অগ্রগণ্য হতে পেরেছিলেন। প্রতিদিন তর্করত্ন মহাশয় বা তাঁর ছোটদাদা পণ্ডিত হরচন্দ্র রায় এক একটি সমস্যা পূরণ করে দিতেন, তিনি তাঁদের কাছ থেকে শ্লোকের অন্ত্যচরণ পেয়ে সে ভাব অবলম্বনে পূর্ববর্তী তিন চরণ পূরণ করে দিতেন। তাঁর এই অসামান্য কবিত্ববোধে তাঁরা আশ্চর্য হতেন। 'উপক্রমণিকা ঋজুপাঠ' পড়ে তখন এরকম সমস্যা পূরণ সত্যিই বিস্ময়কর ছিল। সেসময় তাঁর সাথে তদানীন্তন থাকবস্তের ডেপুটি কালেক্টার প্রাণকৃষ্ণ সেনের বড় ছেলেও সংস্কৃতে সমস্যা পূরণ করতেন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় গিরিশচন্দ্রের রচনাকেই অধিকতর পছন্দ করতেন। তিনি ষড়ঋতুর বর্ণনা দিয়ে সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত কবিতার প্রতি তখন তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ জন্মেছিল।[৩] এ উৎসাহ আরও পরিণত হয় হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয়ে অধ্যয়নের

সময়। তখন তিনি বাংলা কবিতা চর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন এবং অল্পদিনেই বাংলা কাব্যচর্চায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি বলেন,

> "এই সময়ে বাঙ্গালা কবিতা রচনায় আমার অতিশয় উৎসাহ ও অনুরাগ জন্মে; আমি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পদ্য রচনা করিয়া ঢাকা নগর হইতে প্রকাশিত চিত্তরঞ্জিকা নামক সাময়িক পত্রিকায় লিখিয়া পাঠাইয়াছি, আমি 'বনিতাবিনোদ' নামক একখানা পদ্য পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, উক্ত পুস্তক কোন বিদ্যালয়ে পাঠ্যও হইয়াছিল। এই পুস্তকে স্বামী-স্ত্রীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছিল।"[৪]

'বনিতা বিনোদ'ই তাঁর কাব্যচর্চার শেষ পর্যায়। এরপর তিনি আর কাব্যচর্চা করেননি। কাব্যলক্ষ্মী তাঁর কাছ থেকে এক প্রকার বিদায় নিয়েছিল। জীবনের জটিলতর পরিস্থিতি তাঁর কাব্য প্রেরণার বাঁক ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাঁর আবেগ অনুভূতির শুদ্ধতম লালিত্য জীবনের জটিলতর পর্যায়ে এসে রূপ নিয়েছিল গদ্যে। কর্মজীবনে প্রবেশ, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, ধর্ম প্রচারে একাগ্রতা সব মিলিয়ে আর কাব্যচর্চা সম্ভব হয়ে উঠেনি তাঁর। কাব্যচর্চার গভীরতর সৌন্দর্য তন্ময়তায় তিনি আর বিভোর হতে পারেননি। যে কাব্যচর্চা ছিল সহজ সরল আবেগময়তার প্রকাশ, সে কাব্যচর্চাই তাঁর কাছে একসময় দুরূহ কর্ম বলে মনে হতো। 'মহিলা' পত্রিকা সম্পাদনা করার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর কাব্য দীনতাকে অকপটে স্বীকার করেছিলেন। তখন একজন মহিলার সামান্য পদ্য রচনা সংশোধন করতে গিয়ে তাঁকে গলদঘর্ম হতে হতো। দুই চরণ যোগ করে একটি কবিতা সংশোধন করাও তখন তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল।[৫]

ময়মনসিংহের ছাত্রসভায় রচনা পাঠের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্রের গদ্য রচনার যাত্রা শুরু। কালিকাদাস বাবুর উদ্যোগে জিলা স্কুলের একটি কক্ষে রিডিং ক্লাব স্থাপিত হয়েছিল। সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে এর সভা বসত। এ সভার এক একজন সভ্য বাংলায় বা ইংরেজিতে এক একটি প্রবন্ধ রচনা করতেন এবং তা সভায় পাঠ করতেন।[৬] অন্যরা তা আলোচনা বা সমালোচনা করতেন। প্রাবন্ধিকের চিন্তা-চেতনার বিকাশ ও গদ্যশৈলীর গঠন বিন্যাস নির্মাণ করাই ছিল এ সভার মূল উদ্দেশ্য। রিডিং ক্লাবে প্রবন্ধ পাঠের প্রেরণা থেকেই গিরিশচন্দ্রের গদ্য লেখার হাতে খড়ি। এ সময়ে তিনি গদ্যের অনুশীলন করেন এবং গদ্য লেখায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পরবর্তী কালে ময়মনসিংহে শিক্ষা প্রসারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যে সমস্ত রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো তিনি সে সব রচনা প্রতিযোগিতার পরীক্ষকও ছিলেন। এরপর তিনি 'ঢাকা প্রকাশ' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা শুরু করেন এবং নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। নর্মাল শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার কিছুকাল পরে তিনি হার্ডিঞ্জ স্কুলের নিম্ন শ্রেণির শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষকতাকালে পারস্য 'গোলস্তান' পুস্তক অনুবাদ করে 'হিতোপাখ্যানমালা' প্রথম ভাগ নামে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি প্রথমে আসাম প্রদেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্য শ্রেণিভুক্ত করা হয়। পরে বাংলার অনেক জেলার স্কুলে তা পাঠ্যবই রূপে নির্ধারিত করা হয়। বইটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং ১৩১৩ বঙ্গাব্দ নাগাদ বইটির তেরটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল।[৭]

সময়ের প্রবহমানতায় মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাতেও ছেদ পড়ে। ঘটে কিছু নিদারুণ বিয়োগান্তক ঘটনা। প্রিয় মানুষকে হারানোর বেদনায় আমরা আত্মসম্বিৎ হারিয়ে ফেলি। গিরিশচন্দ্রের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। প্রিয় স্মৃতিগুলো আঁকড়ে ধরে তিনি নিথর হয়ে গিয়েছিলেন। সময় বয়ে চলে, এক সময় কালের বিবর্তনে মানুষ সব কিছু সয়ে যায়। ফিকে হয়ে আসে নিষ্ঠুরতম বেদনাও। শুধু কিছু কিছু স্মৃতি তাঁর মনকে কখনো কখনো বড় বেশি আন্দোলিত করে তুলত। আর সেই স্মৃতিগুলোকে একটি একটি করে কুড়িয়ে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁদের জীবন চরিত। স্ত্রী বিয়োগে লিখেছিলেন 'ব্রহ্মময়ী চরিত', মাকে হারিয়ে রচনা করেছিলেন 'মাতৃবিয়োগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস', বড় দিদির মৃত্যুকে স্মরণ করে লিখেছিলেন 'দিদি বরদেশ্বরী দেবীর জীবনচরিত'। এ সবই জীবনীমূলক রচনা। 'সতীচরিত' নামে তিনি রাণী শরৎসুন্দরী দেবীরও একটি জীবনী রচনা করেছিলেন। সবশেষে তাঁর 'আত্ম-জীবন' (১৩১৩ সাল ২২ পৌষ) গ্রন্থটি জীবনীসাহিত্যের একটি অনবদ্য দলিল। জীবনীমূলক রচনাগুলো তাঁর মৌলিক রচনা। সহজ সরল ভাষায় জীবনাচরণ বর্ণনা করাই ছিল এসব রচনার প্রতিপাদ্য বিষয়। জীবনীসাহিত্য বাদে গদ্য সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের সবচেয়ে বড় অবদান ইসলাম সম্বন্ধীয় অনুবাদ রচনা। কোরআন শরীফ অনুবাদ ও ইসলাম ধর্মের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের জীবনচরিত রচনায় তিনি একদিকে যেমন উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি অনবদ্য রচনাশৈলীর দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। কোরআন শরীফের সম্পূর্ণ অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়েই বাংলার ধর্ম ও সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর খ্যাতি, পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা। ১৮৮১ সালে গিরিশচন্দ্র কোরআন অনুবাদ শুরু করেছিলেন এবং দুই বছরে কোরআন অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলেছেন-

> "১৮৮১ সালের শেষ ভাগে আমি ময়মনসিংহে যাইয়া স্থিতি করি, সেখানে কোরআন শরীফ কিয়দ্দূর অনুবাদ করিয়া প্রতিমাসে খণ্ডশঃ প্রকাশ করিবার জন্য সমুদ্যত হই। শেরপুরস্থ চারুযন্ত্রে প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়, পরে কলিকাতায় আসিয়া খণ্ডশঃ আকারে প্রতিমাসে বিধান যন্ত্রে মুদ্রিত করা যায়। প্রায় দুই বৎসরে কোরআন সম্পূর্ণ অনুবাদিত ও মুদ্রিত হয়। পরিশেষে সমুদায় একখণ্ডে বাঁধিয়া লওয়া যায়। প্রথম বারে সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা নিঃশেষ হইলে পরে ১২৯৮ সালে কলিকাতা দেবযন্ত্রে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় বারের সহস্র পুস্তকও নিঃশেষিত প্রায়। এক্ষণ সংশোধিত আকারে তাহার তৃতীয় সংস্করণের উদ্যোগ হইতেছে।" (আত্ম-জীবন; পৃষ্ঠা-৯১-৯২)

কোরআন শরীফের অনুবাদ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র জানিয়েছেন ;

> "আমি আরব্য ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্তি হইলে অনেক বন্ধু বঙ্গভাষায় মূল কোরআন অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে আমাকে অনুরোধ করেন, এ বিষয়ে আমি কোন কোন মোসলমান বন্ধু কর্তৃকও বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হই। কোরআন অধ্যয়ন ও তাহা অনুবাদ করাই আরব্য ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বন্ধুদিগের আগ্রহে ও স্বীয় কর্ত্তব্যানুরোধে ঈশ্বর কৃপায় আমি এক্ষণ কোরআন বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকটন করিয়াছি। (ভূমিকা: কোরআন শরীফ)

কোরআন শরীফের যথাযথ অনুবাদের বিষয়ে অনুবাদক বিশেষ সচেতন ছিলেন। বলেছেন,

> "যাহাতে কোরআনের মূল 'আয়াত' প্রবচন সকলের অবিকল অনুবাদ হয়, তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন করা হইয়াছে। তদনুরোধে বঙ্গভাষার লালিত্য রক্ষার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারা যায় নাই।"[৮]

গিরিশচন্দ্র কৃত কোরআন শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদ যথেষ্ট সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়। মুসলমান সমাজে এই প্রয়াস অভিনন্দিত হয়। কোরআন অনুবাদের জন্য তিনি প্রচুর ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করেছিলেন। যদিও ব্রাহ্মধর্মের প্রয়োজনেই তাঁর এ অক্লান্ত পরিশ্রম, তবুও এর সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। নববিধান সমাজের আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে তিনি ইসলাম চর্চা ও অনুবাদ কর্মে সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্বধর্মের প্রতি দৃঢ়তা, আচার্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ও গভীর শ্রদ্ধা তাঁকে এ কষ্ট সাধনে অনুপ্রাণিত করেছিল। নববিধান ঘোষণার পর বিধানাচার্য কেশবচন্দ্র একদিন শ্রী দরবারে বসে এক একজন প্রচারককে এক একটি বিশেষ কার্যের এবং ভাবের দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ওপর অর্পিত হয়েছিল মোহাম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের সারবস্তু গ্রহণ ও তা অনুবাদপূর্বক প্রচার করা। তিনি ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কাজে নিয়মিত হবার জন্য শ্রীদরবার ও মণ্ডলী দ্বারা বার বার অনুরুদ্ধ হয়েছেন।[৯] কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবনত বিনম্র বিনয়ে এ গুরুভার তিনি শিরোধার্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রও উৎসাহ উদ্দীপনায় তাঁর মনোবলকে দৃঢ় করে তুলেছিলেন। আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে তিনি আপাত অসম্ভব কার্যকে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। এ দুঃসাধ্য সাধনে কেশবচন্দ্রের অকুণ্ঠ সমর্থনকে গিরিশচন্দ্র নির্ভীক চিত্তে স্বীকার করেছেন 'মহাপুরুষ মুহাম্মদ' এবং 'তৎপ্রবর্ত্তিত ইসলাম ধর্ম্ম' গ্রন্থের ভূমিকায়–

> "যে ভাববহনযোগ্য সবল অশ্বপৃষ্ঠ, ঈশ্বর সেই ভার দুর্ব্বল গর্দ্দভপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন; এ বিষয়ে তাঁহার যে কি লীলা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি অবিদ্বান্ ও নানা প্রকারে অযোগ্য। তাঁহার বিশ্বাসী ভক্ত বিধানাচার্য্যের শুভ দৃষ্টি এই অক্ষম অযোগ্য ব্যক্তির উপর পড়ে। এসলাম ধর্ম্মের শিক্ষাপ্রদ নিগূঢ় তত্ত্ব সকল যাহা সাধারণের জ্ঞানের অগম্য হইয়া আছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিব, পূর্ব্বে আমি মনেও করিতে পারি নাই। প্রথমে আমি আরব্য ভাষার চর্চ্চা কিছুই করি নাই, সামান্যরূপে পারস্য ভাষার আলোচনা করিয়াছিলাম ; ভাষাজ্ঞান যাহাকে বলে তাহা আমার কিছুই জন্মে নাই। পরে মনের আবেগে পরিণত বয়সে লক্ষ্ণৌ নগরে যাইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ আরব্য ভাষার চর্চ্চা করা গিয়াছিল। এমন অবস্থায় বিধানাচার্য্য ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদী হইতে আমি মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাতে আমি বিস্মিত হই; বোধ হয় আমার ন্যায় অপর সকলেও বিস্মিত হইয়াছিলেন। কমল সরোবরে জলসংস্কারের দিন ব্রহ্মানন্দ স্বহস্তে আমার মস্তকে তৈলার্পণ করিয়া বলিলেন, "আমি মহাপুরুষ মোহম্মদের অঙ্গে তৈল ম্রক্ষণ করিতেছি" যখন তাঁহার বিশেষ প্রেমোন্মত্ততার ভাব, তখন তিনি আমার নিকটে প্রেমোন্মত্ত খাজা হাফেজের গজল পড়িতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি কিছুদিন তাঁহাকে দেওয়ান হাফেজ পড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাঁহারই আগ্রহ ও

অনুরোধে হাফেজের গজল কিয়দংশ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা গিয়াছিল। সেই অনুবাদ দর্শনে তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল। কোরাণের বঙ্গানুবাদ খণ্ডশঃ আকারে প্রথমে দুই তিন খণ্ড প্রকাশিত হইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। কেহ অনুবাদের ভাষার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।"[১০]

কেশবচন্দ্রের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় গিরিশচন্দ্র একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষা আয়ত্ত করে সে ভাষার গ্রন্থাবলী অনুবাদ করার কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর কাছে কেশবচন্দ্রের বাণী ছিল ঐশী বাণীর মতো। সে বাণীতে তিনি এত বেশি আত্মবিশ্বাস পেতেন যে তিনি অসাধ্যকে সাধন করতে কষ্ট বা ক্লেশ বোধ করেননি। গিরিশচন্দ্রের যেমন কেশবচন্দ্রের প্রতি ছিল অন্ধ অনুরাগ তেমনি কেশবচন্দ্রেরও ছিল তাঁর প্রতি অসীম স্নেহ ভালোবাসা। গিরিশচন্দ্রের সকল রচনাতে তিনি আনন্দিত হতেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। এ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলেন, "জাহাজে অবস্থিতিকালে কবিবর শেখসাদী প্রণীত প্রসিদ্ধ বুস্তাননামক নীতিপূর্ণ পারস্য পদ্যগ্রন্থ বঙ্গভাষায় গদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলাম, পরে তাহা হিতোপাখ্যানমালা দ্বিতীয় ভাগ নামে প্রকাশ করা গিয়াছিল। আমি আচার্য্য দেবকে বুস্তানের প্রেমমত্ততা পরিচ্ছেদের কিয়দংশের অনুবাদ প্রচারক্ষেত্র হইতে উপহার দিয়াছিলাম। তিনি তাহা পাইয়া আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, "এই অমূল্য উপহার পাইয়া আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আমাকে এইরূপ উপহারই দিবে।""[১১]

কেশবচন্দ্রের আন্তরিকতামুগ্ধ গিরিশচন্দ্র নিজের ভক্তিপ্রেমকে গুরুর পদতলে উৎসর্গ করেছিলেন নির্দ্বিধায়। কেশবচন্দ্রকে তিনি ঈশ্বর আশীর্বাদপুষ্ট মনে করতেন। তাঁর অনুপ্রেরণা গিরিশচন্দ্রের কাছে ছিল ঈশ্বরেরই আশীর্বাদ। সুতরাং কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে অনুবাদ কর্মে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনিই হলেন মুসলিম বাঙালির ইতিহাসে কোরআন শরীফের প্রথম সফল বঙ্গানুবাদকারী। এর পাশাপাশি তিনি বিখ্যাত আরবি হাদিস গ্রন্থ 'মেশকাতুল মসাবিহ'-এরও বঙ্গানুবাদ করেন। অনেকগুলো খণ্ডে পূর্ববিভাগ ও উত্তর বিভাগ হিসেবে তাঁর এই অনুবাদ ১৮৯২ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এর শেষ খণ্ড (উত্তর বিভাগ, ৪র্থ খণ্ড) প্রকাশিত হয় ১৮৩০ শকাব্দে (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮)। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন মন্তব্য করেছেন : "তিনি সর্বপ্রথম মেশকাতের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ রচনা ও প্রকাশ করেন।" ("বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা" অখণ্ড ৩য় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮১; ৩য় খণ্ড; পৃষ্ঠা– ১/০)।

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের সূত্রে এই অনুবাদ গ্রন্থ সম্পর্কে জানা যায় : "ইহার অনুবাদেও আলেমগণ সুখ্যাতি করিতেছেন। বগুড়ায় নবাব সৈয়দ আব্দছোবহান চৌধুরী সাহেব ৫ম খণ্ডের জন্য ১০০ (একশত) টাকা অনুবাদককে সাহায্য দিয়াছেন। ৬ষ্ঠ খণ্ডের জন্যও দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।"(ইসলাম প্রচারক: নভেম্বর–ডিসেম্বর, ১৯০১; পৃষ্ঠা–১৮৮)।

ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম বিষয়েও তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। 'শ্রীমদ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী', 'কোচবিহার বিবাহের বৃত্তান্ত', 'ব্রর্ম্মাদেশ ও ব্রর্ম্মাদেশে বৌদ্ধধর্ম', 'পাঞ্জাবে ধর্ম প্রভাব', 'তত্ত্ব সন্দর্ভমালা', প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। বাংলা ছাড়া উর্দুতেও তিনি বেশ

কয়েকটি বই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কোনো কোনো উর্দু পুস্তক ও বক্তৃতা লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সদস্য রলারাম ভিমবাট প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর উর্দু রচনা ও মুদ্রণ সম্পর্কে তিনি বলেন,

> "“ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান” ও “ধর্ম্মশিক্ষা” এবং “সামাজিক উপাসনাপ্রণালী ও প্রার্থনামালা” অপিচ “কতকগুলি ধর্ম্মকথা” ও “ব্রহ্মোপদেশ” নামক পুস্তক উর্দ্দুভাষায় অনুবাদ করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা গিয়াছে। সামাজিক উপাসনা প্রণালী ও প্রার্থনামালা এবং কতকগুলি ধর্ম্মকথা ও ধর্ম্মোপদেশ এই তিনখানা ক্ষুদ্র পুস্তক, ইহা আচার্য্য কর্তৃক প্রণীত। আমি লক্ষ্ণৌ নগরে পাঠ্যাবস্থায় এই পুস্তিকাত্রয় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলাম। প্রথমোক্ত পুস্তকদ্বয় অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মশিক্ষা ঊর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়া “ব্রাহ্মধর্ম্মকা দস্তরোল্ আমল” এবং “তালিমুল ইমান” নামে প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহা এবং তিনটি ঊর্দ্দু বক্তৃতা “মজহবে হাক্কানী”, “ইমাম ক্যা চীজ হ্যায়,” ও “নয়ী সরিয়ত ক্যা হ্যায়” লাহোর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভ্য লালা রলারাম ভিমবাট আমা হইতে manuscript পাইয়া লাহোরে মুদ্রিত করিয়াছেন। প্রথমোক্ত বক্তৃতার সমস্ত মুদ্রাঙ্কনব্যয় বন্ধুবর স্বর্গগত ডাক্তার দুর্গাদাস রায় ও পার্ব্বতীচরণ রায় অযাচিতভাবে প্রদান করিয়াছিলেন। অপর পুস্তক ও বক্তৃতা সকলের মুদ্রাঙ্কনব্যয় নিজ ইচ্ছায় উক্ত লালাজী যোগাইয়াছেন। বাঁকিপুরে “আস্রারে এবাদত” (উপাসনাতত্ত্ব) বিষয়ে প্রথমে ঊর্দ্দু বক্তৃতা হয়। ১৮৯৯ সনে তাহা পাটনা নগরে মুদ্রিত হইয়াছে। গত বছর জুন মাসে “হকতালা গায়েব নঁহী বলকে হাজের হ্যায়” (ঈশ্বর অনুপস্থিত নহেন বরং উপস্থিত) এ বিষয়ে ঊর্দ্দু বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহা স্বর্গগত বিশ্বনাথ রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারভাণ্ডারের সাহায্যে সম্প্রতি লাহোরে মুদ্রিত হইয়াছে।"[১২]

গিরিশচন্দ্র তাঁর ধর্মজীবনে প্রচারার্থে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম থেকে যেসব গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তার সবই যে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন এমন নয়, তবে তিনি তাঁর মৌলিক রচনাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন (‘আত্ম-জীবন’ এর বর্ণনানুযায়ী)। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের যে তালিকা বা পরিচয় আবুল আহসান চৌধুরী রচিত ‘ভাই গিরিশচন্দ্র সেন’ গ্রন্থের ‘গ্রন্থ পরিচিতি’ অংশে, ড. সফিউদ্দিন আহমদ এর ‘কোরানের প্রথম অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন’ গ্রন্থের ‘সাহিত্য চর্চা ও গ্রন্থ পরিচয়’ অংশে এবং সুকুমার সেন এর ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাঁর মৃত্যুর মাত্র একশ বছর ব্যবধানে অনেক গ্রন্থই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। যোগ্য উত্তরসূরীর অভাব আর সুশীল সমাজের উদাসীনতার ফলে গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। তাঁর অগ্রন্থিত রচনার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রচুর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ‘মহিলা’, ‘বামাবোধিনী’, ‘পরিচারিকা’ পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ‘ধর্মতত্ত্ব’, ‘ঢাকা প্রকাশ’, ‘বঙ্গবন্ধু’ পত্রিকাতেও তিনি প্রচুর লেখালেখি করেছেন। সেগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর অপ্রকাশিত ও অসমাপ্ত রচনা যা ছিল তার চিহ্নটুকুও আমাদের হাতে এসে পৌছাঁয়নি। হয়তো সংরক্ষণের অভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে। গিরিশচন্দ্র ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর উত্তরসূরী কেউ ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়

বার বিয়ে করেননি। প্রচার ব্রতকে অবলম্বন করে আজীবন নিঃসঙ্গ কাটিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরের আরাধনায় আত্মসমর্পণ করে তাঁরই পরম ধ্যানে মগ্ন থেকেছেন। জগৎ সংসারের প্রতি কোনো মোহ তাঁর ছিল না। একান্ত নির্ভরতার ও পরম আশ্রয়ের আপন আবাস তাঁর ছিল না। বিপদে আপদে ভাগিনা ও ভাতিজাদের পাশে পেয়েছিলেন কতক সময়ের জন্য। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সংরক্ষিত মূল্যবান বই-পুস্তক এমনকি তাঁর রচনাদি ও পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণে কেউ এগিয়ে আসেনি। এটি যেমন একটি নির্মম বাস্তবতা তেমনি আরেকটি নির্মম সত্য হলো তাঁর রচনাবলী তাঁর সমকালে বা পরবর্তী সময়েও পাঠক সমাজ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেননি। পাঠক সমাজের এ দীনতা অবশ্য ধর্মীয় অন্তর্দ্বন্দ্বেরই ফল। গিরিশচন্দ্র ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্ম। নিজ ধর্মচর্চার বাইরে ইসলামশাস্ত্রীয় চর্চা হিন্দুরা সুনজরে দেখেননি। অপরদিকে, গিরিশচন্দ্রের নিরলস পরিশ্রমের অনবদ্য অনুবাদ কোরআন মুসলমানরা ঋদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করেছেন সত্য কিন্তু একজন হিন্দু সে অনুবাদ করেছেন বলে তাঁর স্বীকৃতি দিতে অনেক মুসলমানই দ্বিধান্বিত ছিলেন। যার ফলে তাঁর শ্রমলব্ধ অনন্য কর্মগুলোও সময়ের ব্যবধানে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। তাঁর জীবনীকার সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন,

> "দুঃখের বিষয় ভাই গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর তাঁহার কার্যের সূত্র ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজে, কিংবা মুসলমান সমাজে কেহই মুসলমান ধর্মের চর্চা এবং অন্যান্য ধর্মের সহিত তাহার সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেন নাই। ভাই বলদেব নারায়ণ ও অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত কিঞ্চিৎমাত্র চেষ্টা করিয়াছিলেন দেখা যায়। ভাই গিরিশচন্দ্র যে সকল অমূল্য, আরবি, ফার্সী ও উর্দু গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহ করিয়া যান তাহাও কেহ নাড়িয়া দেখেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে যখন স্তূপীকৃত ঐ সকল গ্রন্থ ও পুঁথি আমার হস্তে অর্পিত হয় তখন তাহা মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। আমি তাহা সঙ্গে সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিই। কিন্তু তখন তাহা হইতে কিছু উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই। ভাই গিরিশচন্দ্র 'হাফেজের' অনুবাদ করিয়াছিলেন; অযত্নে পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যায়। "হাদিস" গ্রন্থের যে অংশ তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া যান তাহা আজও কেহ সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন নাই।"[১৩]

স্বাভাবিক কারণেই গিরিশচন্দ্র আজ একটি বিস্মৃত নাম। তাঁর মহৎ কর্মপ্রচেষ্টা এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের মহৎ উদ্যোগ আজ অনেকটাই পাঠকের অজানা। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কীয় অনুবাদের মাধ্যমে ধর্ম উদারতার যে মহান দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। তাঁর অন্যান্য রচনা বাদ দিলেও শুধু কোরআন বঙ্গানুবাদের জন্যই বাঙালি মুসলিম সমাজে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

খ. রচনার নিদর্শন ও গ্রন্থ পরিচিতি

গিরিশচন্দ্র মূলত ধর্ম প্রচারক আর ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই অনুবাদক। অনুবাদ রচনায় তিনি যতটা মনোযোগী ছিলেন, বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চায় তিনি ততটাই উদাসীন ছিলেন। তাঁর মৌলিক রচনা বলতে যৎসামান্য যা পাওয়া যায় তার অধিকাংশই আত্মজীবনীমূলক রচনা। তার উপর এ জীবনীগুলো একান্তই আত্মস্মৃতির অনর্গল বর্ণনা মাত্র। সত্যনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর ঘটনাবলীর নিরাসক্ত বর্ণনা জীবনীগুলোকে ক্লান্তিকর করে তুলেছে। স্বাভাবিক কারণেই কেউ কেউ এর সাহিত্যিক মূল্য স্বীকার করতে চাননি। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট গবেষক আবুল আহসান চৌধুরীও গিরিশচন্দ্রের লেখার সৃষ্টিধর্মীতাকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, "গিরিশচন্দ্র সেন সৃষ্টিধর্মী লেখক ছিলেন না, আর বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। মূলত ধর্মীয় প্রয়োজনেই তাঁর সমগ্র রচনার জন্ম। তাঁর ধর্মজীবন, কর্ম-প্রয়াস ও রচনাবলীর সঙ্গে পারস্পরিক গভীর আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান।"[১৪] আমরা তাঁর মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত নই। গিরিশচন্দ্রের অনুবাদকর্ম ও ধর্মবোধ অবিচ্ছেদ্য– এ বিষয়ে আমাদের দ্বিমত নেই, কিন্তু তিনি 'সৃষ্টিশীল লেখক ছিলেন না' এখানে আমাদের একটু মতপার্থক্য আছে। গিরিশচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত এবং বাংলায় কাব্য রচনা করেছেন, স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে 'বনিতা বিনোদ' কাব্য রচনা করেছেন এবং তিনি বেশ কয়েকটি জীবনচরিত রচনা করেছেন– যা ছিল একান্তই মৌলিক রচনা। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রচুর প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন। শুধু তাই নয়, কোরআন শরীফ বাদে ইসলাম সম্পর্কীয় অন্যান্য অনুবাদে তিনি মূলকে অনুসরণ করেছেন মাত্র। ঘটনার বর্ণনায়- কখনো কখনো তিনি অনেকক্ষেত্রেই মহাজনদের বাহ্যিক অপ্রাকৃতিক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ এবং অবৈজ্ঞানিক প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের কুসংস্কার বর্জন করেছেন (তাপসমালার ভূমিকার বর্ণনানুযায়ী)। এছাড়া তাঁর রচনার সাহিত্যিক মূল্যও একেবারে কম নয়। তাঁর 'আত্ম-জীবন' এ রূপায়িত হয়েছে তৎকালীন আচরিত জীবন ব্যবস্থার একটি অখণ্ড সমাজচিত্র। জীবনের বিচিত্র ঘটনা বর্ণনায় তিনি যে পারিপর্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশের বর্ণনা করেছেন তার সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য। বলা যায়, তাঁর 'আত্ম-জীবন' উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক উত্থান-পতনের এক বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ। 'আত্ম-জীবন' এর ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র লিখেছেন,

> "নিজের জীবনের বৃত্তান্ত প্রত্যেকে নিজে যেরূপ জানেন, এবং যথাযথ বলিতে পারেন, অপর লোকে কখনও সেরূপ জানিতে পারেন না, সুতরাং ঠিক বলিতে ও লিখিতে পারেন না। তাহাতে সত্যের অপলাপ হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। একদা কোন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, "ঐহিক লীলা কখন সম্বরণ করিবেন কে জানে? এখনই আপনার জীবনচরিত আপনি নিজে লিখিয়া রাখুন, তাহা হইলে ঠিক লেখা হইবে।" তখন হইতে আমি উহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। ... আমি এই সত্তোর বৎসরের জীবনে সুখদুঃখ পাপপূর্ণ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশ্বাস অবিশ্বাস আলোক অন্ধকারাদি পরস্পর বিপরীত ও বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। ... আমি স্বীয় জীবনে প্রেমময় বিধাতার

জীবন্ত প্রেমের লীলা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি জগতে স্বয়ং তাহার সাক্ষ্য দান করার উদ্দেশ্যে এই 'আত্ম-জীবন' পুস্তক লিখিলাম। ইহা আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ লোকদিগের হস্তে সমর্পিত হইতে পারিবে, আমার জীবদ্দশায় সাধারণের নিকটে প্রচার এবং পত্রিকাদিতে সমালোচিত হওয়া প্রার্থনীয় নহে।"[১৫]

তাঁর আত্মকথনে সর্বদাই একটি আদর্শিক মনোভাব জাগ্রত ছিল। ধর্ম যাজকের জীবনে আদর্শ তন্ময়তা বাহুল্য কিছু নয়। তবে তাঁর জীবনাচরণ বর্ণনায় আদর্শিক মনোভাবকে কখনো কখনো ছাপিয়ে গেছে তৎকালীন পারিপার্শ্বিক জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র। গিরিশচন্দ্র তাঁর বসন্ত রোগাক্রান্ত স্ত্রীকে নিয়ে যখন ময়মনসিংহ থেকে ভাটপাড়ার উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে রওনা হন, তখন ঝড়ের কবলে পড়েন। তিনি ঝড়ের রাতের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে নদীমাতৃক আবহমান বাংলার বর্ষা কালের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

"পুনর্ব্বার ঘনতর জলদজালে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; বিদ্যুতের তীব্র আলোকের সঙ্গে ঘোরতর মেঘ-নিঘোষ হইতে লাগিল, বায়ু প্রবাহের সহিত সবেগে বারিধারা বর্ষণ আরাম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক তিমিরাবরণে আবৃত, ইতস্ততঃ কিছুই নয়ন গোচর হয় না, নৌকায় দীপালোক নাই, দীপ জ্বালিলেও বায়ুবেগে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হয়। আমি অন্ধকারে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছি, আমার অন্তকরণ ক্লেশ যাতনায় অস্থির, মনের কথা বলিব এমন কেহ নাই; ভৃত্যটি সঙ্গে ছিল, সেও নাই। আমার এক পার্শ্বে শ্রান্ত ক্লান্ত নাবিকগণ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শবের ন্যায় পড়িয়া আছে। রোগীর সেবায় আমি নিতান্ত শ্রান্ত ও অবসন্ন; নিজের আহার নিদ্রা বিলুপ্ত প্রায়। ডাঙ্গায় উঠিয়া দুগ্ধ অন্বেষণ করিয়া আনিতে হইয়াছে, সেই দুধ জ্বাল দেওয়া, অন্ন প্রস্তুত করা এবং হরিদ্রাযুক্ত জলে রোগীকে স্নান করান, তাঁহাকে বীজন করা, রোগের ভিন্ন ভিন্ন উপস্থিত মতে তাহা নিবারণে যত্ন করা ইত্যাদি সমুদায় কার্য্য একাকী আমাকেই করিতে হইয়াছিল। আবার তাহাতে ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী, মুষল ধারায় বারিবর্ষণ। আমার বাহিরে আঁধার, অন্তরেও আঁধার। আমি অন্তরেও কোন আলোক পাইতেছিলাম; বাহিরে বারিদমণ্ডল হইতে অবিরল বারিধারা বর্ষিত হইতেছিল, আমার নেত্রযুগল হইতেও অনর্গল অশ্রুধারা পড়িতেছিল।"[১৬]

দূরারোগ্য স্ত্রীর শয্যাপাশে এক অসহায় স্বামী উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় সময় অতিবাহিত করছেন। প্রকৃতি বিরূপ, রুদ্রমূর্তিতে মেতে উঠেছে প্রলয়লীলায়। প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস সেই সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, নদী ফুঁসে উঠছে, সামনে এগোনোর কোন পথ নেই। অন্ধকার রাত্রিতে মুমূর্ষু স্ত্রীর জন্য নিরাপদ আশ্রয় প্রয়োজন কিন্তু তিনি নিরুপায়। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় তাঁর ভেতরটাও বাইরের প্রকৃতির মতো উত্তাল হয়ে উঠেছে। তাঁর অন্তরের আঁধারটাই যেন রূপকাশ্রয়ে প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। আর তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রুর যে বারিধারা নেমেছে তা বাইরের বারিদমণ্ডল থেকেও ছিল তীব্রতর। তিনি কোথাও আলো দেখতে

পাচ্ছিলেন না। প্রিয়জনের সংকটাপন্ন অবস্থায় লেখকের ব্যক্তিক অনুভূতির যে গভীর অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে তা বাঙালি জীবনযাত্রার চিরন্তন রূপ। শুধু ব্যক্তিগত অনুভূতিই নয়, বাংলার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য রূপায়ণে, সামাজচিত্র নির্মাণে গিরিশচন্দ্রের 'আত্ম-জীবন' এক অনবদ্য সৃষ্টি। এছাড়া তাঁর অনুবাদমূলক রচনাগুলোও দেশীয় শব্দ ব্যবহারে, পরিবেশ বর্ণনায় একান্তই বাংলার আবহকে ধারণ করেছে। সুতরাং তাঁর রচনাবলীকে একেবারে সাহিত্য মূল্যহীন বলে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তবে গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ কর্মের সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিচার করার পূর্বে পাঠককে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, সাহিত্য রচনা নয় ধর্ম প্রচার ছিল তাঁর অনুবাদ রচনার মূল উদ্দেশ্য। সাহিত্যরস সৃষ্টির কোনো সজ্ঞান প্রচেষ্টা এখানে ছিল না। প্রচারাভিযানে বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণাবস্থায় তিনি অনেক অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন। আবার প্রচারযাত্রায় কখনো নৌকায় বসে, কখনো গাছতলায় বসেও অনুবাদ করেছেন। এসব অনুবাদের মাধ্যমে তিনি মানুষের মনে বিশুদ্ধতার এক অতীন্দ্রিয় বোধ জাগাতে চেয়েছেন। যা ধর্মবোধেই সমর্পিত হয়েছে। সুতরাং সাহিত্য রসের আবিষ্টতায় নয়, ধর্মতত্ত্বের সহজ জ্ঞানান্বেষণে তাঁর গ্রন্থাবলী পাঠে মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গিরিশচন্দ্রের রচনাসম্ভার বিশাল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, তাঁর সে বিশাল সাহিত্য সম্ভার আজ দুষ্প্রাপ্য। তাঁর রচিত 'আত্ম-জীবন' সহ মাত্র কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ – 'কোরআন শরীফ;' 'তাপসমালা;' (৬ষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত) 'হিতোপাখ্যানমালা;' (২য় খণ্ড) 'মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনচরিত;'(দ্বিতীয় ভাগ) 'হাদিস পূর্ব্ববিভাগ;' আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এসব গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁর কয়েকটি রচনার নিদর্শন নিচে উদ্ধৃত করছি।

> "। ১। ইহাতে নিঃসন্দেহ, এই পুস্তকই ধর্মভীরু[৪] লোকদিকের জন্য পথ-প্রদর্শক। ২। যাহারা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং আমি যে উপজীবিকা দিয়াছি তাহা ব্যয় করে। ৩। এবং তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে যাহা অবতরণ করিয়াছি তাহা যাহারা বিশ্বাস করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে তাহারা স্বীয় প্রতিপালক কর্তৃক সুপথে আছে এবং তাহারা পরিত্রাণ লাভের যোগ্য। ৪+৫। যাহারা আল্লাহ দ্রোহী হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর তাহাদের পক্ষ্যে তুল্য, তাহারা বিশ্বাস করিবে না। ৬। মহান রব তাহাদিগের অন্তঃকরণ ও কর্ণকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ও তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ আছে, এবং তাহাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে। ৭। (রূকু-১, আয়াত ৭) এবং মানব মণ্ডলীর মধ্যে এরূপ লোক আছে যে, তাহারা বলিয়া থাকে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখি, বাস্তবিক তাহারা বিশ্বাসী নহে। ৮। তাহারা মহান আল্লাহকে ও বিশ্বাসী লোকদিগকে বঞ্চনা করে, বস্তুতঃ তাহারা নিজেদেরকে ব্যতীত বঞ্চনা করে না, এবং তাহারা বুঝিতে পারে না। ৯। তাহাদের অন্তরে রোগ আছে, পরন্তু মহান রব তাহাদের রোগ প্রবল করিয়া তুলিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য ক্লেশজনক শাস্তি আছে, যেহেতু তাহারা অসত্য বলিতেছে। ১০। এবং যখন তাহাদিগকে

বলা হইল, 'ভূমণ্ডলে অহিতাচরণ করিও না, " তাহারা বলিল, "আমরা হিতকারী ইহা বৈ নহি।"১১। জানিও নিশ্চয় তাহারা অহিতকারী, কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। ১২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল, "লোকে যেমন বিশ্বাস করিয়াছে তদ্রূপ তোমরাও বিশ্বাস কর।" তাহারা বলিল, "নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করিতেছে আমরা কি তদ্রূপ বিশ্বাস করিব?" জানিও নিশ্চয় তাহারাই নির্বোধ কিন্তু বুঝিতেছে না।১৩। এবং যখন বিশ্বাসী লোকদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহারা বলে, "আমরা বিশ্বাসী" ও যখন নিভৃত শয়তানদিগের সঙ্গে (আপন দলপতিগণের সঙ্গে) বাস করে তখন বলে, "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সঙ্গী আমরা উপহাস করি, ইহা বই নহে। ১৪। আল্লাহ তাহাদিগকে উপহাস করেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে তাহাদিগকে অবকাশ দেন, তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। ১৫। ইহারাই তাহারা যাহারা সুপথের বিনিময়ে বিপথকে ক্রয় করিয়াছে, অনন্তর ইহাদের বাণিজ্য লাভ হয় নাই ও ইহারা সুপথগামী নহে। ১৬। ইহাদের দৃষ্টান্ত যথা কেহ অগ্নি প্রজ্বলিত করিল পরে যখন তাহা তাহার চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিল, মহান আল্লাহ তাহা হইতে অগ্নির জ্যোতিঃ প্রত্যাহার করিলেন, এবং তাহাকে অন্ধকারে রাখিলেন, সে কিছু দেখিতে পাইল না।"[১৭] ২(র, ২.আ.১৩)

[কোরআন শরীফ]

"শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যাদেশ শ্রবণের পঞ্চদশ বৎসরপূর্ব্ব হইতেই কোথাও চলিতে ফিরিতে মধ্যে মধ্যে 'হে মোহাম্মদ' এমন এক শব্দ যেন অকস্মাৎ হযরতের কর্ণগোচর হইত। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া শব্দোচ্চারণকারী কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না, তাহাতে ভীত ও চিন্তিত হইতেন, দৌড়িয়া খাদিজার নিকটে যাইয়া বলিতেন, "আমার ভয় হইতেছে, কোন বিপদগ্রস্ত বা হই।" খাদিজা সান্ত্বনা দান করিয়া কহিতেন, "নিশ্চিন্ত থাক, ঈশ্বর তোমার অকুশল করিবেন না।" প্রত্যাদেশ লাভের সাতবৎসর পূর্ব্ব হইতে হযরত কখন কখন যেন আলো দেখিতেন, স্বপ্নযোগে অনেক আশ্চর্য ব্যাপার দর্শন করিতেন। যখন প্রকৃতভাবে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সময় নিকটবর্তী হইল, তখন লোক সংসর্গ ছাড়িয়া নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তায় দিন যাপন করিবার জন্য তাহার মন একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সেই সময় হেরা পর্ব্বতের নিভৃত গহ্বরে যাইয়া বসিলেন। অহর্নিশি সেই গর্ত্তমধ্যে ঈশ্বরমননচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন। সেই গর্ত্তে তিনি সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার দৈর্ঘ্য আট হস্ত, পরিসর কিঞ্চিদধিক দুই হস্ত পরিমাণ, উহা মক্কা হইতে তিন মাইল অন্তর। কাবা মন্দির হইতে যাহারা মেনাবাজারে গমন করে, হেরা পর্ব্বত তাহাদের বাম পার্শ্বে থাকে। সে কালে হযরত এইরূপ নির্জ্জন সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল।"[১৮]

[মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত]
পৃষ্ঠা- ২০৪

“তাপসী রাবেয়া ঈশ্বর প্রেমের অন্তঃপুরে, বৈরাগ্য যবনিকার অন্তরালে বাস করিতেন। তিনি পরম বিশ্বাসিনী ঈশ্বরানুরক্তা রমণী ছিলেন। যদি বল,“পুরুষের শ্রেণীতে নারীকে কেন স্থান দান করা হইল?” উত্তর এই, মহাপুরুষ মোহাম্মদ বলিয়াছেন, “সত্যই ঈশ্বর তোমাদের বাহ্য আকৃতি দর্শন করেন না, তোমাদের মন ও সংকল্প দেখেন।”বাস্তবিক আকৃতি কিছুই নহে ধর্ম্মনিষ্ঠাই সার। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, “মনুষ্য মানসিক সদবস্থানুসারে পারলৌকিক শুভাশুভ ফল লাভ করিবে।” প্রেরিত মহাপুরুষের সহধর্ম্মিনী আয়েশা হইতে যেমন ধর্ম্ম শিক্ষা করা বিধেয়, তাঁহার দাসীগণ হইতেও ধর্ম্মবিষয়ে উপকার লাভ করা উচিত। ধর্ম্মপথে যখন কোন অবলা বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তখন তাহাকে অবলা বলা যায় না। যথা, কোন মহাত্মা বলিয়াছেন, “পারলৌকিক বিচারের দিন যখন পুরুষদিগকে আহ্বান করা হইবে, তখন পুরুষের শ্রেণীতে ঈশার জননী মেরি পদ স্থাপন করিবেন।” যখন মহর্ষি হোসেন বসোরী সভায় তাপসী রাবেয়াকে উপস্থিত না দেখিলে ধর্ম্মালোচনা করিতেন না, তখন তাহার প্রসঙ্গ তাপসীদিগের প্রসঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করা অযুক্ত নহে। কথা এই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণের যোগ সম্বন্ধে এই সকল লোকের সম্পর্ক, পুরুষ বা স্ত্রী ইহাতে কি আইসে যায়? রাবেয়ার সময়ে তাঁহার তুল্য উচ্চ ধর্ম্মভাব অন্য কাহার ছিল না। তিনি মহাজনদিগের অগ্রগণ্যা ছিলেন।”[১৯]

[তাপসমালা: প্রথম ভাগ]

“তাপস বায়েজিদ তপস্বিকুলের শিরোভূষণ ছিলেন। তাহার জন্ত প্রেম, বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের জীবন ছিল। বাল্যকাল হইতে তিনি জ্ঞানান্বেষী শুদ্ধ চরিত্র ছিলেন। তত্ত্ব বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি ঈশ্বরের ভাবে ও মত্ততায় সর্বদা বিহ্বল থাকিতেন। বায়েজিদ মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত বস্তাম প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ একজন পৌত্তলিক ও পিতা ধার্মিক মোসলমান ছিলেন। শৈশবকালে তিনি পিতৃহীন হয়েন। তাহার জননী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তিনি জননী কর্তৃক ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে একজন ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষকের নিকটে প্রেরিত হয়েন। একদিন পাঠশালায় তিনি কোরানোক্ত এই প্রবচনটি পাঠ করেন, ‘আমাকে এবং পিতা মাতাকে ধন্যবাদ দেও।’ ইহা পড়িয়াই শিক্ষকের নিকটে অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, শিক্ষক তাহার মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। তখন সেই বচনের ভাব তাঁহার অন্তরকে বিশেষরূপে আন্দোলিত করিয়া তোলে। তৎক্ষণাৎ তিনি গুরুকে বলেন যে, “জননীর নিকট কিছু বলিবার আছে, আমাকে গৃহে যাইতে অনুমতি করুন।”বায়েজিদ এই বলিয়া অধ্যাপক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে চলিয়া আসেন। মাতা সস্নেহ বাক্যে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, “অদ্য একটি প্রবচন পাঠ করিয়াছি যে, ঈশ্বর বলিয়াছেন, তাঁহার

এবং তোমার সেবা করি। কিন্তু আমি ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, দুই প্রভুর সেবা করিতে পারিব না, হয় ঈশ্বর হইতে তুমি আমাকে চাহিয়া লও, আমি চিরজীবন তোমার হইয়া থাকি, নয় ঈশ্বরের কার্য্যে আমাকে সমর্পণ কর, আমি সম্পূর্ণরূপে তাহারই দাস হই।" জননী বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে পরমেশ্বরের সেবাতে অর্পণ করিলাম, আমার সম্বন্ধে তোমার কিছুই কর্তব্য রহিল না, আমার স্বত্ব আমি ছাড়িয়া দিলাম। যাও, তুমি সেই প্রভুর ভৃত্য হও।"[২০]

[তাপসমালা: দ্বিতীয় ভাগ]

"অবদোল্লা খফিফ বলিয়াছেন, "একদা কেহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, মেসরে একজন বৃদ্ধ ও এক যুবক ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত আছে। আমি ইহা অবগত হইয়া তথায় চলিয়া গেলাম, তদ্রূপ দুই ব্যক্তিকে সেখানে দেখিলাম যে, তাঁহারা মৌনভাবে উপবিষ্ট আছেন। তিনবার সেলাম করিলাম, সেলামের উত্তর পাইলাম না। আমি বলিলাম দোহাই ঈশ্বরের, আমার সেলাম গ্রহণ করুন। তখন যুবক মস্তকোত্তলন করিয়া বলিলেন,'খফিফ, সংসার ক্ষুদ্র, এই ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র ব্যতীত অধিক নাই। এই ক্ষুদ্র হইতে ভাগ্য সঞ্চয় করিয়া লও।' ইহা বলিয়াই তিনি মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। আমি ক্ষুধিত ও পিপাসিত ছিলাম। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গেলাম। তাঁহাদের সঙ্গে আমি দুইবার উপাসনা করিলাম ও তাঁহাদিগকে বলিলাম, আমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দান করুন। যুবক বলিলেন, ' আবদোল্লা খফিফ, আমরা সংকটাপন্ন, সংকটাপন্ন লোকদিগকেই কাহার কিছু বলা উচিত।' তিন দিন আমি সেখানে অনাহারে অনিদ্রায় যাপন করিয়াছিলাম। পরে পুনর্ব্বার বলিলাম, আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। যুবক বলিলেন, 'যাহাকে দর্শন করিলে ঈশ্বর স্মরণ হইবে, যাহার প্রতাপ তোমার অন্তরে সংক্রামিত হইবে, এবং যিনি তোমাকে বাক্যের রসনায় উপদেশ না দিয়া জীবনের রসনায় উপদেশ দিবেন, তুমি তাঁহার সঙ্গ অন্বেষণ করিও'।""[২১]

[তাপসমালা : তৃতীয় ভাগ]

"একদা মারুফ কতিপয় ধর্ম্মবন্ধু সহ কোন স্থানে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে দেখেন যে, কতকগুলি আমোদপ্রিয় দুশ্চরিত্র দুর্ব্বৃত্ত যুবা দজ্বলার পারে যাইতে সমুদ্যত। তিনি তীরে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বলেন,"ঋষি, আপনি প্রার্থনা করুন, যেন পরমেশ্বর এই বিমার্গগামী যুবকদিগকে নদীতে ডুবাইয়া মারেন, তাহা হইলে ইহাদের মৃত্যুর সঙ্গে পাপ অত্যাচারের নিবৃত্তি হইবে, অপরলোকের চরিত্রে ইহাদের কলুষিত ভাব আর সংক্রামিত হইবে না।" মারুফ বলিলেন," তোমরা হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রার্থনায় যোগ দান কর।" পরে তিনি এই নিবেদন করিলেন "প্রভো পরমেশ্বর, এই পৃথিবীতে যেমন ইহারা কুৎসিত আমোদ আহলাদে জীবন যাপন করিতেছে, পরলোকের জন্য তুমি

ইহাদিগকে বিশুদ্ধ আনন্দের জীবন দান কর। ইহাদের জীবন ভাল করিয়া দাও।” ধর্ম্মবন্ধুগণ এরূপ প্রার্থনা শ্রবণে বিস্মৃত হইয়া বলিলেন, “আপনি এ কিরূপ প্রার্থনা করিলেন? ইহার মর্ম্ম আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।” তিনি বলিলেন, “প্রতীক্ষা কর, তোমরা ইহার তাৎপর্য্য পরে বুঝিতে পারিবে।” অবশেষে যখন সেই যুবক দল মহাত্মা মারুফকে দর্শন করিল, তখন তাঁহার চরিত্রের পুণ্যপ্রভা সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের জীবনের পরিবর্ত্তন সাধন করিল। তাহারা অনুতপ্ত হইয়া রবাবনামক বাদ্য যন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল, সূরাপুঞ্জ ভূতলে নিক্ষেপ করিল, ক্রন্দন করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল, পাপাচার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চরিত্র হইল। এই ঘটনার পর মারুফ স্বীয় বন্ধুদিগকে বলিলেন, “ দেখিলে একটি প্রাণীকেও শারীরিক কষ্ট পাইতে হইল না, কেহ জলে নিমগ্ন হইল না, অথচ সমগ্র কামনা পূর্ণ হইল।””[২২]

[তাপসমালা : চতুর্থ ভাগ]

“দাউদ তায়ী পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বিংশতি মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিশ বৎসর তাহা ভোগ করেন। কোন কোন সাধু পুরুষ বলিয়াছিলেন, “মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া না রাখাই প্রকৃত ত্যাগস্বীকার।” দাউদ বলেন, “এই কিঞ্চিত পরিমাণ মুদ্রা আমি স্বীয় তপস্যায় নিশ্চিন্ততা ও বিমুক্তিভাব লাভের জন্য রক্ষা করিতেছি। মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহা দ্বারাই আমি জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।” দাউদ কখন নির্ষ্কমা হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। তিনি এতদূর সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন যে, রুটি জলে ভিজাইয়া তাহাকে গুলিয়া শরবতের ন্যায় পান করিতেন, এবং বলিতেন, “ এইরূপ পান করা সহজে হয়। চিবাইয়া খাইতে যে সময় ক্ষয় হয়, তাহাতে আমি কোরাণের পঞ্চাশটি প্রবচন পাঠ করিতে পারি। সময় নষ্ট কেন করিব?” আবুবেকর অইয়াশনামক ব্যক্তি বলিয়াছেন, “একদা আমি দাউদের কুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি একখণ্ড শুষ্ক রুটি সজল নয়নে হস্তে ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম, ‘দাউদ, ব্যাপার কি?’ তিনি বলিলেন, ‘এই রুটিখণ্ড ভক্ষণ করিতে চাই, কিন্তু ইহা বৈধ না অবৈধ, কিছুই জানি না’।” অন্য এক ব্যক্তি দাউদের নিকটে গিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, “আমি যাইয়া দেখি, একটি জলের কলস রৌদ্রে স্থাপিত আছে। বলিলাম, ইহা ছায়াতে কেন রাখ না? দাউদ বলিলেন, ‘যখন স্থাপন করিয়াছিলাম, তখন ছায়া ছিল। এক্ষণ ঈশ্বরের কাছে লজ্জিত যে, নিজে শীতল জলের ভোগাভিলাষী হইব’।”[২৩]

[তাপসমালা : পঞ্চম ভাগ]

“একদা কয়েকজন সাধু বশরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সন্তোষ বিষয়ে কথা বলিতেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলেন, “আপনি লোকের নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করেন না, যদিচ আপনি বৈরাগ্যে দৃঢ়নিষ্ঠ ও সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, তথাপি কিছু

কিছু গ্রহণ করিতে থাকুন এবং গোপনে দরিদ্রদিগকে দান করুন, স্বয়ং নির্ভরের ভাবে অবস্থিতি করুন, অদৃশ্য রাজ্য হইতে স্বীয় উপজীবিকা আহরণ করিতে থাকুন।" এইকথা বশরের সহচরবর্গের নিকটে অতিশয় গুরুতর বোধ হইল। অনন্তর বশরহাফী বলিলেন, "তোমরা উত্তর শ্রবণ কর। জানিও দৈন্যাবস্থা ত্রিবিধ। এক প্রকার দৈন্যাবস্থাপন্ন লোক কখনও প্রার্থী হন না, কেহ দান করিলেও গ্রহণ করেন না এবং দাতা হইতে পলায়ন করেন; ইঁহারা যাহা চাহেন, ঈশ্বর তখন তাহা প্রদান করেন। অন্যবিধ লোক ভিক্ষা করেন না, লোকে দান করিলে গ্রহণ করেন; ইহারা মধ্যমশ্রেণীর দীনাত্মা লোক। এই সকল দীনাত্মাও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর স্থাপন করিয়া স্থিতি করিয়া থাকেন, অক্ষয়ভাণ্ডারে বাস করেন। অন্য এক শ্রেণীর দৈন্যাবস্থাপন্ন লোক ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক স্থিতি করিয়া থাকেন, যতদূর সাধ্য সাবধানে কালযাপন করেন, আহ্বানকারী দাতাদিগকে দূরে পরিহার করিয়া থাকেন।" বশরের মুখে এই উত্তর শ্রবণ করিয়া সেই সাধু বলিলেন, "আপনার এই কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম, ঈশ্বর আপনার প্রতি প্রসন্ন থাকুন।"”[২৪]

[তাপসমালা : ষষ্ঠ ভাগ]

"ওমরের উক্তি;-ইতিমধ্যে একদিন আমরা প্রেরিত মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত ছিলাম। অকস্মাৎ আমাদের নিকটে সুশুভ্র পরিচ্ছদধারী ও সুনীলকেশ-কলা বিশিষ্ট এক পুরুষ উপস্থিত হন। দেশ পর্য্যটনের কোন লক্ষণ তাঁহাতে লক্ষিত হয় নাই, এবং আমাদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি হজরতের নিকটে যাইয়া বসিলেন ও স্বীয় জানুদ্বয় তাহার জানুদ্বয়ের অভিমুখে স্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় করতলদ্বয় স্বীয় জঙ্ঘাদ্বয়ের উপর বিন্যস্ত করিলেন, এবং বলিলেন,"মোহম্মদ, এসলাম ধর্ম্মতত্ত্ব তুমি আমাকে জ্ঞাপন কর।" হযরত বলিলেন, "তুমি সাক্ষ্য দান করিবে যে, ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই, এবং মোহাম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত, (লা এলাহা এল্লেল্লাহু ও মাহাম্মদ রসুলাল্লাহ) এবং নামাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে ও জাকাত দান করিবে, এবং রমজান মাসে রোজা পালন করিবে ও হজ্জ্ব করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিলে কাবামন্দিরে হজ্জ্বব্রত পালন করিবে, এই এসলাম ধর্ম্ম।" আগন্তুক বলিলেন, "তুমি সত্য বলিয়াছ।" আমরা আগন্তুক সম্বন্ধে বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, তিনি হজরতকে প্রশ্ন করিতেছিলেন ও তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করিতে ছিলেন। পরে বলিলেন, "অবশেষে তুমি বিশ্বাসতত্ত্ব আমাকে জ্ঞাপন কর।" হজরত বলিলেন, "তুমি ঈশ্বরকে ও তাঁহার দেবগণকে এবং তাহার শাস্ত্রকে ও তাঁহার প্রেরিতকে ও পরকালকে বিশ্বাস করিবে, এবং তুমি ভাগ্যের শুভাশুভ বিশ্বাস করিবে।" আগন্তুক বলিলেন, "তুমি সত্য বলিয়াছ। অনন্তর ধর্ম্ম জীবনের বিষয়ে তুমি আমাকে জ্ঞাপন কর।" হজরত বলিলেন, "তুমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে পূজা করিবে যেন তাঁহাকে দেখিতেছ, পরন্তু যদি তুমি তাঁহাকে নাও দেখ, তথাপি জানিও তিনি তোমাকে দর্শন করেন।" পরে

আগন্তুক বলিলেন, "কেয়ামতের (পুনরুত্থানের) পূর্ব্বলক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে কিছু জ্ঞাপন কর।" হজরত বলিলেন, "তখন অনুজীবিমণ্ডলী স্বীয় প্রভুর সঙ্গে অত্যন্ত বিরোধ করিবে, এবং তুমি দেখিবে যে, পাদুকাহীন বস্ত্রহীন ছাগরক্ষকগণ বহু পশুর রক্ষক বলিয়া গর্ব্ব করিতেছে।" তৎপর জিজ্ঞাসু চলিয়া গেলেন। আমি কিয়ৎকাল ছিলাম। পরে হজরত আমাকে বলিলেন, "ওমর, কে সে জিজ্ঞাসু চিনিয়াছ?" আমি বলিলাম, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষই বিশেষ জ্ঞাত। হজরত বলিলেন, "তিনি জ্বেব্রিল, তোমাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিতে তোমাদের নিকট আসিয়াছিল।" [মোসলেম ও আবু হোরয়রা এ বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন] তৎপর তিনি কেয়ামত বিষয়ক কোরানের বচনবিশেষ পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, ঈশ্বরের নিকটেই কেয়ামতের ও আকাশ হইতে বারিবর্ষণের জ্ঞান। -বোখারি ও মোসলেম উভয়।"[২৫]

[হাসিদ পূর্ব্ববিভাগ]

"কোন নগররক্ষক এক ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। সে তজ্জন্য সমুদায় যামিনী দুঃখাকুল ছিল। অকস্মাৎ অন্ধকার রজনীতে এক ক্ষুধার্ত দরিদ্রের "হা। অন্ন নাই," এই বিলাপ ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিলে সেই বন্দী বলিয়া উঠিল, "ভ্রাতঃ তুমি কিঞ্চিৎ অন্নের অভাবে নিদ্রা ভোগ করিতে পারিতেছ না, ঈশ্বরের নিকটে এই বলিয়া কৃতজ্ঞ হও, যে, নগর রক্ষক দ্বারা তোমার হস্তপদ দৃঢ় রূপে বদ্ধ হয় নাই। যখন দেখিতেছ, তোমা অপেক্ষা অধিক অভাবশালী লোক আছে, তখন অভাবে পড়িয়া খেদ করিও না। অন্যের দুরবস্থার সহিত আপন অবস্থার তুলনা করিয়া কৃতজ্ঞ থাক।"[২৬]

[হিতোপাখ্যান মালা : ২য় ভাগ]

"আমার বাল্যকালেই পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, বোধ হয় তখন আমার অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। তিনি যে পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন সে পর্যন্ত আমি তাঁহার শাসনাধীনে থাকিয়া কিছু কিছু পড়াশুনা করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকটে বা অন্য কোন গুরুজনের নিকটে পন্দনামা বা গোলস্তান পুস্তক পড়িতেছিলাম। বাঙ্গালা লেখাপড়ার চর্চ্চা প্রায় কিছুই হইতেছিল না। তখন পারস্য ভাষা শিক্ষার প্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল না, বহু বৎসর পর্য্যন্ত অর্থ না বুঝিয়া ছাত্রদিগকে কেবল পাঠ আবৃত্তি করিতে হইত। এইরূপ পাঠ মুখস্থ করাকে "মতন পড়া " বলে। এই প্রকার মতন পড়ায় আমার জীবনের অনেক বৎসর বৃথা ব্যয় হয়। পিতৃদেব স্বর্গগত হইলে পর আমি স্বাধীন হইলাম, পড়াশুনায় অধিকতর অনাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। একদিন সবক (পাঠ) গ্রহণ করিলে তিনদিনেও তাহা ইয়াদ (আবৃত্তি) করা হইত না । শাসনকর্ত্তা কেহ ছিল না, মার অত্যধিক স্নেহ ও আদরে আমাকে অধিকতর বয়ে যাইতে হইয়াছিল।"[২৭]

গিরিশচন্দ্রের রচনার মধ্যে শব্দের আড়ম্বরপ্রিয়তা নেই, নেই গুরুগম্ভীর শব্দের ঝংকার। বিষয়বস্তুকে জটিল করে পাঠককে তিনি ক্লান্ত করে তোলেননি। সহজ সরল সাবলীল ভাষায় ভাবকে প্রকাশ করেছেন। অনুবাদে প্রচলিত শব্দকেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর ঘরোয়া শব্দ ব্যবহারে দূর আরব্য ধর্মীয় কাহিনিগুলো একান্তই আমাদের ভারতীয় হয়ে উঠেছে। তাঁর অনূদিত রচনা পাঠে পাঠক পরিশুদ্ধ সাহিত্য রসে নিমগ্ন হন না বটে; কিন্তু কাহিনির সরল স্বাভাবিক পরিবেশনে ঘটনার পারস্পরিকতায় মুগ্ধ হন। সেই সঙ্গে এক বিশুদ্ধ ধর্মবোধে চিত্ত বিনম্র হয়ে উঠে। এখানেই গিরিশচন্দ্রের সার্থকতা। তিনি আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন নববিধানের আদর্শকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে। নিরলস কর্ম তৎপরতায় সেই আদর্শকে সমুন্নত করার প্রয়াসে তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন আর অনুবাদ কর্মে কাটিয়েছেন ব্যস্ততম সময়। তাঁর গ্রন্থসমূহের একটি বিস্তৃত ও কালানুক্রমিক বর্ণনা দেয়া হলো-[২৮]

১. **বনিতা বিনোদ :** পদ্যে রচিত পুস্তক। স্বামী স্ত্রীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে। আসাম ও বঙ্গদেশের বেশ কিছু বিদ্যালয়ে এ পুস্তক পাঠ্য হয়েছিল। (আত্ম-জীবন; পৃ. ১৬)

২. **ব্রহ্মময়ী চরিত :** প্রকাশকাল ; কলিকাতা; ১২৭৬, (১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ); পৃষ্ঠা- ৩+৫৭।
স্ত্রী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্র এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের স্ত্রীর শ্রাদ্ধসভায় পত্নীর জীবন কাহিনি বিবৃত হয়েছিল। বন্ধুদের আগ্রহ ও অনুরোধে এবং জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীর অর্থ সাহায্যে তা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছিল এবং তা প্রচারভাণ্ডারের স্বত্বরূপে পরিণত হয়েছিল। এ গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত হয়েছিল। (আত্ম-জীবন: পৃ.- ৩৯)

৩. **হিতোপাখ্যান মালা (১ম ভাগ) :** প্রকাশক ও মুদ্রক : হরিমোহন বসাক; গিরিশ প্রেস; ঢাকা; প্রকাশকাল- ১৩ নভেম্বর ১৮৭১; মূল্য : পাঁচ আনা; পৃষ্ঠা- ৯৬। শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ' পদ্য গ্রন্থের গদ্যানুবাদ। গিরিশচন্দ্র বলেন "উহা আসাম প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হয়, পরে বঙ্গদেশের অনেক জিলার স্কুলসমূহের পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক ক্রমে ত্রয়োদশ বার মুদ্রিত করা গিয়াছে।" (আত্ম-জীবন; পৃ.- ১৭)

৪. **হিতোপাখ্যানমালা (দ্বিতীয় ভাগ) :** ঢাকা গিরিশ-যন্ত্রে মুন্সী ওয়াহেদ বক্স প্রিন্টার কর্তৃক মুদ্রিত; প্রকাশ কাল-১২ই মাঘ, ১৩০৩ সন; প্রসিদ্ধ কবি শেখ সাদি প্রণীত বুস্তাঁ পুস্তকের অধ্যায় এর অনুবাদ। পূর্ববঙ্গ চক্রের স্কুল সমুহের ইনস্পেক্টর মহোদয় কর্তৃক উচ্চ প্রাইমারির ১৮১৮সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ও মনোনীত ছিল।

৫. **ধর্ম্ম ও নীতি :** প্রকাশক: উমেশচন্দ্র দত্ত; মুদ্রক : গোপাল কৃষ্ণমিত্র; ওল্ড ইন্ডিয়ান প্রেস; ২৫ বেনিয়াটোলা লেন; কলিকাতা; প্রকাশকাল : ১৮ জুলাই ১৮৭৩; মূল্য দুই আনা; পৃষ্ঠা-১৯।

৬. **ধর্ম্ম বন্ধু : প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী** ; ব্রাহ্মসমাজ; কলিকাতা; মুদ্রক মণিমোহন রক্ষিত; ইন্ডিয়ান মিরর প্রেস; ৬ কলেজ স্কোয়ার; কলিকাতা; প্রকাশকাল : ২০ আগস্ট ১৮৭৬; মূল্যঃ দুই আনা; পৃষ্ঠা-৩৬। 'আকসিরে হেদায়েত' হতে অনূদিত।

৭. **হাফেজ (১ম খণ্ড) :** প্রকাশক : ব্রাহ্মসমাজ মিশন; ১৩, মির্জাপুর স্ট্রীট; কলিকাতা; মুদ্রক : মণিমোহন রক্ষিত; ইন্ডিয়ান মিরর প্রেস; কলিকাতা; প্রকাশকাল : ২৩ জানুয়ারি, ১৮৭৭; মূল্যঃ চার আনা; পৃষ্ঠা-৪৭। 'সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি হাফেজের নৈতিক উপদেশ ও বাণী'র বঙ্গানুবাদ'।

হাফেজ (২য় খণ্ড) : প্রকাশক ও মুদ্রক : গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; ৬৫/২ বিডন স্ট্রীট; কলিকাতা; প্রকাশকাল : ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০; মূল্যঃ চার আনা; পৃষ্ঠা- ৮৮।

হাফেজ (৩য় খণ্ড) : প্রকাশক ও মুদ্রক : বিশ্বনাথ দাস; ২০ পাটুয়াটোলা লেন; কলিকাতা; ১৮ অক্টোবর, ১৮৯১; মূল্য– চারআনা; পৃষ্ঠা– ৯৬।

হাফেজ (৪র্থ খণ্ড) : প্রকাশক ও মুদ্রকঃ জগদ্বন্ধু ঘোষ; ২০ পাটুয়াটোলা লেন; কলিকাতা; প্রকাশকালঃ ২০ অক্টোবর, ১৮৯২; মূল্য– চারআনা; পৃষ্ঠা– ৯৬।

৮. **দরবেশদিগের উক্তি :** প্রকাশক ও মুদ্রক; মণিমোহন রক্ষিত; ইন্ডিয়ান মিরার প্রেস; ৬ কলেজ স্কোয়ার; কলিকাতা; প্রকাশকালঃ ১৯ আগস্ট, ১৮৭৭; মূল্য– দুই আনা; পৃষ্ঠা–৩২। কারসী পুস্তক 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' থেকে মুসলমান দরবেশের উক্তি সংগৃহীত।

৯. **নীতিমালা (১ম খণ্ড) :** প্রকাশক ও মুদ্রক; মণিমোহন রক্ষিত; ইন্ডিয়ান মিরার প্রেস; ৬ কলেজ স্কোয়ার; কলিকাতা; প্রকাশকালঃ ১৯ আগস্ট, ১৮৭৭; মূল্য–চার আনা; পৃষ্ঠা–৮০; 'আকসিরে হেদায়েত' নামক উর্দু গ্রন্থ হতে অনূদিত।

১০. **দরবেশদিগের ক্রিয়া :** প্রকাশকালঃ কলিকাতা, ১৮৭৮; পৃষ্ঠা–৬৪।

১১. **দরবেশদিগের সাধন প্রণালী (১ম খণ্ড) :** প্রকাশক ও মুদ্রকঃ মণিমোহন রক্ষিত, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; প্রকাশকালঃ ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯; মূল্য– তিনআনা; পৃষ্ঠা–৩৫।

১২. **প্রবচনাবলী : প্রকাশক ও মুদ্রক :** পূর্ণচন্দ্র দে, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; প্রকাশকালঃ ২৪ জানুয়ারি ১৮৮০; মূল্য– এক আনা; পৃষ্ঠা–১৬।

১৩. **তাপসমালা (প্রথম ভাগ) :** প্রকাশক ও মুদ্রক : পূর্ণচন্দ্র দে, ৬ কলেজ স্কোয়ার; কলিকাতা; প্রকাশকালঃ ৯ অক্টোবর, ১৮৮০; মূল্য–আটআনা; পৃষ্ঠা–৮০; গ্রন্থস্বত্ব : গ্রন্থকার; দ্বিতীয় সংস্করণ-১৮৮৬।

তাপসমালা (২য় ভাগ) : প্রকাশক ও মুদ্রক : রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য; ৬ কলেজ স্কোয়ার; কলিকাতা; প্রকাশকালঃ ২৬ এপ্রিল, ১৮৮১; মূল্য– আটআনা; পৃষ্ঠা– ৯৮; গ্রন্থস্বত্বঃ গ্রন্থকার; দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৮৯০।

তাপসমালা (৩য় ভাগ) : প্রকাশক ও মুদ্রক : রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য; ৬ কলেজ স্কোয়ার; কলিকাতা; প্রকাশকাল: ১৮ এপ্রিল, ১৮৮২; মূল্য– আটআনা; পৃষ্ঠা–৮০; দ্বিতীয় সংস্করণ; ১৮৯২।

তাপসমালা (চতুর্থ ভাগ): পারস্য পুস্তক তেজকরতোল আওলিয়ার বঙ্গানুবাদ; ৩নং রমানাথ মজুমদারের স্ট্রীট, কলিকাতা; পৃ.-৮৭; দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯০২;

তাপসমালা (৫ম ভাগ) : প্রকাশক ও মুদ্রক : প্রাণকৃষ্ণ দত্ত; মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস; ২০ পটুয়াটোলা লেন; কলিকাতা; প্রকাশকাল: ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪; মূল্য– আট আনা; পৃষ্ঠা–৮৯।

তাপসমালা (৬ষ্ঠ ভাগ) : প্রকাশক ও মুদ্রক : প্রাণকৃষ্ণ দত্ত; মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস; ২০ পটুয়াটোলা লেন; কলিকাতা; প্রকাশকাল: ১৮৯৫; পৃষ্ঠা– [৯.+৯.+১১৮] দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯০৫।

১৪. **কোরআন শরীফ (১ম খণ্ড) :** প্রকাশক : গিরিশচন্দ্র সেন; শেরপুর;ময়মনসিংহ; মুদ্রক : তারিণীচরণ বিশ্বাস; চারুযন্ত্র; শেরপুর; ময়মনসিংহ; প্রকাশকাল: ২১ ডিসেম্বর, ১৮৮১; মূল্য– চারআনা; পৃষ্ঠা– ২৮; মুদ্রণ সংখ্যা–১০০০; গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক।

কোরআন শরীফ (অখণ্ড) সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ১২৯৮। প্রকাশক ও মুদ্রক: গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী; দেবযন্ত্র; ৬৫/২ বিডন স্ট্রীট; কলিকাতা; মূল্য–চার টাকা; পৃষ্ঠা– ১১০+১০+৮০০+১১৯০+১০+১০ +১৪।

'দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে' অনুবাদক লিখেছেন, "ঈশ্বর কৃপায় কোরআনের অনুবাদ দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। প্রথমবারের মুদ্রিত সহস্র পুস্তক বহুকাল নিঃশেষিত হইয়াছে। অনেক গ্রাহক পুস্তক চাহিয়া প্রাপ্ত হন নাই। প্রায় তিন বৎসরে দ্বিতীয় সংস্করণের কার্য্য সমাপ্ত হইল। মুদ্রাযন্ত্র নিজের আয়ত্তাধীন না থাকাতে মুদ্রাঙ্কনে ঈদৃশ কাল-গৌণ বহু অসুবিধা হইয়াছে।"

তৃতীয় সংস্করণ : ১৮৫৯ শকাব্দ (১৯০৪ খ্রীস্টাব্দ)। প্রকাশক ও মুদ্রক : কে পি. নাথ; মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস; ৩ রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা; মূল্য– চার টাকা; পৃষ্ঠা– ৮+৪+১০+৭২০; মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০।

চতুর্থ সংস্করণ : ২৪ নভেম্বর, ১৯৩৫; প্রকাশক : সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়; ৯৫, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট; কলিকাতা; মূল্য– ছয় টাকা; পৃষ্ঠা– ৩০+৭২০; ভূমিকা : মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ; মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০।

হরফ সংস্করণ : ১ বৈশাখ, ১৩৮৬; প্রকাশক : আবদুল আজীজ আল্ আমান; হরফ প্রকাশনী; এ- ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট; কলিকাতা; মুদ্রক : ক্যালকাটা প্রিন্টিং হাউস; ৭৯/৯ বি আচার্য জে.সি বোস রোড; কলিকাতা; মূল্য–পঞ্চাশ টাকা; পৃষ্ঠা– ৬৯+৬৮৩+৪; অনুবাদক জীবনী : সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৫. **তত্ত্ব-কুসুম :** প্রকাশক ও মুদ্রক: রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য; ৬ কলেজ স্কোয়ার; কলিকাতা; প্রকাশকাল-২০ এপ্রিল, ১৮৮২; মূল্য– দুই আনা; পৃষ্ঠা– ৩২; মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০; গ্রন্থস্বত্ব : গ্রন্থকার; 'গোলশানে আসরার ' নামক ফারসি গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

১৬. **তত্ত্ব-রত্নমালা :** প্রকাশক ও মুদ্রক : রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য; কলিকাতা; প্রকাশকাল : ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২; মূল্য—চার আনা; পৃষ্ঠা— ৪৬; মুদ্রণ সংখ্যা— ৫০০; 'মনতে কোওয়র'ও জালালুদ্দীন রুমীর সুবিখ্যাত 'মসনবী শরীফ' নামক ফারসি গ্রন্থ থেকে সংকলিত। "১৯১৪ সনে এ বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।" (মুহম্মদ আবদুল হাই; 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'; ৫ম সং. ঢাকা চৈত্র, ১৮৮৫ ; পৃ.– ১৩০)

১৭. **মহাপুরুষচরিত (১ম ভাগ) :** প্রকাশক: কে.পি. নাথ; ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা; মূল্য— দশআনা; পৃষ্ঠা— ১১০+১২৭; প্রথম ভাগে 'আদি বাইবল ও বিশেষ বিশেষ মুহাম্মদীয় গ্রন্থ' হতে 'মহাপুরুষ এব্রাহিম, মুসা ও দাউদের জীবনচরিত' সংকলিত হয়েছে।

খ. মহাপুরুষ চরিত (২য় ভাগ) : প্রকাশক ও মুদ্রক : রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য; ৬ কলেজ স্কোয়ার; কলিকাতা; প্রকাশকাল : ৬ জানুয়ারি, ১৮৮৪; মূল্য— ছয় আনা; পৃষ্ঠা—৫২; মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০; গ্রন্থস্বত্ব : গ্রন্থকার।

গ. মহাপুরুষ চরিত (৩য় ভাগ): প্রকাশক ও মুদ্রক : রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য; ৭২ আপার সার্কুলার রোড; কলিকাতা; প্রকাশকাল : ২৪ জানুযারি, ১৮৮৫; মূল্য— দুই আনা; পৃষ্ঠা—২৭; মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০; গ্রন্থস্বত্ব : গ্রন্থকার।

১৮.ক. ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের সহজ বোধ্য বাঙালা অনুবাদ (প্রথম খণ্ড) : প্রকাশক : গিরিশচন্দ্র সেন; ঢাকা মুদ্রণ : অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়; ১৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন; কলিকাতা; প্রকাশকাল— ২৪ নভেম্বর, ১৮৮৫; মূল্য— এ টাকা; পৃষ্ঠা— ৭৬।

খ. ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের সহজবোধ্য বাঙালা অনুবাদ (২য় খণ্ড) : প্রকাশক, অনুবাদক, মুদ্রক : অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়; ১৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন; কলিকাতা; প্রকাশ কাল : ২৪ নভেম্বর, ১৮৮৫; মূল্য— এক টাকা; পৃষ্ঠা— ৬৫।

১৯. **মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত (১ম ভাগ) :** প্রকাশক ও মুদ্রক : রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য; বিধান প্রেস; ৭২ আপার সার্কুলার রোড; কলিকাতা; প্রকাশকাল : ২৩ জানুয়ারি, ১৮৮৬; মূল্য— এক টাকা; পৃষ্ঠা-১৬৪; মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০; "হজরত মুহাম্মদের মদিনায় হিজরত পর্যন্ত জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। নববিধান কর্তৃক প্রকাশিত মহাপুরুষ চরিত সিরিজের অন্তর্গত।" (আলী আহমদঃ 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপুঞ্জি, : পৃষ্ঠা-৩৮৭)

এই গ্রন্থ সম্পর্কে মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীনের মন্তব্য : "গিরিশ বাবুর পূর্বে আর কেহ 'হজরতের জীবন' বাঙ্গালাতে লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টানেরা লিখিতে পারে, কিন্তু সে ত জীবনী নহে- কেবল গালাগালি মাত্র। গিরিশ বাবু কৃত 'জীবনী' ব্রাহ্মদিগের নোট, টিকা-টীপ্পনী ও পরিশিষ্ট বাদ দিয়ে পড়িলে, উহা যে উৎকৃষ্ট ও হজরতের জীবনী সম্বন্ধীয় বিস্তৃত পুস্তক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" ['ইসলাম প্রচারক': নভেম্বর- ডিসেম্বর, ১৯০১; পৃষ্ঠা— ১৮৮]

খ. মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত (২য় ভাগ) : প্রকাশক ও মুদ্রক : রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য; বিধান প্রেস; ৭২ আপার সার্কুলার রোড; কলিকাতা; প্রকাশকাল : জানুয়ারি, ১৮৮৭; মূল্য– এক টাকা; পৃষ্ঠা– ১৫৮; 'হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর হিজরতের পর প্রথম পাঁচ বৎসরের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।" (আলী আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা– ৩৮৭)

গ. মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত (৩য় ভাগ) : প্রকাশক ও মুদ্রকঃ রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য; ৭২ আপার সার্কুলার রোড; কলিকাতা; প্রকাশকাল : ২৮ মে, ১৮৮৭; মূল্য– এক টাকা চার আনা; পৃষ্ঠা– ২০২; গ্রন্থস্বত্বঃ গ্রন্থকার; "হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এর জীবনের শেষভাগের কাহিনী।" (আলী আহমদঃ পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা– ৩৮৮)।

২০. **পরমহংসের উক্তি :** প্রকাশক ও মুদ্রক : রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য; বিধান প্রেস; ৭২ আপার সার্কুলার রোড; কলিকাতা; প্রকাশকালঃ ২৪ জানুয়ারি, ১৮৮৭; মূল্য– দুই আনা; পৃষ্ঠা– ৬৪; গ্রন্থস্বত্ব : ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ; ৫৪ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট; কলিকাতা। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

২১. **নববিধান প্রেরিতগণের প্রতি বিধি :** প্রকাশক ও মুদ্রক : রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য; বিধান প্রেস; ৭২ আপার সার্কুলার রোড; কলিকাতা; প্রকাশকাল : ২৪ জানুয়ারি, ১৮৮৭; মূল্য– এক আনা; পৃষ্ঠা– ৩৪।

২২. **নববিধান কি?:** প্রকাশক ও মুদ্রক : রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য; বিধান প্রেস; ৭২ আপার সার্কুলার রোড; কলিকাতা; প্রকাশকাল– ২৪ জানুয়ারি ১৮৮৭; মূল্য– তিন পাই; পৃষ্ঠা–১১।

২৩. **হাদিস মেশকাত মসাবিহ (পূর্ববিভাগ, ১ম খণ্ড) :** প্রকাশক ও মুদ্রক : বিশ্বনাথ দাস; ২০ পটুয়াটোলা লেন; কলিকাতা; প্রকাশকালঃ ২৪ জানুয়ারি, ১৮৯২; মূল্য– আট আনা; পৃষ্ঠা–৭৩; গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক।

২৪. **তত্ত্বসন্দর্ভমালা (১ম ভাগ) :** প্রকাশক ও মুদ্রক : পি কে. দত্ত; ২০ পটুয়াটোলা লেন; কলিকাতা; প্রকাশকাল : ২৭ আগস্ট, ১৮৯৩; মূল্য– ছয় আনা; পৃষ্ঠা–৯২; গ্রন্থস্বত্ব : লেখক; গ্রন্থটিতে 'নববিধানের মূলতত্ত্ব বিবৃত হইছে।'

২৫. **পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্তজীবন চরিত :** প্রকাশক ও মুদ্রক : প্রাণকৃষ্ণ দত্ত; ২০ পটুয়াটোলা লেন; কলিকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ- ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪; মূল্য– তিন আনা; পৃষ্ঠা–৬৪; গ্রন্থস্বত্ব : ব্রাহ্ম মিশন অফিস; কলিকাতা। এ গ্রন্থে রামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনসহ ১৮৪টি বাণী সংকলিত হয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেন এই গ্রন্থটিকে গিরিশচন্দ্রের 'উল্লেখযোগ্য' রচনা বলে অভিহিত করেছেন। ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ' ৩য় খণ্ড, সপ্তম সং- ১৩৮৬ ; আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ; পৃষ্ঠা–৩৮৮)।

২৬. **মাতৃবিয়োগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস :** প্রকাশকাল : ১৩০৪; মা জয়কালী দেবীর মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবন' এ বলেন "শ্রাদ্ধক্রিয়ার দিন 'মাতৃবিয়োগে হৃদয়ের

উচ্ছ্বাস' নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক ক্রিয়াক্ষেত্রে পঠিত হইয়াছিল। সেই পুস্তিকায় মাতৃচরিত্র ইত্যাদি কথঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে।'('আত্ম-জীবন', পৃষ্ঠা– ৬৪)

২৭. **কাব্যলহরী :** প্রকাশক : গিরিশচন্দ্র সেন; মুদ্রক : ভানুচন্দ্র দাস; গেন্ডারিয়া প্রেস; ঢাকা; প্রকাশকাল : ১৮ জুন ১৮৯৭; মূল্য– চার আনা; পৃষ্ঠা–৬০; মুদ্রণ সংখ্যা– ২০০; মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণির ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কবিতা সংকলিত হয়েছে এ পাঠ্য পুস্তকটিতে।

২৮. **কোচবিহার বিবাহের বৃত্তান্ত :** প্রকাশকাল: ১৮৯৭। "কোচবিহার বিবাহ" বিষয়ে যে সকল অপপ্রচার করা হয় প্রত্যক্ষদর্শী রূপে তাহার খণ্ডন।

২৯. **ইমাম হসন ও হোসয়ন :** প্রকাশক ও মুদ্রক : কে.পি. নাথ; ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা; প্রকাশকাল: জানুয়ারি, ১৯০১; মূল্য– একটাকা; পৃষ্ঠা–১৭০। "রওজতোশ শোহদা নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন মূল পারস্য গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।" মুন্‌শী জমিরুদ্দীন মন্তব্য করেছেন, "বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃগণ যদি এমামদ্বয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনী জানিতে পান, তাহা হইলে একবার এই গ্রন্থখানি পাঠ করুন।" ('ইসলাম প্রচারক' ; নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০১; পৃ.– ১৮৮)

৩০. **দরবেশী : প্রকাশক ও মুদ্রক :** কে .পি. নাথ; ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯ এপ্রিল, ১৯০২; মূল্য– চার আনা; পৃষ্ঠা– ৭২; গ্রন্থস্বত্ব : ব্রাহ্ম মিশন অফিস; কলিকাতা। ইমাম গাজ্জালীর 'কিমিয়ায়ে সাদৎ' গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ 'আকসির-ই- হেদায়য়েত' থেকে সংকলিত "মোসলমান সাধকদিকের বৈরাগ্যতত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর বিশেষ বিবরণ।"

৩১. **বিশ্বাসী সাধক গিরীন্দ্রনাথ রায় :** প্রকাশক ও মুদ্রক : কে পি নাথ; ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা; প্রকাশকাল: ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩; মূল্য– চার আনা; পৃষ্ঠা–৮০।

ভারতের ইংরেজ শাসন : প্রকাশকাল–১৯০৫; প্রবন্ধ পুস্তক।

৩২. **মহাপুরুষ মোহাম্মদ এবং তৎপ্রবর্তিত এছলামধর্ম্ম :** প্রকাশক: কে. পি. নাথ; ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা; প্রকাশকাল : ১০ জানুয়ারি, ১৯০৬; মূল্য– বার আনা; পৃষ্ঠা– ১০+১০০।

৩৩. **ধর্ম্মবন্ধুর প্রতি কর্তব্য :** প্রকাশক ও মুদ্রক : কে.পি নাথ; ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা; তৃতীয় সংস্করণ, ২২ মার্চ, ১৯০৬; মূল্য– দুই আনা; পৃষ্ঠা– ২৮+৩৮; 'কিমিয়ায়ে সাদৎ' ও 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' নামক ফারসি গ্রন্থ থেকে উপদেশবাণী সংকলিত।

৩৪. **চারিজন ধর্ম্মনেতা :** প্রকাশক ও মুদ্রক : কে. পি. নাথ. ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯০৬। মূল্য– আটআনা। পৃষ্ঠা– ৮+৮৮। চার খলিফার জীবনকথা।

লেখক সূচনায় বলেছেন, "মক্কা বিজয়ের পর হইতে মোসলমানদিগের বলবৃদ্ধি রাজ্য বৃদ্ধি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়; এসলাম ধর্ম্ম দিক দিগন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। হজরত মোহাম্মদ মদিনায় যাইয়া দশ বৎসর কালমাত্র জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার

পরলোকান্তে তাহার চারিজন প্রধান প্রচারবন্ধু ক্রমে এস্‌লামমন্ডলীর নেতৃত্ব ও রাজ্যাধিপত্য লাভ করেন। এই পুস্তকে সেই চারিজন নেতার জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত হইল।"

৩৫. **ধর্ম্মসাধন নীতি :** প্রকাশক ও মুদ্রক : কে. পি. নাথ; ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা; প্রকাশকাল-২৭ জুলাই, ১৯০৬; মূল্য– ছয়আনা; পৃষ্ঠা–৬১। ইমাম গাজ্জালীর 'কিমিয়ায়ে সাদতে'র উর্দু অনুবাদ 'আকসির-ই-হেদায়াতে'র 'তেরাজ্জোল আবেদিন' ও মেফহাজ্জোল আবেদিন' গ্রন্থ হতে নির্বাচিত অংশের অনুবাদ।

৩৬. **বরদেশ্বরীচরিত :** প্রকাশ: ১৩১৩। জ্যেষ্ঠা ভগ্নির জীবনকথা। লেখক বলেছেন, 'বরদেশ্বরী দেবীর একখানা জীবন তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়ার দিবস পঠিত হইয়াছিল। পরে তাহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা গিয়াছে।' ('আত্ম-জীবন'; পৃষ্ঠা–৮৯-৯০)

৩৭. **আত্ম-জীবন :** প্রকাশকাল : ২২ পৌষ, ১৩১৩ সাল; কলিকাতা; মূল্য– ১, মাত্র; পৃষ্ঠা– ৬+১৪৬।

৩৮. **মহালিপি (১ম খণ্ড):** প্রকাশকাল : ১৯০৮; পৃষ্ঠা– ৪+২+৫১।"পরমসাধু মখদুম শরফোদ্দিন আহমদ মনিরী কর্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত মূল শততম পত্রাবলীর ভিতর দশটীর বঙ্গানুবাদ।"

৩৯. **সতীচরিত :** প্রকাশক ও মুদ্রক : কে.পি. নাথ; ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা; তৃতীয় সংস্করণ: ১৮৩২ শকাব্দ (১৯১১ খ্রীস্টাব্দ); মূল্য– ছয় পাই; পৃষ্ঠা– ১৩; পরলোকগতা মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা।

৪০. **চারিটী সাধ্বী মোসলমান নারী :** প্রকাশক : কে.পি. নাথ; ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৮সেপ্টেম্বর, ১৯১৩; মূল্য–চার আনা; পৃষ্ঠা– ২+৫৬। "দেবী খাদিজা, ফাতেমা, আয়েশা ও তপস্বিনী রাবেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রচীন পারস্য গ্রন্থ মেরাজ্জোল নবুওয়ত এবং তেজকরাতোল আউলিয়া হইতে সঙ্কলিত।"

৪১. **কোরানের রচনাবলী :** গিরিশচন্দ্রের 'আত্ম-জীবন' এ উদ্ধৃত 'উইলপত্রে' এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে বলে উল্লেখ আছে।

৪২. **ঈশ্বর কি ঈশ্বর ? :** ধর্মতত্ত্ব বিষয় প্রকাশিত পুস্তক। গিরিশচন্দ্রের 'উইলপত্রে' এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪৩. **প্রকৃত ধর্ম্ম :** এ গ্রন্থ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলেছেন, "বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে ময়মনসিংহ নগরে স্থিতিকালে একবার আমি ছুটী উপলক্ষ্যে নিজালয়ে যাইয়া কতিপয় আত্মীয় যুবাকে আহবান করিয়া আনিয়া "প্রকৃত ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। পরে সেই বক্তৃতার মর্ম্ম লিখিয়া পুস্তাকারে মুদ্রিত করা গিয়াছিল। " [আত্ম-জীবন; পৃ.– ৮২]

৪৪. **বল্‌খ রাজ্যাধিপতি এব্রাহিম আদহমের বৈরাগ্যবৃত্তান্ত:** কেশবচন্দ্রের উৎসাহে তা মুদ্রিত ও ভাদ্রোৎসবে পঠিত হয়। [আত্ম-জীবন; পৃ.-৯৩]

উর্দু পুস্তক

১. **মজহবে হাক্কানী :** প্রকাশক : লালা রলারাম ভিমভাট; ব্রাহ্মসমাজ লাহোর; উর্দু বক্তৃতার পুস্তকরূপ; মূল্য– এক আনা।

২. **ইমান ক্যা চিজ হ্যায় :** প্রকাশক : লালা রলারাম ভিমভাট, ব্রাহ্মসমাজ লাহোর; মূল্য– এক আনা।

৩. **নয়ি শরিয়ত ক্যা হ্যায় :** প্রকাশক : লালা রলারাম ভিমভাট; ব্রাহ্মসমাজ লাহোর; মূল্য–দুই আনা।

৪. **ব্রাহ্মধর্ম্মকাদস্তরুল আলম :** 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' পুস্তকের উর্দু অনুবাদ; প্রকাশক : লাহোর ব্রাহ্মসমাজ; মূল্য– দুই আনা।

৫. **তালিমোল ইমান :** 'ধর্ম্মশিক্ষা' পুস্তকের উর্দু অনুবাদ; প্রকাশক : লাহোর ব্রাহ্ম সমাজ; মূল্য– দুই আনা।

৬. **আস্রারে এবাদত :** প্রকাশকাল : পাটনা, ১৮৯৯; উর্দু বক্তৃতার গ্রন্থরূপ।

৭. **হকতালা গায়েব নহী বলকে হাজের হ্যায় :** প্রকাশকাল : ১৯০৬।"...স্বর্গগত বিশ্বনাথ রায় কর্তৃক স্থাপিত অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ভাণ্ডারের সাহায্যে সম্প্রতি লাহোরে মুদ্রিত হইয়াছে। " [আত্ম-জীবন : পৃ.–৭৫]

গ. পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা

গিরিশচন্দ্র সেন ছাত্রজীবন থেকেই পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেছিলেন। নর্মাল শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাংলা কবিতার প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মেছিল। সে সময় তিনি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কবিতা রচনা করে 'চিত্তরঞ্জিকা' (১৮৬২- অল্পকাল) নামক সাময়িক পত্রে লেখা পাঠাতেন।[২৯] এরপর তিনি 'ঢাকা প্রকাশ' (১৮৬১-৬২) নামক পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছিলেন। সে সময় তিনি ময়মনসিংহের সংবাদ প্রকাশের সাথে সাথে লেখালেখিও করতেন। তারপর ঘটনাপ্রবাহে জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করে তিনি ময়মনসিংহ ছেড়ে কোলকাতার ভারতাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থানকালেও তিনি পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখতেন। 'জ্ঞানোন্নতি বিধায়নী', 'বামাবোধিনী'(১৮৬৩-১৯২৩) ও 'পরিচারিকা'(১৮৭৮-১৯২৮) পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং ১২ বছর 'মহিলা' পত্রিকা ও কিছুদিন 'বঙ্গবন্ধু' (১৮৭০-)পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সুতরাং সমকালীন বিষয় ও প্রেক্ষাপট নিয়ে তিনি যে অসংখ্য প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় রচনা করেছেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সেগুলোর কোনোটার সন্ধান আমরা পাইনি। দুঃখজনক হলেও সত্য কালের বিবর্তনে সেগুলো দুষ্প্রাপ্য। এক শতাব্দী পরের পাঠকের পক্ষে তা উদ্ধার করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। কাজেই তাঁর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে গেছে। আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' (ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯) গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর ক্ষুদ্র পরিচয় তুলে ধরেছেন। তা নিম্নরূপ-

১. বর্ম্মাদেশ ও বর্ম্মাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম : 'ধর্ম্মতত্ত্ব', ১৮২৮-২৯ শকাব্দ
২. পাঞ্জাবে ধর্ম্মপ্রভাব: 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ; ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ
৩. তুহফাতুল মোহায়োদিন (রাজা রামমোহন রায়ের ফারসি গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ) 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ; ১৮২০-২১ শকাব্দ।
৪. প্রচার-বৃত্তান্তঃ গিরিশচন্দ্রের পশ্চিমাঞ্চলের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকায়।[৩০]
৫. নিম্ন আসাম ও মধ্য আসামে গিরিশচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বৃত্তান্ত কেশবচন্দ্র 'রবিবাসরীয় মিরার'পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[৩১]
৬. 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'মহিলা' পত্রিকায় তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। এই প্রচার বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে নব্যভারত পত্রিকার মন্তব্য; 'প্রচারক হইবার পর যে সকল স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিতেন। সেগুলো পড়িতে বড় মনোরম।"[৩২] (ভাদ্র ১৩১৭; পৃ.- ১৮১)

ঘ. সাময়িকপত্র সম্পাদনা

গিরিশচন্দ্রের জীবন ছিল বিচিত্র কর্ম মহিমায় বর্ণাঢ্য জীবন। নতুন কর্মোদ্যমের প্রেরণায় তাঁর জীবনে বার বার বাঁক পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমদিকে, তাঁর কর্মজীবন কোথাও স্থায়িত্ব পায়নি। তারপর ধর্মজীবনে প্রবেশ করার পর কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় তাঁর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সমন্বয় ঘটেছে। তিনি তাঁর আরাধ্য কর্মজীবনে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাতে পেরেছেন। তাঁর ছাত্রজীবনে কাব্যচর্চা, বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজ সচেতনতার আভাসই আমরা পাই। তিনি বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার আদর্শিক একটি কর্মজীবনই চেয়েছিলেন। বাস্তবের নির্মমতায় শ্রান্ত হয়ে কখনো কখনো প্রচণ্ড অভিমানে থেমে গিয়েছেন বটে কিন্তু আত্ম-শক্তির সুতীব্র একাগ্রতায় আবার ফিরে এসেছেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত কর্ম সাধনায়। তিনি দীর্ঘদিন পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার কাজে জড়িত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ‘ঢাকা প্রকাশ’ (১৮৬১–৬২ খ্রি.) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় সাংবাদিকের কাজ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তাঁর ‘কর্মজীবন’ অধ্যায়ে। যাই হোক, তাঁর সাংবাদিক জীবন সুখের হয়নি। ভুল সংবাদ পরিবেশনের কারণে সেবার তিনি মানহানির মামলা থেকে কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি ভারতাশ্রমে অবস্থান কালে স্ত্রীলোকের ‘জ্ঞানোন্নতি বিধায়নী,’ ‘বামাবোধিনী’ (১৮৬৩–১৯২৩ খ্রি.) পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন বহুদিন। তাঁরই প্রস্তাবে এবং উদ্যোগে ‘পরিচারিকা’(১৮৭৮–১৯২৮ খ্রি.) নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এ পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ না করলেও বহুকাল তিনি এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। এছাড়া ১২ বছর ধরে তিনি ‘মহিলা’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ‘মহিলা’র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বাংলার নারীদের উন্নতি ও কল্যাণ কামনার মুখপত্র ছিল ‘মহিলা’। নারী শিক্ষা, তাঁদের মানসিক বিকাশ, সাংসারিক উন্নয়নে তাঁদের ভূমিকা প্রভৃতি আলোচনার মাধ্যমে নারীর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করাই ছিল ‘মহিলার’ উদ্দেশ্য। তবে গিরিশচন্দ্র নারী উন্নয়নকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। একজন শিক্ষিত মহীয়সী বাঙালি নারীর ওপর তিনি ভারতীয় শাশ্বত নারী চেতনাকে আরোপ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষিত আধুনিক নারী রক্তমাংসের বোধহীন পুতুল, যার দায়িত্ব স্বামীর যোগ্য হয়ে সুখময় সংসার নির্মাণ করা। এর বাইরে নারীর আধুনিকতাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। যেখানেই এর অন্যথা দেখেছেন, সেখানেই তাঁর ‘মহিলা’ পত্রিকা নারীর বিরুদ্ধাচারণে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, “অনেক মহিলার ধর্ম্মহীনতা, অস্বাভাবিক সভ্যতা ও বিবীয়ানার বিরুদ্ধে দুঃখের সহিত আমাকে কখন কখন সমালোচনা করিতে হয়, তাহাতে আমি জানি জ্ঞানাভিমানিনী নব্য মহিলারা বিশেষতঃ কোন কোন উপাধিধারিণী মহিলা তাহা পড়িয়া ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হন, কিন্তু মহিলা তাঁহাদের পরম হিতৈষণী, এক্ষণ না বুঝিলেও আশা করি সময়ে বুঝিতে পারিবে।”[৩৩] ‘মহিলা’র এহেন উন্নতি কামনা সম্ভবত নারী উন্নয়নকে খুব বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। সময়কে ধারণ করে সময়োপযোগী চেতনায় নারীর বিকাশকে সুদৃঢ় করা ‘মহিলা’র পক্ষে সম্ভব হয়নি। নারীর ধর্মহীনতা, বিবিয়ানা ও নব্য সভ্যতায় একাত্মতার বিরুদ্ধাচারণে ‘মহিলা’র মহৎ জীবনদৃষ্টি প্রকাশ পায়নি। নারীকে ধর্মভ্রষ্টতা ও আদর্শহীনতা থেকে রক্ষা করা ছিল ‘মহিলা’র অন্যতম কাজ। বলা যায়,

আর্য নারীর আদর্শ ও সুনীতির সমন্বয়ে আদর্শিক বাঙালি নারী চরিত্র গঠন ছিল 'মহিলা'র উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বাংলা সাময়িকপত্র' এ জানা যায়–

> "স্বদেশের সতী আর্য্যনারীদিগের উচ্চজীবন ও সুনীতিকে আদর্শ করিয়া জাতীয়ভাবে নারী চরিত্র গঠন ও সংশোধন এবং সমোন্নত করিতে প্রথম বাংলা 'মহিলা' পরামর্শদান ও যত্ন করিয়া আসিয়াছেন চিরকাল সেইরূপ যত্ন করিবেন তাঁহার এই সঙ্কল্প। বঙ্গীয় নারীমণ্ডলীতে যে সকল কুসংস্কার অনীতি এবং দূষিত আচার ব্যবহার বদ্ধমূল হইয়া আছে এবং বিজাতীয় অন্তঃসারশূন্য বিলাসাড়ম্বর প্রবেশ করিতেছে, চিরকাল 'মহিলা' সেই সকলের প্রতিবাদ করিবেন, ধর্ম্ম সুনীতি ও সদাচারের এবং নারী প্রকৃতির অনুযায়িনী সৎশিক্ষায় সমর্থন করিবেন, প্রতিক্রিয়া মহিলার এই সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্য।"[৩৪]

'মহিলা' সম্পর্কে শ্রী সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন,

> "ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে মহিলাদিগের শিক্ষায় নিযুক্ত করেন। তিনি আজীবন ঐ ব্রতকে সম্মান করিয়াছিলেন। নিজের দায়িত্বে "মহিলা" পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া "বামাবোধিনী পত্রিকা" ও "পরিচারিকা" পত্রিকার অভাব মোচন করিয়াছিলেন, "মহিলার" সংবাদ এবং "ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের" বক্তৃতা এবং নানা প্রবন্ধ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। আমার স্মরণে আছে আমাদের শৈশবে অনুমান ৫/৬ বৎসর বয়সে তিনি একবার আমাদের ভাগলপুরের 'জ্বলাবাংলা' বাড়ীতে আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। তিনি উন্মুক্ত বারান্দায় একটি ক্যাম্পখাটে শুইয়া খাঁকের ও পালকের কলমে "মহিলা" পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ, মুসলমান শাস্ত্র প্রভৃতি অনুবাদ করিতেন...।"[৩৫]

'ধর্ম্মতত্ত্ব' (অক্টোবর ১৮৬৪–) নামক পত্রিকার সম্পাদনার কাজেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে স্থানীয় ধর্ম ও সামাজিক বিষয়েও আলোচনা হতো। গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের মহত্ত্ব, সারল্য ও সত্যবাদিতার জন্য ব্রাহ্ম, হিন্দু ও মুসলিম সকলের কাছেই তিনি শ্রদ্ধেয় ছিলেন। একদিকে তাঁর বৈরাগ্যপূর্ণ মানসিকতা, অন্যদিকে তাঁর দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও সততার নির্ভীক প্রকাশের মুখপত্র ছিল 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকা। বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

> "ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা, প্রতি পরিবারের সহিত যোগ রক্ষা, পারিবারিক জীবন গঠনে সহায়তা করা, ব্রাহ্ম মন্দিরে, আশ্রমে ও পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে উপাসনা, উৎসব অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা ও অংশগ্রহণ প্রভৃতিতে তাহারা নিত্য ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি আশ্রমে প্রাতঃকালে সংক্ষেপে ব্যাকুলতা ও ভাব ভরে যে উপাসনা করিতেন তাহা তরুণদিগেরও প্রাণ স্পর্শ করিত। প্রচারের জন্য শ্রী দরবারের বা প্রচারকগণের সভার নির্দেশ অনুসারে তিনি পাঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশে এবং উত্তর ভারত হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত প্রচার উপলক্ষে

গিয়াছিলেন। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকাও তাঁহার নিজস্ব পত্রিকা 'মহিলা'য় ঐ সকল প্রচার বৃত্তান্তের সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।"[৩৬]

ভারত আশ্রমে অবস্থানের কিছুদিন পর তিনি ঢাকাতে এসে অবস্থান করেছিলেন। ঢাকা নগরে অবস্থান কালে 'বঙ্গবন্ধু' (১৮৭০-১৮৭৭ খ্রি.) পত্রিকা সম্পাদনার ভার তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে আমরা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িকপত্র'-এ জানতে পারি-"গিরিশচন্দ্র বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকার প্রকাশনা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঢাকা ব্রাহ্মসামজের সঙ্গত সভা থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু' নামক পত্রিকার শেষ পর্যায়ে কিছুদিন সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন তিনি।"[৩৭] 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকাটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধাদি পত্রিকায় প্রচারিত হতো। এ পত্রিকার তখন সংকটাপন্ন অবস্থা ছিল। সে সময় তিনি তাঁর অন্যান্য কার্যের সঙ্গে 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকা সম্পাদনের ভার নিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্বভার পালন করে পত্রিকাটির উন্নতি সাধন করেছিলেন। তাঁর রচনার ভেতর আনুপূর্বিক বিবরণ দেয়ার একটি প্রচেষ্টা ছিল। যা সকল পাঠককে আকৃষ্ট করত। সেজন্য তাঁকে সকলে 'সত্যবাদী' গিরিশচন্দ্র বলে ডাকত।[৩৮]

সত্যবাদীতা আর ন্যায়নিষ্ঠতার কারণেই 'বঙ্গবন্ধু'র অধ্যক্ষ ও সম্পাদক কৈলাশচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে তাঁর মিলেনি। আদর্শের সাথে আপোষ করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে মতভেদ চরমে উঠেছিল এবং তিনি 'বঙ্গবন্ধু'র সম্পাদনায় ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এ সম্পর্কে তাঁর 'আত্ম-জীবন' এ বলেন-

> "ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় ও অপর কোন কোন বন্ধু তাহার পুষ্টিপোষক ছিলেন। রায় মহাশয়ের যত্ন ও উদ্যোগে এবং তাঁহার পরামর্শ মতে কৈলাশচন্দ্র বঙ্গবন্ধু সম্পাদনের ভার আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। কয়েকদিবস পরে কৈলাশচন্দ্র আমাকে না বলিয়া আমার অজ্ঞাতসারে বঙ্গবন্ধুর জন্য Manuscript লিখিয়া কম্পোজের জন্য কম্পোজিটারদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। আমি যথাসময়ে Manuscript প্রস্তুত করিয়া তৎসহ ছাপাখানায় যাইয়া দেখি যে, কৈলাশচন্দ্রের লিখিত প্রবন্ধাদি কম্পোজ হইতেছে। ইহাতে আমি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া যাই, এবং অবিলম্বে কলিকাতায় যাত্রা করিবার জন্য উদ্যোগী হই।"[৩৯]

স্বাধীনচেতা, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী গিরিশচন্দ্র সম্পাদনায় এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় কারো হস্তক্ষেপ মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি 'বঙ্গবন্ধু' সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন এবং ধর্ম সেবায় মগ্ন হয়েছিলেন।

ঙ. কোরআন অনুবাদে গিরিশচন্দ্রের সাফল্য

অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেন কোরআন বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে তৎকালীন মুসলিম বাঙালি সমাজের অন্তঃসারশূন্য কুসংস্কারাচ্ছন্নতার ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাঙালি মুসলিম সমাজে তখন আরবি ও ফারসি ভাষায় সুদক্ষ পণ্ডিত বা আলেমের অভাব ছিল এমন নয়। কিন্তু তাঁরা ছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধতায় অবরুদ্ধ। তাঁরা বাংলা ভাষাকে কাফেরের ভাষা মনে করতেন। আল্লাহর বাণী কোরআনের আয়াতকে কাফেরের ভাষায় অনুবাদ করাকে তাঁরা গর্হিত ও পাপ কাজ বলে বিবেচনা করতেন। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় কোরআন অনূদিত হলেও বাংলা ভাষায় তা উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছিল। অবশ্য কোনো কোনো মুসলিম লেখক তরজমা তাফসিরের কাজে হাত দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ১৮০০-১৮৮০ সময়কালের মধ্যে আমরা বেশ কয়েকজন অনুবাদকের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু সেগুলো পূর্ণাঙ্গ এবং গদ্যানুবাদ ছিল না। ছিল আংশিক এবং পদ্যানুবাদ। কাব্যিক ছন্দে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রচলিত রীতি মেনেই দোভাষী পুঁথির ভাষায় কোরআন অনুবাদ করেছিলেন। অবশ্য এর ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল মধ্যযুগেই। মধ্যযুগের প্রথম রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য সুরা ইউসুফের মা'নির অনুবাদ। তুলনার প্রাসঙ্গিকতায় আমরা সুরার ৩১ আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ এবং সগীরের সংশ্লিষ্ট কাব্যাংশ এখানে তুলে ধরছি–

তারপর সেই স্ত্রীলোকেরা ইউসুফকে দেখল, তখন ইউসুফের রূপ যৌবনের প্রতি এরূপ আসক্তি জাগল যে তারা অন্যমনস্কতাবশত ফল কাটতে গিয়ে নিজেদের হাত কেটে বসল এবং বলতে লাগল আল্লাহর ফেরেশতা।

শাহ মুহম্মদ সগীরের অনুবাদ হলো:

"দেখিলেন্ত পরতেখ কিবা এ স্বপন।
এক দৃষ্টে নেহালন্ত পাসরি আপন।।
হাতেত তুরঞ্জ ফল কাতি খরসান।
হস্তে সক্ষে ফল কাটে মনে নাহি জ্ঞান।।
কেহো ফল কাটিতে অঙ্গুলি কাটি নিল।
কিবা কর কিবা ফল এক ন জানিল।।
শোণিত পড়এ জেহ্ন ফল রসধার।
কামভাবে নেহালেন্ত মুখচন্দ্র তার।।
কর হোন্তে অবিরত পড়এ শোণিত।
তথাপিত নারী সবে চাহে এক চিত।।
স্তিরিগণে সবে বোলে এহি মনুষ্য মূরতি।
স্বর্গ মত্য পাতাল জিনিয়া রূপখ্যাতি।।"[৪০]

এছাড়া মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতান ও আবদুল হাকিমের কাব্যেও আমরা কোরআন অনুবাদ প্রসঙ্গ পাই। তাঁরা উভয়ই নিজ ভাষায় কোরআন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগে প্রাপ্ত সাহিত্যে সেই দুঃসাহসিক অগ্রযাত্রায় নির্ভীক সেনার অভাব একান্তই লক্ষণীয়। আধুনিককালের প্রারম্ভে সে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল এবং কেউ কেউ এগিয়ে এসেছিলেন বটে কিন্তু গতি ছিল একান্তই মন্থর। তাঁরা কেউই পূর্ণাঙ্গ কোরআন অনুবাদ করেননি, কেউ দু/একটি সূরা, কেউ সূরা ও আমছেপারা প্রভৃতি অনুবাদ করেছেন এবং তা ছিল কাব্যানুবাদ। ডঃ মুজীবর রহমান তাঁর 'বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা' গ্রন্থে সেসব অনুবাদকদের কালানুক্রমিক একটি বর্ণনা দিয়েছেন। আধুনিককালের প্রথম দশকে রংপুরের মটকপুর নিবাসী আমীরউদ্দীন বসুনীয়া সর্ব প্রথম কোরআনের অংশ বিশেষের সরাসরি তরজমা করেন। তিনি মুসলমানী বাংলা তথা পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় কোরআনের ত্রিশতম পারার বাংলা কাব্যানুবাদ করেছেন। আমীরউদ্দীন বসুনীয়া সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আমীরউদ্দীন বসুনীয়া রংপুরের অন্তর্গত গংগাচড়া থানাধীন চিনাখাল মকটপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গ্রামটি রংপুর শহরতলীর কোলকন্দ ও গংগাচড়ের পরে তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। গ্রামটি বর্তমানে বিলুপ্ত। তিস্তার সর্বগ্রাসী ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেছে। তাঁর বইটির প্রকাশকাল সম্পর্কে সঠিক কোনো সন তারিখ পাওয়া না গেলেও মুদ্রণ রীতির উপকরণের প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দিক বিবেচনা করে একে প্রাপ্ত কোরআন অনুবাদের মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থ বলে অভিমত দিয়েছেন ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান। তিনি বিভিন্ন সূত্রের উল্লেখ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আমীরউদ্দীন বসুনীয়াকৃত আমপারার কাব্যানুবাদের প্রকাশকাল ছিল ১৮০৮/৯ খ্রি.। এ কাব্যানুবাদের তিনটি কপি পাওয়া গিয়েছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদেশে এই কাব্যানুবাদের তিন তিনটে কপি মৌজুদ ছিল। প্রথম কপি শেখ ফজলল করীমের কাছে, দ্বিতীয় কপি আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদের কাছে আর তৃতীয় কপি সংরক্ষিত ছিল কলকাতার বংগীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে।"[৪১] ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান আমীরউদ্দীন বসুনীয়া সম্পর্কে যে তথ্য সূত্রের উল্লেখ করেছেন অনেক সন্ধান করেও সবকটির সন্ধান আমি পাইনি। শুধু মুনশী শ্রী আবদুল করিম সঙ্কলিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' গ্রন্থটি পেয়েছি। এ গ্রন্থের ৫০২ সংখ্যক পুঁথির বিবরণ থেকে আমরা 'আমছেপারা'র অনুবাদ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছি। তিনি বলেছেন,

> "সম্প্রতি আমি একখানি অতি প্রাচীন
> পাথরে ছাপা আরবী ও হস্তাক্ষরের মত
> বাঙ্গালা ছাপা "আমছেপারার" * কবিতার
> অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানি ডিমাই
> ১২ পেজি সাইজের ৬৮ পৃষ্ঠা। গ্রন্থ সম্পূর্ণ।
> কিন্তু অগ্র পশ্চাতে কোথাও গ্রন্থকারের
> নাম-ধাম, সন-তারিখ নাই। গ্রন্থখানি
> অতি মূল্যবান। আমি জানি না, এ গ্রন্থ

কোন্ অদ্ভুত প্রেসে মুদ্রিত! একই প্রেসে
বাঙ্গালা ও আরবী অক্ষরে এই প্রকার গ্রন্থ
ছাপা হওয়া প্রাচীন কালের পক্ষে বিচিত্র।
প্রত্যেক "আয়াতের" পৃথক অনুবাদ আছে।
গ্রন্থকার যে রংপুরবাসী কোন মহাজন,
তাহা সুনিশ্চয়। কারণ, গ্রন্থে এতৎ-প্রদেশ-
প্রচলিত অনেক শব্দ আছে।"[৪২]

শ্রী আবদুল করিম এই গ্রন্থকে "ইসলাম প্রচারকে" অবিকল প্রকাশ করতে মনস্থ করেছিলেন। তিনি 'আমছেপারা'র শুরু এবং শেষের কয়েকটি পঙক্তি তুলে ধরেছেন–

গ্রন্থারম্ভে;–
ছরু (সুরু) এই কেতাবের নামেতে আল্লার।
দয়াময় দয়ালু বহুত রহম জাহার।।
সকলি তারিফ আছে ওয়াস্তে আল্লার।
পালোনেওয়ালা সেই সারা সংসার।।
শেষ;–
আর যতো কাফের কহে তাহারা সবে।
হায় হায় মাটি হৈতাম হৈতো ভালো তবে।।
কঃ (?) মাটী রৈলে হেছাব কেতাব নাহি
দিতে হোতো।
আজ এতো দুস্কু তবে নাহি মিলিতো।।[৪৩]

পুঁথি আবিষ্কারকের মতে এ গ্রন্থের ছাপা বেশ পড়া যায়। তাঁর বিশ্বাস এদেশে বাংলা টাইপ প্রচলনের পূর্বে এ গ্রন্থ ছাপা হয়েছিল। বাংলায় প্রথম একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা উইলকিন্স। ১৭৭৮ সালে এটি হুগলি জেলার চিনসুরাতে স্থাপিত হয়েছিল। উইলকিন্স যে টাইপ নির্মাণ করেছিলেন তাকে আরো মার্জিত করে উন্নতমানের টাইপ নির্মাণ করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকার।[৪৪] আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের ধারণানুযায়ী পুঁথিটি যদি বাংলা টাইপ প্রচলনের পূর্বে ছাপা হয় তাহলে এর প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সঙ্কলিত এবং আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি পরিচিতি' গ্রন্থের ক্রমিক ৮৭।। পুঁথি ৫৯২ তে 'কোরান পাঠের ফল' নামক পুঁথির উল্লেখ পাওয়া যায়। রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি।

তবে পুস্তিকার মোট পত্র সংখ্যা ৮। $৭\frac{১}{২}$" × ৬" পরিমিত কাগজে লিখিত। এতে কোন ভণিতা নেই। এ গ্রন্থটি ১২৫ বছরের প্রাচীন বলে তাঁরা মনে করেছেন।

গ্রন্থটির আরম্ভ–

বিসমিল্লাহ... ...

ছুরা আম্মাহ পড়িলে যেই ফল তার হএ।
একে একে সেই কথা কহিমু নিশ্চয়।।
একবার সেই সুরা পড়ে যেই জন।
তার শরীল অরোগী করিব নিরঞ্জন।।
তিনবার সেই ছুরা পড়িব নিশ্চয়।
তার আঁখি বহুত হইব জ্যোতির্ম্ময়।।

শেষ–

ছুরা কোলাউজু রেবব্বিল নাসে সাত বার পড়িব।
আর বন্দা এই বন্দা পড়িয়া ফুক দিব।।
তবে তার দুঃখ জান হইব নিবন্ধন।
যে আজ্ঞা করিছে জান প্রভু নিরঞ্জন।।

তামাম সোদ[৪৫]

কোলকাতার মির্জাপুরের পাটোয়ার বাগানের অধিবাসী গোলাম আকবর আলীর একখানি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। তিনি দোভাষী পুঁথির ভাষায় কোরআনের 'আম' নামক পারা ও সূরা 'ফাতিহার' একটি অনুবাদ করেছেন। আকবর আলীর 'তরজমা আমছেপারা' নামক পুস্তকটির সংগ্রাহক হলেন খুলনা জেলার বহিরদিয়া গ্রামের অধিবাসী আবদুল্লা খাঁ। তিনি ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড-এ অধ্যাপক আলি আহমদ এর তত্ত্বাবধানে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহের কাজ করতেন। সৌভাগ্যবশত ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। আলী আহমদ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'আরাফাত' পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রহমানের সঙ্গে এ পুঁথিটি নিয়ে আলোচনা করেন। আবদুর রহমান প্রথমে তাঁরই পত্রিকায় 'আমপারার প্রাচীনতম তরজমা' শিরোনামে পুঁথিটির পরিচিতি তুলে ধরেন। এরপর তিনি কাব্যানুবাদটি মাসিক 'তরজুমানুল হাদীস' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। পুঁথিটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায়নি। শেষের দিকে প্রায় অর্ধেক পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেছে। মোট ৬৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ রূপে সংগৃহীত হয়েছে। ছিঁড়ে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলো বাদে 'সূরা ফাতিহা' থেকে 'সূরা ফজর' পর্যন্ত পাওয়া গেছে। ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বর আবদুর রহমান পুঁথিটির পুনর্মুদ্রণ করে প্রকাশ করেন। এতে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের দুই পৃষ্ঠার ভূমিকা সংযোজিত হয়। এ পুঁথি পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ছাপার অস্পষ্টতা এবং ভুলকে অনুসৃত বানানের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি রেখে সংশোধন করা হয়েছে।[৪৬] আলোচ্য পুস্তকের আমপারাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেলেও এর আখ্যাপত্রটি যথাযথ ছিল। আখ্যাপত্র

থেকে আমরা অনুবাদকের নাম ধাম এবং প্রকাশের তারিখ সম্পর্কে সম্যক পরিচয় পেয়েছি– "শ্রী শ্রী হাক নাম"

।।এই কেতাবের নাম।।

।। তরজমা আম ছেপারা।।

।।বাংগালা।।

।। আধিন শ্রী গোলাম আকবর আলী।।

।। সাকিন ম্রেজাপুর মহাল্লা পাটওয়া।।

।। -বের বাগান। লোকের খাহেস।।

।। দেখিয়া বহুত কোসেসে সহি।।

।। করিয়া হাজি ছৈয়দ আবদুল।।

।। মরহুমা ছাহেবের আহমদি।।

।। ছাপাখানায় শ্রীযুত মৌলবি।।

।। আসগর হোছেন সাহেবের ।।

।। দ্বারায় ছাপাইলাম ।।

আকবর আলী

।।এই কেতাব কেহ আমার বিনে।।

।। হুকুমে ছাপিবে নাই।।

।। সন ১২৭৫ ।। [৪৭]

গোলাম আকবর আলীর সমসাময়িক আরেকজন অনুবাদক ছিলেন মীর ওয়ালিদ আলী। তাঁর গ্রন্থের নাম 'কোরআন কালামুল্লাহ ও খাওয়াসসুল কোরআন'। এরপর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে নাসিরউদ্দীস আহমদ এর 'নিয়ামা-ই-খুদা' এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কারী নাসিরউদ্দীন ও মাওলানা মুহাম্মদ হাযিক ওরফে সাদিক আলী রচিত 'যীনাতুল কারী' নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কোরআনের আংশিক তরজমা করেন। তাঁর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের বিখ্যাত অনুবাদ প্রকাশের মাত্র তিন বছর আগে।[৪৮] গিরিশচন্দ্রের আগে কোরআন অনুবাদের ধারাবাহিকতা থাকলেও তা ছিল তমসাচ্ছন্ন রাতে দূর গগনের ক্ষীণ নক্ষত্রের মতো। গিরিশচন্দ্র সেনই প্রথম অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে কোরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করেছেন। এ অভূতপূর্ব সাফল্যের একাগ্রতায় ইসলামী চেতনার রুদ্ধ দ্বার বাংলার মুসলমানের জন্য অবারিত হয়েছিল। "পবিত্র কোরআন এর বাংলা অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮১ সালে। কোনো বাঙালি মুসলমান নন, একজন বাঙালি ব্রাহ্ম হিন্দু বাংলা-ভাষাভাষীর কাছে প্রথম পবিত্র কোরআনের মূল অর্থ ও তাৎপর্য চলার পথকে সহজ করে দিয়েছিলেন। বাঙালি মুসলমান আলেমদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলানা আকরাম খাঁ গিরিশ সেনকে সেজন্য সাধুবাদ জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন। এরপর থেকে

বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআনের যতগুলো অনুবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে, গিরিশ সেনের অনুবাদখানিই এখন পর্যন্ত মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।"[৪৯]

গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর তেজোদ্দীপ্ত কর্মোদ্দীপনায় কোরআন অনুবাদে বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছেন। আর এ দুঃসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের অবিচল ধর্মনিষ্ঠা ও নমনীয় গুরু ভক্তির কারণে। কেশবচন্দ্র ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নববিধান ঘোষণা করেছিলেন। এ সময় হতে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' 'নববিধান সমাজ' নামে পরিচিত হতে থাকে। 'নববিধান' শব্দটির অর্থ হলো সর্বধর্ম সমন্বয় বা সমন্বয়মার্গ। সর্বধর্ম সমন্বয়ের ধারণাটি রামমোহনের চিন্তা প্রসূত ধারাবাহিকতারই রূপ। একেশ্বরবাদে গভীর আস্থা রেখে বিশ্বমানবতার মহাসম্মিলনের উদাত্ত বাণী প্রচার করা ব্রাহ্মধর্মের মর্মকথা। উপনিষদ, বাইবেল ও কোরানের মূল তত্ত্বানুযায়ী ঈশ্বর নিরাকার, এক ও অভিন্ন। এ মূল সত্য থেকে দূরে সরে গিয়ে মানুষ ধর্ম সম্পর্কীয় সাম্প্রদায়িক কলহ বিবাদে লিপ্ত। ধর্মীয় বিভাজনই মানুষকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। 'নববিধান সমাজে' এসে কেশবচন্দ্র সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে এ বিবাদ বিভাজনকে অপনোদন করতে চেয়েছিলেন। আর এ প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য অন্যতম চারটি ধর্মের মূল বিষয়বস্তু ভাষান্তরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন চার ব্রাহ্মভাইকে। গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দুধর্ম, অঘোরনাথ গুপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রিস্টান ধর্ম আর গিরিশ সেন ইসলাম ধর্মের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[৫০]

কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেন নিজেকে এত বড় দায়িত্বের অনুপযুক্ত ভেবেছিলেন। তাঁর মতে তিনি 'অবিদ্বান ও নানা প্রকারে অযোগ্য'। এছাড়া মোহাম্মদ প্রবর্তিত ধর্মীয় মূল ভাব ও শাস্ত্র অনুবাদ করতে হলে আরবি জানা আবশ্যক। শৈশবে ও কৈশোরে ফারসি চর্চার পাশাপাশি তিনি যৎসামান্য আরবি শিক্ষা অর্জন করেছিলেন বটে কিন্তু সে জ্ঞানে ইসলাম শাস্ত্র– বিশেষ করে কোরআন অনুবাদ করা অসম্ভব। তিনি নিজেই আরবি সম্বন্ধীয় অর্জিত সামান্য বিদ্যাকে 'প্রল্লবগ্রাহিনী' বিদ্যা বলেছেন। তার উপরে তাঁর বয়স ছিল বিয়াল্লিশ। একটি নতুন ভাষায় অধিজ্ঞান অর্জন করে মোহাম্মদীয় শাস্ত্রের অনুবাদ করা বয়সের পক্ষেও অনুকূল ছিল না। কিন্তু বিধানাচার্য ব্রহ্ম মন্দিরের পবিত্র বেদী হতে তাঁকেই মোহাম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ঘোষণা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এতে বিস্মিত হয়েছিলেন। অপরাপর সকলেই তাঁর মতো বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র ছিলেন অনড়। গিরিশচন্দ্রের অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার ওপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস ও গভীর আস্থা। কর্ম তৎপরতা এবং একাগ্রতা দিয়ে গিরিশচন্দ্র অসাধ্যকে সাধন করবেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে তিনি এমন এক শক্তির স্বরূপ দেখেছিলেন যা তাঁকে অভিভূত করত। ব্রহ্মানন্দের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় গিরিশচন্দ্র তাঁর ভেতরের সুপ্ত আত্মশক্তিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। গভীর এক আত্মবিশ্বাসে তিনি ইসলাম শাস্ত্র অনুবাদের মতো দুরূহ কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

মুসলিম জাতির মূল ধর্মশাস্ত্র কোরআন পাঠ করে ইসলাম ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য ১৮৭৬ সালে তিনি লক্ষ্মৌ নগরে আরবি ভাষা চর্চা করতে গিয়েছিলেন। লক্ষ্মৌ ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে তাঁকে সর্বাত্মক সাহায্য

করেছিল। মৌলবী সাহেবের বেতন এবং তাঁর অবস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা ব্রাহ্মসমাজ করেছিল। তিনি প্রায় এক বছর সেখানে শিবকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়িতে অবস্থান করে সুবিজ্ঞ বৃদ্ধ মৌলবী এহসান আলি সাহেবের কাছে আরবি ব্যাকরণ ও পারস্য দেওয়ান হাফিজের চর্চা করেছিলেন। মৌলবী সাহেব প্রতিদিন সকালে এসে তাঁকে পড়িয়ে যেতেন। মৌলবীর বয়স তখন ৭৫ বছর ছিল। প্রতিদিন তিনি তিন চার ক্রোশ পথ ভ্রমণ করে পল্লিতে পল্লিতে গিয়ে অধ্যাপনার কাজ করতেন। কথিত ছিল মৌলবী সাহেব খাদ্যবিলাসী ছিলেন। বিশালকায় অত্যন্ত ধার্মিক মৌলবী সাহেব গিরিশচন্দ্রকে বড় ভালবাসতেন। তিনি দেওয়ান হাফেজের গজলের ভীষণ ভক্ত ছিলেন। বিশেষ বিশেষ গজল পড়ার সময় তিনি ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। গিরিশচন্দ্র লক্ষ্ণৌনগরে তাঁর কাছে প্রতিদিন আরবি চর্চা করতেন এবং গজল শুনতেন। তবে সপ্তাহান্তে তিনি সামাজিক উপাসনার কাজও করতেন।

লক্ষ্ণৌনগরে গিরিশচন্দ্র আরবি ব্যাকরণের সামান্য চর্চা করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর কলকাতাতেই অল্প কিছুদিন একজন মৌলবী সাহেবের নিকট আরবি শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে ঢাকায় অবস্থানকালে নলগোনা পল্লিতে মৌলবী আলিমোদ্দিন সাহেবের বাড়িতে প্রতিদিন গিয়ে তাঁর কাছে আরবি ভাষার ইতিহাস ও সাহিত্যের কিছু কিছু আলোচনা শুনতেন। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি কোরআন অনুবাদে উপযুক্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু কোরআন অনুবাদের কাজে অগ্রসর হতে গিয়ে গিরিশচন্দ্রকে বেশ কিছু বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। হিন্দু বলে কোন বিক্রেতাই তাঁর কাছে কোরআন বিক্রিতে রাজি ছিলেন না। কোরআন বিক্রি তো দূরের কথা তাঁকে কোরআন স্পর্শ করতেও দিত না। কোরআন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। তাঁদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী পাক-পবিত্র অবস্থায় অজু করে কোরআন স্পর্শ করতে হয়। বিধর্মীদের কোরআন স্পর্শ মুসলিম সমাজে পাপ কাজ বলে গণ্য হতো। স্বাভাবিক কারণেই মুসলমান বিক্রেতা বিধর্মীর কাছে কোরআন বিক্রি করে পাপের ভাগিদার হতে নারাজ ছিলেন। অবশেষে কোনো উপায়ান্তর না দেখে ঢাকা নিবাসী সমবিশ্বাসী বন্ধু মিয়া জালালুদ্দিনের সাহায্যে একটি কোরআন ক্রয় করেছিলেন। জালালুদ্দিন মুসলমান কিন্তু তিনি গোপনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধর্মান্তরের কাহিনি তখনও মুসলিম সমাজে প্রচার হয়নি। জালালুদ্দিনের মাধ্যমে কোরআন ক্রয় করে তিনি তফসির ও অনুবাদের সাহায্যে পড়তে শুরু করেছেন। গিরিশচন্দ্র লেখেন, "যখন আমি তফসিরাদির সাহায্যে আয়াত সকলের প্রকৃত অর্থ কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম, তখন তাহা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"[৫১] ১৮৮১ সালের শেষের দিকে নববিধান ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্রকে আবার ময়মনসিংহে অবস্থান করতে হয়। সেখানে থাকা অবস্থায় কোরআন শরীফ অল্প অল্প অনুবাদ করে প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করতে থাকেন। শেরপুরের চারুযন্ত্রে প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়, পরে কোলকাতায় এসে খণ্ডাকারে প্রতিমাসে বিধানযন্ত্র থেকে মুদ্রিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় কোরআন সম্পূর্ণ অনুবাদিত ও মুদ্রিত হতে সময় লাগে দুই বছর। পরিশেষে সব খণ্ড একসাথে বেঁধে নেওয়া হয়। "প্রথমবারে সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হইলে পরে ১৭৯৮ সালে কলিকাতা দেবযন্ত্রে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় বারে সহস্র পুস্তকও নিঃশোষিত প্রায়। এক্ষণ সংশোধিত আকারে তাহার তৃতীয় সংস্করণের উদ্যোগ হইতেছে।"[৫২]

কেশবচন্দ্র সেন গিরিশচন্দ্রের কোরআন এর সম্পূর্ণ অনুবাদ দেখে যেতে পারেননি। কোরআনের বঙ্গানুবাদ খণ্ডাকারে প্রথমে দুই তিন খণ্ড প্রকাশিত হলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। কেউ অনুবাদের বিপক্ষে কিছু বললে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হতেন এবং প্রতিবাদ করতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁর কোরআন অনুবাদের অন্যতম উৎসাহদাতা, তাঁর আত্মার পরমাত্মীয় ব্রহ্মানন্দের হাতে কোরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদ তুলে দিতে পারেননি। ব্রহ্মানন্দের প্রতি তাঁর অশেষ ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং গভীর আনুগত্যের কারণেই কেশবচন্দ্রের হাতে কোরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদ তুলে দিতে না পারার ব্যর্থতাবোধ থেকে গিরিশচন্দ্রের মনে এক গভীর আক্ষেপের জন্ম নিয়েছিল। যা পরবর্তী সময়েও তাঁর মনে দীর্ঘশ্বাস ও অনুতাপের সৃষ্টি করেছিল। গিরিশচন্দ্র 'অনুবাদকের বক্তব্যে' যে অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছিলেন তাতে সে দীর্ঘশ্বাসই অণুরণিত হয়েছিল–

> "আজ কোরআনের অনুবাদ সমাপ্ত দেখিয়া আমার মনে যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত। হর্ষ এই যে, এতকালের পরিশ্রম সার্থক হইল। বিষাদ এই যে, ইহার প্রথমাংশ শ্রীমদাচার্য কেশবচন্দ্র সেনের করকমলে অর্পণ করিয়াছিলাম; তিনি তাহা পাইয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছিলেন ও তাহার সমাপ্তি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; শেষাংশ আর তাঁহার চক্ষুর গোচর করিতে পারিলাম না। আল্লাহ তাঁহাকে আমাদের চক্ষুর অগোচর করিল। তিনি এই অনুবাদের এরূপ পক্ষপাতী ছিলেন যে, তাহার নিন্দা কেহ করিলে সহ্য করিতে পারিতেন না। আজ অনুবাদ সমাপ্ত দেখিলে তাঁহার কত না আহ্লাদ হইত, দাসও তাঁহার কত আর্শীবাদ লাভ করিত।"[৫৩]

গিরিশচন্দ্রের ওপর ইসলাম ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক দায়িত্ব অর্পণ করে কেশবচন্দ্র কতটা সন্তুষ্ট ও আহ্লাদিত হয়েছিলেন এবং গিরিশচন্দ্রের ওপর তাঁর প্রভাব কতটা পড়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'আত্ম-জীবন' বর্ণনায়-

> "কমলকুটীরে নাট্যমঞ্চে বনবৃন্দাবন নাটকের অভিনয়ে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মিলন সূচক tableau (দৃশ্যাভিনয়) হইয়াছিল। তখন কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত, কোন বন্ধু ইহুদী, কোন বন্ধু খ্রীষ্টবাদী, কেহ বা বৌদ্ধ, কেহ বা শিখ সাজিয়া এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আমাকে ইজার চাপকান পরিধান ও মস্তকে টুপী ধারণ এবং মুখমণ্ডলে কৃত্রিম শ্মশ্রুর সংযোজন করিয়া মৌলভী সাজিয়া এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে আচার্য ঈষৎ হাস্য করিয়া অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়াছিলেন। আমার সেই সাজ তাঁহার যে মনোমত হইয়াছিল, এরূপ বোঝা গিয়াছিল। এই প্রকার উৎসাহদানে তিনি যেন গর্দ্দভ পিটিয়া আমাকে মানুষ করিয়াছেন। যদি এই অযোগ্য ভৃত্য দ্বারা বিধানরাজ্যে কিছু সেবা হইয়া থাকে, তবে তাহার মূলে ঈশ্বরের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ এবং তাঁহার ভক্তের অনুগ্রহ ও আনুকূল্য, অন্য কিছুই দেখিতে হইবে না।"[৫৪]

কেশবচন্দ্রের উৎসাহ ও আশীর্বাদ গিরিশচন্দ্রের চিরদিনের পাথেয়। কেশবচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে নিরলস পরিশ্রম করে গিরিশচন্দ্র কোরআন অনুবাদে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছেন। কিছু অনুযোগ অভিযোগ তাঁর অনুবাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বটে কিন্তু তাঁর অনুবাদ পাঠে বোদ্ধা পাঠককে মনে রাখতে হবে একজন হিন্দু ব্রাহ্মের পক্ষে সম্পূর্ণ একটি নতুন ভাষা আয়ত্ত করা সহজ সাধ্য বিষয় ছিল না। আর মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে সবচেয়ে প্রাচীন ও কঠিনতম ব্যাকরণ সমৃদ্ধ জটিল ভাষায় রচিত কোরআন অনুবাদ একটি দুরূহ কর্ম ছিল। তার ওপর সে অনুবাদের কোনো মডেল তাঁর সামনে ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও একজন শিক্ষানবীশ অনুবাদকের নিরলস সাধনা ও অধ্যবসায়, একাগ্র কর্মতৎপরতা, ঐকান্তিক নিবিষ্টতা সব মিলিয়ে কোরআন অনুবাদের যে পথ তিনি উন্মুক্ত করে গেছেন তা-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ অর্জন। ড. সফিউদ্দিন আহমদ তাঁর অনুবাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বলেন, "ভাই গিরিশ সেনের কোরআনের অনুবাদ শুধু শ্রেষ্ঠ নয়- এ এক মহোত্তম ও অবিস্মরণীয় কর্ম। এই অনুবাদ কর্মে তাঁর শ্রম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ এবং আন্তরিকতা ছিল বিস্ময়কর। বলা যায় ব্রাহ্ম গিরিশচন্দ্র সেন কোরানের অনুবাদক গিরিশ সেনের আড়ালে নিস্প্রভ হয়ে পড়েছেন।"[৫৫] বস্তুত গিরিশচন্দ্র অনুবাদের ভাষাকে কষ্ট-ক্লিষ্ট, জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলেননি। কোরআনের মূল আয়াত যাতে অবিকল অনুবাদ হয় তিনি সে বিষয়ে যত্নবান থেকেছেন এবং বাংলা ভাষার লালিত্য পূর্ণ মাধুর্য সৃষ্টিতে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। সাহিত্যের শৈল্পিক অভিপ্রায়ে নয়, মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে অত্যন্ত সততার সঙ্গে তিনি কোরআন অনুবাদ করেছেন। বাংলা ভাষায় বাংলার জনগণের কাছে মুসলিম ধর্মীয় শাস্ত্রের মর্মবাণী পৌঁছে দেয়াই ছিল তাঁর কোরআন অনুবাদের অভিপ্রায়। গিরিশচন্দ্র তাঁর কোরআন বঙ্গানুবাদের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেন,

> "পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য ভাষায় বাইবেল পুস্তক অনুবাদিত হইয়া সর্বত্র সকল জাতির মধ্যে প্রচার হওয়ায় সাধারণের পক্ষে তাহা যাহার পর নাই সুলভ হইয়াছে। তজ্জন্যই দেবাত্মা ঈসার দেবচরিত্র ও তাঁহার স্বর্গীয় জীবন-প্রদ উপদেশ সকল বাইবেলে সহজে পাঠ করিতে নানা দেশের নানা জাতীয় অগণ্য লোক আলোক ও জীবন লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিধানমণ্ডলীভুক্ত ভূমণ্ডলের একটি প্রধান ও পরাক্রান্ত জাতি মুসলমান, তাঁহাদের মূল বিধান-পুস্তক কোরআন শরীফ শুদ্ধ তাঁহাদের মধ্যেই দুরূহ আরব্য ভাষারূপ দুর্ভেদ্য দুর্গের ভেতরে বদ্ধ রহিয়াছে। অন্য জাতির নিকট মুসলমানেরা কোরআন বিক্রয় পর্যন্ত করেন না, অপর লোক তাহা পড়িবে দূরে থাকুক স্পর্শ করিতেও পায় না। অন্য জাতির মধ্যে আরব্য ভাষার চর্চাও বিরল। কেহ কোরআন হস্তগত করিতে পারিলেও ভাষাজ্ঞানের অভাবে তাহার মর্ম কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ইহা কতিপয় মুসলমান মৌলভীর একচেটিয়া সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। মৌলভী শাহ রফিয়োদ্দিন উর্দু ভাষায় শাহঅলী উল্লাহ ফতেহোর রহমান নামে পারস্য ভাষায় কোরআনের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু তাহা মূল পুস্তকের সঙ্গে একত্র সংবদ্ধ আছে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পাওয়া যায় না। সেই অনুবাদিত পুস্তকদ্বয় সুপ্রাপ্য হইলেও উর্দু ও পারস্য ভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা অন্ধজনের পক্ষে দর্পণের ন্যায় নিষ্ফল। ইংরেজী ভাষায় কোরআনের অনুবাদ প্রচার

হইয়াছে সত্য কিন্তু এদেশে তা সচরাচর প্রাপ্য নহে। অপিচ যাহারা ইংরেজী জানেন না তাঁহাদের পক্ষে উহা প্রাপ্য হওয়া না হওয়া তুল্য। আমি আরব্য ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক বন্ধু বঙ্গভাষায় মূল কোরআন অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে আমি কোন কোন মোসলমান বন্ধু কর্তৃকও বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হই। কোরআন অধ্যয়ন ও তাহা অনুবাদ করাই আরব্য-ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ার আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বন্ধুদিগের আগ্রহে ও কর্তব্যানুরোধে আল্লাহর কৃপায় আমি এক্ষণ কোরআন বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকটন করিয়াছি।"[৫৬]

গিরিশচন্দ্র অনুবাদিত কোরআন মুসলিম সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর এ অনন্য কর্মের জন্য মুসলিম সমাজের একাংশ যেমন বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন বিজ্ঞজন তেমনি তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। অবশ্য গিরিশচন্দ্র তাঁর অনুবাদের প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকালে সংশয়ে অনুবাদকের নাম উল্লেখ করেননি। উভয় খণ্ডের ভূমিকার শেষে অনুবাদকস্য লেখা ছিল। তবে প্রথম খণ্ডের প্রকাশকের নাম পাওয়া যায় গিরিশচন্দ্র সেন আর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকের নাম পাওয়া যায় গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী। ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিস্থিতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশংকা তাঁর ছিল। বাস্তবে তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিছু গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলমান হিন্দু ব্রাহ্মের এ প্রয়াসকে সুনজরে দেখেননি। তাঁরা নানা ভুল ত্রুটির উল্লেখ করে তাঁকে বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত করেছিলেন। এরকম দুরূহ একটি কর্মের প্রথম প্রয়াসে সামান্য ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবুও গিরিশচন্দ্র অতি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর অক্ষমতা ও ভুল ভ্রান্তির কথা স্বীকার করেছিলেন– "একে আমার অল্পবিদ্যা ও নানা প্রকার অযোগ্যতা, তাহাতে অন্য কার্যের সঙ্গে অনুবাদ, ...সংশোধন ও ভাষা প্রচার এবং পত্রাদি লিখিয়া মূল্য সংগ্রহাদি করা সমুদয় কার্য একা আমাকে করিতে হইয়াছে, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। আমি প্রথমত অনুবাদ করিয়া এবার পাঠ না করিয়া ও মূল গ্রন্থের সঙ্গে না মিলাইয়াই তাহা মুদ্রিত করিয়াছি। তাহাতে অসাবধানতাবশতঃ একটি আয়াত ও কতিপয় আয়াতাংশ পতন হইয়াছে ও কোথাও অনুবাদ যথাযথ হয় নাই, তাহা কতক শুদ্ধি পত্রে সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল। এতদ্ভিন্ন সামান্য ভুল কিছু কিছু থাকিতে পারে। বকার সূরার প্রথমাংশেই ভ্রম প্রমাদ কিছু অধিক হইয়াছে। পরে সাবধান হওয়া গিয়াছে।"[৫৭] তাঁর অনূদিত কোরআনের চাহিদা ছিল বিপুল। অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রথম সংস্করণের এক হাজার কপি শেষ হয়ে যায়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সংস্করণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে গিরিশচন্দ্র কোলকাতার দেবযন্ত্র থেকে একটি বিজ্ঞাপনসহ নতুন কলেবরে দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশ করেন। এ সংস্করণটি ১৮৮৯-১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রায় তিন বছরে মুদ্রিত হয়েছিল। এটিও অতি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর ১৯০৬-১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার মঙ্গলগঞ্জ প্রেস থেকে তৃতীয় সংস্করণ লেখক কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এরপর সামাজিক ও ধর্মীয় বৈরিতার কারণে দীর্ঘদিন গিরিশ অনূদিত কোরআনের ছাপা বন্ধ ছিল। দীর্ঘ ২৮ বছর পর আবার ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে চতুর্থ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হয়েছিল নববিধান পাবলিকেশন কমিটির উদ্যোগে কলকাতা আর্ট প্রেস থেকে।

চতুর্থ সংস্করণে ‘কোরান শরীফ’ বানান সংশোধিত হয়ে ‘কোরআন শরীফ’ হয়। এ সংস্করণের ভূমিকায় মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁসহ বেশ কয়েকজনের মন্তব্যও ছাপা হয়।

মানবতার সমুন্নত চেতনায় সর্বধর্মের সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র ছিলেন নির্ভীক পথিকৃত। বাঙালি সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি দিতে পিছুপা হননি। তাঁরা তাঁকে ‘ভাই’ ও ‘মওলানা’ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। বাংলা ভাষায় কোরআন অনূদিত হওয়ার পর পরই কলকাতার তৎকালীন বিখ্যাত আলিয়া মাদ্রাসা গিরিশচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করে। পরে আলিয়া মাদ্রাসা তাঁকে বিরাট সংবর্ধনা দেয় এবং উক্ত সংবর্ধনায় মুসলিম শাস্ত্র চর্চায় অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে ‘মওলানা’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৫৮] অবশ্য তাঁর প্রাপ্ত ‘মওলানা’ উপাধি সম্পর্কে একটু ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন ড. সফিউদ্দিন আহমদ। তাঁর মতে, “আবুল মুযাফফর আবদুল্লাহ সাহেব ১২৮৮ সালের ৬ ফাল্গুনে এবং জনাব আলীম উদ্দীন আহমদ সাহেব ১২৮৮ সালের ১০ ফাল্গুনে ভাই গিরিশচন্দ্রকে এই অনুবাদ উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে ঢাকা থেকে পত্র লিখেন। তাঁরা এই পত্রের মাধ্যমে গিরিশ বাবুকে ‘মওলানা’ খেতাবে ভূষিত করেন।”[৫৯] গিরিশচন্দ্র সর্বাধিক সমাদৃত ছিলেন ‘ভাই’ উপাধিতে। তাঁর গ্রন্থের লেখক অভিধাতেও ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পাওয়া যায়। কিন্তু এই ‘ভাই’ উপাধি কীভাবে এলো সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ধর্ম বিষয়ে গভীর আগ্রহ, চারিত্রিক উদারতা এবং সত্যবাদিতার জন্য গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্ম-হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান সকলের কাছে ছিলেন প্রিয়। সর্বধর্ম সমন্বয়ের সাধক ছিলেন বলেই সকলের কাছে তিনি ‘ভাই গিরিশচন্দ্র’ নামে পরিচিত হয়ে উঠেন।[৬০] গিরিশচন্দ্র সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ‘মওলানা,’ ‘ভাই’ যে উপাধিতেই ভূষিত হোন তা ছিল তাঁর অনন্য কর্মের প্রাপ্য স্বীকৃতি। একজন ভিন্নধর্মাবলম্বী হয়েও কোরআনের মতো প্রাচীন কঠিন আরবি ভাষা আত্মস্থ করা এবং আত্তীকরণ করে তা অনুবাদ করা মোটেই সহজ সাধ্য বিষয় ছিল না। সুতরাং কোরআন অনুবাদে তাঁর সাফল্যই সর্বাধিক আর ব্যর্থতা নির্ণয় করার প্রচেষ্টা আমাদের দীনতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

চ. কোরআন অনুবাদে সমকালীন প্রতিক্রিয়া

গিরিশচন্দ্র যখন কোরআন অনুবাদ শুরু করেন তখন থেকেই তিনি ক্রমশ খণ্ডাকারে প্রকাশ করতে লাগলেন। কোরআন অনুবাদ খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশিত হলে কিছু গোঁড়া মুসলমান এর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেন। একজন তো গিরিশচন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করে লেখেন-"আমাদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ একজন কাফের করিয়াছে, তাঁহাকে পাইলে তাহার শিরশ্ছেদন করিব।"[৬১] এ উক্তি ছিল একজন ক্রোধান্ধ পরধর্ম বিদ্বেষী হীনমন্য ব্যক্তির। তিনি বৃহত্তর মুসলিম সমাজের মহত্ত, ঔদার্য ও বন্ধু ভাবাপন্ন মানসিকতা বিচ্যুত উগ্র মৌলবাদীদেরই একজন। কোরআন বঙ্গানুবাদের একটি মহৎ প্রয়াসকে তিনি আত্মস্বার্থের হীন প্ররোচনায় খণ্ডিত করেছিলেন। যে মুসলিম সমাজের বই বিক্রেতা তাঁকে কোরআন ও হাদিসের বই স্পর্শ করতে দেয়নি, দূর হতে কিতাবটি প্রদর্শন করেছিলেন মাত্র, সেই রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ সহজে একজন হিন্দু ব্রাহ্মের অনুবাদ কর্মকে গ্রহণ করবে না এটাই তো চরম বাস্তবতা। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর শিরশ্ছেদ করার হুমকি সেই প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছ থেকে আসবে এ আর আশ্চর্যের কী! তৎকালীন কোরবান আলী রচিত 'শান্তিকর্তা হযরত মোহাম্মদ' গ্রন্থটি মুসলমানদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ও সর্বজন পঠিত গ্রন্থ ছিল। তিনি এই গ্রন্থে গিরিশচন্দ্র অনূদিত কোরআন সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "বাঙ্গালা দেশে হিন্দু অপেক্ষা মোসলমানের সংখ্যা অল্প না হইলেও বিদ্যাশিক্ষায় ও সাহিত্যালোচনায় বহু পশ্চাতে পতিত বলিয়া আমাদিগের মহাপুরুষ, যদুপ্রবর্তক হযরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রথম জীবনী রচয়িতা – একজন হিন্দু বাঙ্গালী। তিনি আমাদের ধর্ম্মবৃত্তান্ত অবগত বলিয়াই, তদ্রচিত হযরত চরিতে আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার কোন কিছুই নাই।"[৬২]একজন ভিন্নধর্মাবলম্বী একনিষ্ঠ ব্রাহ্মের কাছে অন্য ধর্ম শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন কতটা ধ্যানলব্ধ অধ্যবসায়ের ফসল তা হয়তো তিনি সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারেননি। তৎকালীন সময়ে 'আহলে হাদিস' পত্রিকাটি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এ পত্রিকায় মওলানা মুহম্মদ ইসরাইল গিরিশ অনূদিত কোরআনের নানা অসঙ্গতি ও তথ্যগত এবং পারিপার্শ্বিক চেতনার ভুল দেখিয়ে 'গিরিশ বাবুর বঙ্গানুবাদে ভ্রম' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন–

> "মৃত গিরীশবাবু কর্তৃক অনুবাদিত এক খণ্ড বঙ্গানুবাদ প্রাপ্ত ও আনন্দিত হইয়া মনে মনে বলিলাম আহা। ইহা কি এক অভিনব সম্পদ ও স্বর্গীয় অবদান পাইলাম। অনুবাদক মহাশয় একজন অমুসলমান হইয়া যে এই বৃহৎ কার্য করিয়াছেন তাহাতে বাংলার মুসলিম সমাজ চিরকালের তরে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, গ্রন্থখানির কতিপয় পৃষ্ঠা পাঠান্তে আমার অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা অভক্তি ও ঘৃণার সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি একস্থানে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম নবী (সাঃ) সম্বন্ধে একরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা তাঁহার সম্মানের হানিজনক হয়। অন্যত্র স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল (আঃ) ও শয়তানের আকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বও তিনি অস্বীকার ও অমান্য করিয়াছেন, অনেক স্থানে অনুবাদে ভুল-ভ্রান্তিও করিয়াছেন।"[৬৩]

তবে মুসলিম সমাজের একটি বৃহত্তর অংশ তাঁর এ মহতী কর্মপ্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের এ যুগোত্তীর্ণ কর্মে কতটা গভীর তপস্যা, কতটা গভীর অধ্যবসায়, কতটা ত্যাগ- তিতিক্ষা ছিল তা যেকোন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁরা গিরিশচন্দ্রকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত ছিলেন না। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই এমন তিনজন প্রধান মৌলবি অযাচিতভাবে ইংরেজিতে প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে নাম স্বাক্ষর পূর্বক তাঁকে পত্র লেখেছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'আত্ম-জীবন'এ সে পত্রের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করেছেন-

> ""আমরা নিম্নলিখিত কয়জন সাবধানে ও সমনোযোগে আপনার বঙ্গভাষায় কোরানের অনুবাদ প্রথম দুই খণ্ড পাঠ করিলাম, এবং মূল গ্রন্থের সহিত আপনার মহামূল্য অনুবাদের তুলনা করিলাম। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি যে, আপনি কি রূপে এতাদৃশ উদার আনুপূর্ব্বিক প্রকৃত অনুবাদ করিতে সমর্থ হইলেন। বিশেষতঃ যখন আরব্যতুল্য পুরাতন ভাষা পৃথিবীর অন্যান্য সকল ভাষা হইতে অতিশয় ভিন্ন।"
>
> "আমরা বিশ্বাসে ও জাতিতে মুসলমান, আপনি নিঃস্বার্থভাবে জনহিত সাধনের জন্য যে এতাদৃশ চেষ্টা ও কষ্টসহকারে আমাদিগের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ কোরানের গভীর অর্থ প্রচারে সাধারণের উপকারসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, এজন্য আমাদের অত্যুত্তম ও আন্তরিক বহু কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি দেয়।"
>
> "কোরানের উপরিউক্ত অংশের অনুবাদ এতদূর উৎকৃষ্ট ও বিস্ময়কর হইয়াছে যে, আমাদিগের ইচ্ছা অনুবাদক সাধারণের সমীপে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন। যখন তিনি লোকমণ্ডলীর এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সেবা করিতে সুক্ষম হইলেন, তখন সমস্ত লোকের নিকটে আত্ম পরিচয় দিয়া তাহার উপযুক্ত সম্ভ্রম লাভ করা সমুচিত।""[৬৪]

কোরআন অনুবাদের পর সমগ্র মুসলিম সমাজ গিরিশচন্দ্রকে প্রশংসার ফুলেল অভিবাদনে গ্রহণ না করলেও প্রাজ্ঞবান মুসলিমরা তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদান করেন। শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই গিরিশচন্দ্রের এ অবদানকে এক বাক্যে স্বীকার করে নেন। অনেক মৌলবি নিজ হস্তে তাঁকে প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠিয়েছিলেন এবং অনেক মুসলমান তাঁর পাশে বন্ধু বেশে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি তাঁর অনুবাদিত কোরআনদি গ্রন্থ যাতে বাংলার মুসলমান সমাজে বহুল প্রচার পায় ও বিক্রয় হয় সেজন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করেছিলেন।

বাংলা ১২৮৮ সনের ৬ ফাল্গুন আবুয়ল মজফর আবদুল্লাহ এক পত্রে অনুবাদককে জানান-

> "মহাশয়ের বাঙালা ভাষায় অনুবাদিত কোরআন শরীফ দুই খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়া অতি আহ্লাদের সহিত পাঠ করিলাম। এই অনুবাদ আমার বিবেচনায় অতি উত্তম ও শুদ্ধরূপে

টীকা সহ হইয়াছে। আপনি তফসীর হোসেনী ও শাহ আব্দুল কাদেরের তফসীর অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত টীকা লিখিয়াছেন এ জন্যে ক্ষুদ্র বিদ্যা বুদ্ধিতে যে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বোধ করি যে এ পর্য্যন্ত কোরআন শরীফের অবিকল অনুবাদ অন্য কোন ভাষাতেই এরূপ হয় নাই এবং আমি মনের আহ্লাদের সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, আপনি যে ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে যারপরনাই পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদ করিয়াছেন, ইহার ফল ঈশ্বর আপনাকে ইহ ও পরকালে প্রদান করুন।"[৬৫]

যশোহরের কাজীপুর হতে মৌলবী আবতারোদ্দিন সাহেব উৎসাহসূচক পত্র দিয়ে লেখেন-

"আমরা আপনার ১ম ভাগ কোরআন প্রাপ্তান্তে পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। অনুবাদক মহাশয় যে প্রকার গুরুতর পরিশ্রম যত্ন এবং ভূরি অর্থ ব্যয়ভার বহন স্বীকার করিয়া এতাদৃশ গ্রন্থ প্রচার রূপ কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহাতে আমরা যারপরনাই আহ্লাদিত ও তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। এই পুস্তকের বাংলা অনুবাদ অতি উৎকৃষ্ঠ ও প্রাঞ্জল এবং ইহা যে, এটি উপাদেয় পদার্থ হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। ফল কথা, পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইলে কেবল অনুবাদকের নয় দেশের বিশেষতঃ বাঙালী জাতির গৌরব বাড়িবে, সন্দেহ নাই অনুবাদক মহাশয় এই গ্রন্থ প্রচার করিয়া দেশের একটি মহদভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং এজন্য তিনি আজীবন প্রশংসাই থাকিবেন। দেশহিতৈষী মহোদয়গণের ইহাকে উৎসাহ প্রদান করা সর্বোতভাবে উচিত। ইনি অতি দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সাধারণের উৎসাহ ব্যতিরেকে ইহার কৃতার্থতা লাভ করা কঠিন।"[৬৬]

গিরিশচন্দ্রের কোরআন অনুবাদ শুধু শিক্ষিত পুরুষ সমাজই নয়, নারী সমাজকেও ব্যাপক আন্দোলিত করেছিল। বাংলার বিদুষী মুসলিম নারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র তাঁর 'আত্ম-জীবন'এ বলেন,

"মোসলমান প্রতিভাশালিনী বিদুষীকন্যা মতিচুর পুস্তকের রচয়িত্রী শ্রীমতী আর এস হোসেন মৎকর্ত্তৃক অনুবাদিত ধর্ম্মসাধন নীতি পুস্তকের সমালোচনায় আমাকে "মোসলমান ব্রাহ্ম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আকৃতি প্রকৃতি ভোজ্য পরিচ্ছদ আচার ব্যবহারাদি দেখিয়া আমাকে মোসলমান ব্রাহ্ম বলেন নাই; আমি মুসলমান শাস্ত্রের আলোচনা করি এবং মোসলমান জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া থাকি তজ্জন্য সেরূপ বলিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। তাহার সঙ্গে আমার মাতৃপুত্রসম্বন্ধ স্থাপিত। সেই মনস্বিনী মহিলা উক্ত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় নিজেই প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি আমাকে পত্রাদি লিখিতে পত্রে নিজের নাম না

লিখিয়া নামের পরিবর্তে "মা" বা "আপনার স্নেহের মা" বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া থাকেন।"[৬৭]

অধ্যক্ষ ইবরাহিম খাঁ তাঁর 'বাতায়ন' গ্রন্থে স্মৃতিচারণায় গিরিশচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে বলেন,

> "মৌলভী গিরিশ সেনের লেখার সঙ্গেও এই সময় আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। রাজসিংহ পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি বই পড়ার পর গিরিশ সেনের তাপসমালা পড়ে মুগ্ধচিত্তে ভাবলাম তা'হলে আমাদের ভাল জিনিসের কদর করার লোকও অন্য সমাজে আছে। এই উদার ধার্মিক বিদ্বানের প্রভাব নিঃসন্দেহ রকমে আমার উপর পড়েছিল। পরে তাঁর কুরআনের বঙ্গানুবাদ পড়ি। বাংলা ভাষায় তিনিই সকলের আগে ঐ অনুবাদ করেন। ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল তাঁর অন্তরের অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা। সেই পরম জিজ্ঞাসার মহান তাগীদে তিনি একান্ত যত্নে একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ইছলাম সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন। কুরআন শরীফ ছাড়া তিনি মেশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ (৪র্থ খণ্ড) হযরত মোহাম্মদ (দঃ) হযরত ইব্রাহীম, হযরত মুছা, হযরত দাউদ, এদের জীবন চরিত্রে দেওয়ান হাফিজের বঙ্গানুবাদ, চারজন ধর্ম্মনেতা প্রভৃতি পঁচিশখানা বই রচনা করেন। আজ পর্যন্ত বাংলার মুছলিম লেখকও অতগুলি বিষয়ে অতগুলি বই লিখেছেন বলে আমার জানা নাই।"[৬৮]

শ্রী সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত কোরআন শরীফের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকাতে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ লেখেন,

> "তিনকোটি মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাংলা তাহাতে কোরানের অনুবাদ প্রকাশের কল্পনা ১৮৭৬ খৃ: পর্যন্ত এ দেশের কোন মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তখন আরবী ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত মুসলমানের অভাব বাংলাদেশে ছিল না। তাঁহাদের মধ্যকার কাহারও কাহারও সে বাংলা সাহিত্যের উপরও যথেষ্ট অধিকার ছিল, তাঁহাদের রচিত বা অনুবাদিত বিভিন্ন পুস্তক হইতে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এদিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তাঁহাদের একজনেরও ঘটিয়া উঠে নাই। এই গুরুকর্তব্য ভার বহন করার জন্য সুদৃঢ় সংকল্প নিয়া, সর্বপ্রথমে প্রস্তুত হইলেন বাংলার একজন হিন্দু সন্তান, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন বিধান আচার্য কেশবচন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে। গিরিশচন্দ্রের এই অসাধারণ ও অনুপম সিদ্ধিকে জগতের অষ্টম আশ্চর্য বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।"[৬৯]

কোরআন শরীফ অনুবাদের মধ্য দিয়ে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন বাঙালি মুসলমানদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁরই কর্ম পথ ধরে মুসলমানরা ইসলামী শাস্ত্র চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তাঁর কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ উদার প্রাণ মুসলমানরা তাঁর জীবিতকালেই তাঁর জীবনী রচনার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। কার্তিক অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ সালে ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় বিশিষ্ট ধর্ম প্রচারক পাদ্রী মওলানা মুনশী শেখ জমিরউদ্দীন গিরিশচন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী নামে পরিচিতিমূলক একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এ প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন,

> “ইসলাম প্রচারকের’পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন যে, ইসলামী কাগজে ব্রাহ্মের জীবনী কেন? বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ইতিহাসের সহিত গিরীশবাবুর জীবনীর বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, আজ ইসলাম প্রচারকে তাহার জীবনী প্রচার হইল। বঙ্গদেশে খ্রীস্টান মিশনারীরা অনেকদিন হইতে তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসিতেছিলেন ও কতশত মুসলমান যুবককে খৃস্টানীর দিকে টানিতেছিলেন’ কিন্তু যেদিন বঙ্গীয় মুসলমান যুবক গিরিশবাবুর ‘বঙ্গানুবাদিত কোরআন শরীফ’ ও ‘হযরতের জীবনী’ হস্তে পাইয়াছেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার স্বধর্মের প্রতি টান পড়িয়াছে। আর খৃস্টান হিন্দু ও ব্রাহ্ম ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছেন।”[৭০]

কোরআন শরীফ অনুবাদ গিরিশচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমের অনবদ্য সৃষ্টি। এর প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা নিয়ে বাঙালি শিক্ষিত মুসলিম সমাজে আজ আর কোনো দ্বিধা নেই, দ্বিমত নেই। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর অনুবাদকর্মের অবদান স্বরূপ কোনো কোনো মুসলমান তাঁকে ‘মৌলবী’ খেতাবে সম্বোধন করে পত্রাদি লিখেছেন। গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সে উপাধি সম্পর্কে আত্ম-ভণিতা টেনে বলেন,

> “আমি একদিন নাট্যমঞ্চে মৌলবীর পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমি মৌলবী নহি। কেহ কেহ মৌলবী সম্বোধনে আমাকে পত্র লেখেন, এবং সংবাদপত্রে আমার বিষয়ে অনেক লিখিয়া থাকেন, কিন্তু আমি তাহাতে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইতেছি। বাস্তবিক আমি এরূপ সম্বোধন ও সম্মান পাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।”[৭১]

আত্মপ্রচার বিমুখ বিধানসভার একনিষ্ঠ সেবক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন ধর্মসাধনায় নিভৃতচারী তপস্যামগ্ন এক যোগীসাধক। তাঁর তপস্যার মূলে ছিল হিন্দু মুসলিম ঐক্য সাধনের ধ্যানমগ্নতা। নবযুগের উদ্বোধনে মানবতার সমন্বয় সাধনে তাঁর কর্ম অনুপ্রেরণায় বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মেলবন্ধনই ছিল প্রধান। সর্বধর্ম সমন্বয়ে ইসলামকে সংযোজিত করার যে মহান দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল সে দায়িত্ব পালনে তিনি অত্যন্ত সফলকাম হয়েছেন তা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। শুধু দায়িত্বই নয়, তাঁর আত্মবোধনে বাঙালির চিরকালীন মিলনের সুরটি ঝংকৃত হয়েছিল বলেই সাম্য ও মৈত্রীর আলোকবর্তিকা তিনি প্রজ্বলিত করতে পেরেছিলেন।

তথ্যসূত্র

১. ড. সফিউদ্দিন আহমদ ; *কোরানের প্রথম অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*; বিশ্বসাহিত্য ভবন; ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০; প্রথম প্রকাশ– বইমেলা ২০১২ ; পৃ.-২৬১।

২. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ; *আত্ম-জীবন* ; কলিকাতা ; ১৩১৩ সাল ২২ পৌষ ; পৃ.-৬।

৩. ঐ; পৃ.- ১৫।

৪. ঐ; পৃ.- ১৬।

৫. ঐ; পৃ.- ১৬।

৬. রঞ্জন গুপ্ত; *ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.; কলকাতা; প্রথম সংস্করণ-জানুয়ারি ২০০৯; পৃ.-৭০।

৭. আবুল আহসান চৌধুরী; *ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*; বাংলা একাডেমি; প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯; পৃ.- ৩৭।

৮. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত; বঙ্গানুবাদ *কোরআন শরীফ* প্রয়োজনীয় টীকাসহ; সালমা বুক ডিপো; ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; সালমা নতুন সংস্করণ–জুন ২০০৭; ভূমিকা; পৃ.-৯।

৯. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; প্রাগুক্ত; পৃ.- ১১৮।

১০. ঐ ; পৃ.-৯২-৯৩।

১১. ঐ; পৃ.- ৬৮।

১২. ঐ; পৃ.- ৭৪-৭৫।

১৩. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত; *কোরআন শরীফ*; প্রাগুক্ত; শ্রী সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃ.- ২১।

১৪. আবুল আহসান চৌধুরী; প্রাগুক্ত; পৃ.-৩৬।

১৫. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; আত্ম-জীবন; প্রাগুক্ত; ভূমিকা।

১৬. ঐ; পৃ.-৩৬।

১৭. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত; *কোরআন শরীফ*; প্রাগুক্ত; পৃ.-৬৪-৬৫।

১৮. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত*; কলিকাতা; ১৮২৪। মাঘ; পৃ.-৫৭।

১৯. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *তাপসমালা*; ১ম ভাগ; নববিধান পাবলিকেশন কমিটি; দশম সংস্করণ– ১৯৫০ খ্রি.; পৃ.-৫২।

২০. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *তাপস বায়েজিদ বস্তামী; তাপসমালা*; দ্বিতীয় ভাগ; নববিধান পাবলিকেশন কমিটি; দশম সংস্করণ– ১৯৫০ খ্রি.; পৃ.- ৫৩।

২১. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *তাপস অবদোল্লা খফিফ পারসী ; তাপসমালা;* তৃতীয় ভাগ; দশম সংস্করণ–১৯৫০খ্রি.; নববিধান পাবলিকেশন কমিটি; পৃ.-৪৩-৪৪।

২২. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *তাপস মারুফ গোরখী; তাপসমালা;* চতুর্থ ভাগ; পারস্য পুস্তক তেজকরতোল আওলিয়ার বঙ্গানুবাদ; দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯০২; পৃ.-২৩।

২৩. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *তাপস দাউদ তায়ী; তাপসমালা;* পঞ্চম ভাগ; পারস্য পুস্তক তেজকরতোল আওলিয়া হইতে সঙ্কলিত; নবম সংস্করণ- ১৯৫৩; পৃ.-৪৩-৪৪।

২৪. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *তাপস বশরহাফী; তাপসমালা;* ষষ্ঠ ভাগ; অষ্টম সংস্করণ- ১৯৪১; পৃ.-৬-৭।

২৫. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; হদিস পূর্ব্ব বিভাগ; কলিকাতা– ১৮২৬ শক; পৃ.- ১-৩।

২৬. শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন; *হিতোপাখ্যান মালা*; দ্বিতীয় ভাগ; ১২ মাঘ, ১৩০৩ সন ; পৃ.- ১৯।

২৭. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্ম-জীবন*; ১৩১৩ সাল ২২ পৌষ; কলিকাতা; পৃ.-৭।

২৮. ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের '*আত্ম-জীবন*' এর বিবরণ থেকে যে সব গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গেছে। আবুল আহসান চৌধুরীর '*ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*' গ্রন্থের 'গ্রন্থ পরিচিতি' অংশের আলোকে, ড. সফিউদ্দিন আহমদ এর '*কোরানের প্রথম অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*' গ্রন্থের 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশ, সুকুমার সেন রচিত '*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*' (৩য় খণ্ড) এবং এ যাবৎ প্রাপ্ত তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ '*কোরআন শরীফ,*' '*তাপসমালা,*'(৬ষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত) '*হিতোপাখ্যান মালা,*'(২য় ভাগ)' মাধ্যমে একটি গ্রন্থ তালিকা করার প্রয়াস পেয়েছি।

২৯. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্ম-জীবন*; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৬।

৩০. ঐ; পৃ.-৪৬।

৩১. ঐ; পৃ.- ৬৬।

৩২. উদ্ধৃত; আবুল আহসান চৌধুরী; প্রাগুক্ত; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯; পৃ.- ৫৬।

৩৩. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্ম-জীবন*; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৯।

৩৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; *বাংলা সাময়িকপত্র;* দ্বিতীয় খণ্ড; তৃতীয় মুদ্রণ-ফাল্গুন ১৩৮৪; পৃ.-৭০।

৩৫. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত; *কোরআন শরীফ*; সালমা নতুন সংস্করণ- জুন ২০০৭ ইং, শ্রী সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃ.- ১৭-১৮।

৩৬. ঐ; পৃ.- ১৭।

৩৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রাগুক্ত; পৃ.-৪।

৩৮. শ্রী সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃ.- ১৮।

৩৯. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, *আত্ম-জীবন*; প্রাগুক্ত, পৃ.- ৫১-৫২।

৪০. শাহ মুহাম্মদ সগীর; *ইউসুফ জোলেখা;* ডক্টর মুহম্মদ এনামূল হক সম্পাদিত; মাওলা ব্রাদার্স; ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; ষষ্ঠ মুদ্রণ মে ২০১৫; পৃ.-২১৮-২১৯।

৪১. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবর রহমান; *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা;* প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট ১৯৮৬; প্রকাশনা পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ; পৃ.-২১-২২।

৪২. মুন্শী শ্রী আবদুল করিম সঙ্কলিত; *বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ;* প্রথম খণ্ড; দ্বিতীয় সংখ্যা; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হতে প্রকাশিত; পৃ.-৪৫।

৪৩. ঐ; পৃ.-৪৫-৪৬।

৪৪. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত; *বাংলা পিডিয়া;* খণ্ড ৮; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০০৩; পৃ.-২২৩।

৪৫. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত; *পুথি-পরিচিতি;* প্রকাশক মুহাম্মদ আবদুল হাই; অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রথম মুদ্রণঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮।

৪৬. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান; প্রাগুক্ত; পৃ.-২৪-২৫।

৪৭. ঐ; পৃ.-২৬।

৪৮. ঐ; পৃ.- ৩৩-৩৪।

৪৯. ড. মোহাম্মদ হাননান; *পবিত্র কোরআন অনুবাদের নানা প্রসঙ্গ*; আগামী প্রকাশনী; প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০০৫; পৃ.-১৩।

৫০. ড. সফিউদ্দিন আহমদ; *কোরানের প্রথম অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*; প্রথম প্রকাশ- বইমেলা, ২০১২; পৃ.- ১৫৪।

৫১. ঐ; পৃ.- ৯১।

৫২. ঐ; পৃ.- ৯২।

৫৩. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত; *কোরআন শরীফ*; শ্রী সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়: প্রাগুক্ত; পৃ.-১৬।

৫৪. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ; *আত্ম-জীবন;* প্রাগুক্ত; পৃ.- ৯৩।

৫৫. ড. সফিউদ্দিন আহমদ; প্রাগুক্ত; পৃ.- ১৬০।

৫৬. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত; *কোরআন শরীফ;* সালমা নতুন সংস্করণ; প্রাগুক্ত; ভূমিকা অংশ; পৃ.-৯।

৫৭. উদ্ধৃত; ড. সফিউদ্দিন আহমদ; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৬৬।

৫৮. রণজিৎ কুমার সেন; *মওলানা ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*; মা প্রকাশনী, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা; প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি, ২০০২; পৃ.-৪৪।

৫৯. ড. সফিউদ্দিন আহমদ; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৪৪।

৬০. বাংলাপিডিয়া; *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*; খণ্ড ৩; প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৩; পৃ.-১৭৪।

৬১. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্ম-জীবন*; প্রাগুক্ত; পৃ.-৯৩।

৬২. উদ্ধৃত; ড. সফিউদ্দিন আহমদ; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৭১।

৬৩. উদ্ধৃত; ঐ; পৃ.-১৭১।

৬৪. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্ম-জীবন*; প্রাগুক্ত; পৃ.- ৯৪।

৬৫. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত; *কোরআন শরীফ;* প্রাগুক্ত; চিত্রপত্র; পৃ.-৫৮৩।

৬৬. ঐ; পৃ.-৫৮৩।

৬৭. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্ম-জীবন*; প্রাগুক্ত; পৃ.-৫০-৫১।

৬৮. ইব্রাহিম খাঁ; *বাতায়ন;* প্রথম প্রকাশ- জুলাই ১৯৬৭; পৃ.-২৮০।

৬৯. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত; *কোরআন শরীফ*; সালমা নতুন সংস্করণ- জুন ২০০৭ইং; শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃ.-১৩।

৭০. উদ্ধৃত; আবুল আহসান চৌধুরী; প্রাগুক্ত; পৃ.- ৮৫।

৭১. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্ম-জীবন*; প্রাগুক্ত; পৃ.-৯৩।

পঞ্চম অধ্যায় : রচনাবলীর পর্যালোচনা ও মূল্যবিচার

গিরিশচন্দ্র সেনের জীবনী ও রচনাবলির বিস্তারিত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি–তিনি একাধারে ধর্মপ্রচারক ও সমাজসেবী। যদিও তাঁর সমাজসেবামূলক রচনা অনেকাংশেই ধর্ম দ্বারা আক্রান্ত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে আমরা তাঁর রচনাবলিকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি– এক. জীবনীমূলক রচনা; দুই. ধর্মমূলক রচনা; তিন. সমাজমূলক রচনা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, গিরিশচন্দ্র অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন এবং বেশ কয়েকটি পত্রিকায় সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন। তৎকালে লেখালেখির কারণে তিনি ছিলেন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁর জীবনাবসানের মাত্র একশ বছরের মধ্যেই তিনি বিস্মৃত প্রায়। তাঁর রচনাবলি সংগ্রহ করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তাঁর বিশাল রচনাসম্ভারের যৎসামান্যই আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁর রচিত যে সব গ্রন্থ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে সে সব গ্রন্থের আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করে তাঁর রচনা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি।

এক. জীবনীমূলক রচনা: গিরিশচন্দ্র বেশ কয়েকটি জীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর 'আত্ম-জীবন' গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী আমরা দেখতে পাই– স্ত্রী বিয়োগের পর তাঁর জীবন কাহিনি নিয়ে 'ব্রহ্মময়ী চরিত' গ্রন্থটি রচনা করেন (আত্ম-জীবন; পৃ.-৩৯); মায়ের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি মায়ের মৃত্যুর পর রচনা করেন 'মাতৃ-বিয়োগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস' (আত্ম-জীবন; পৃ.-৬৪); তাঁর বড়দিদি বড়দেশ্বরীর মৃত্যুর পর তিনি 'বরদেশ্বরী চরিত' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন (আত্ম-জীবন; পৃ.-৮৯-৯০); পরলোকগতা মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা 'সতীচরিত' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবনী সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি তাঁর 'আত্ম-জীবন' রচনাটি। তাঁর আরো একটি আত্মজীবনী মূলক রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; তৃতীয় খণ্ড' গ্রন্থে– 'পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত'। এছাড়া 'মহাপুরুষ চরিত' (নববিধান কর্তৃক প্রকাশিত মহাপুরুষ চরিত সিরিজ) গ্রন্থটিও তাঁর রচিত জীবনী রচনার অন্তর্ভুক্ত। তবে শেষোক্ত দুটো গ্রন্থকে আমরা তাঁর ধর্মমূলক গ্রন্থের আওতাধীন রাখতে চাই। তাঁর অন্যান্য জীবনীমূলক রচনার মধ্যে 'আত্ম-জীবন' গ্রন্থটিই শুধু আমরা পেয়েছি।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের 'আত্ম-জীবন' রচনাটি শুধু তাঁর আত্মকথনই নয়; তৎকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের এক অখণ্ড দলিল। তাঁর 'আত্ম-জীবন' এ ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের পাশাপাশি চলে এসেছে তৎকালীন সমাজের নানা অনুষঙ্গ। গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন ধর্ম সেবক। সংস্কারমূলক ধর্মীয় শুদ্ধতা দিয়েই তিনি অবলোকন করেছেন জগত ও জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমাজ বাস্তবতা। তাঁর 'আত্ম-জীবন' রচনার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের অপলাপ থেকে তাঁর জীবনীকে রক্ষা করা। কারণ সমাজে কোনো খ্যাতিমান বা ক্ষমতাবান লোকের মৃত্যুর পর সচরাচর লোকেরা সত্যকে অতিক্রম করে এমন ভাবুকতা ও কল্পনার অবতারণা করে যে, তাকে মুহূর্তের মধ্যে স্বর্গে তুলে দেয়। আবার একজন সুযোগ্য লোককেও রসাতলে

পাঠিয়ে দেয়। এ ধরণের সামাজিক প্রবণতা গিরিশচন্দ্রের মনঃপুত নয়। গিরিশচন্দ্র নিজেকে খ্যাতিমান বা বড় মাপের মনুষ ভাবেননি। তিনি তাঁর রচিত 'আত্ম-জীবন' পাঠকের জন্য অবারিতও করেননি। শুধু তাঁর আত্মীয় অন্তরঙ্গ লোকদের জন্যই তিনি 'আত্ম-জীবন' রচনা করেছেন। জীবন সম্পর্কে কাল্পনিক মাহাত্ম্য বর্ণনকে অবজ্ঞা করে সত্যনিষ্ঠ জীবন কাহিনি রচনাই ছিল তাঁর 'আত্ম-জীবন' রচনার মূল উদ্দেশ্য। গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর 'আত্ম-জীবন' রচনার অভিপ্রায় সম্পর্কে ভূমিকাতে বলেন,

> "এক্ষণ আমার বয়ঃক্রম সত্তোর বৎসর অতিক্রম করিয়াছে; পরলোকে অবস্থানের কাল দূরে নহে। অল্পলোকের এরূপ দীর্ঘ জীবন হয়। আমি এই সত্তোর বৎসরের জীবনে সুখদুঃখ পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশ্বাস অবিশ্বাস আলোক অন্ধকারাদি পরস্পর বিপরীত ও বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এই জীবনের উপর দিয়া অনেক বিপৎপরীক্ষা গিয়াছে, আধ্যাত্মিক সম্পদুন্নতিও ভগবৎ-কৃপায় প্রচুর লাভ হইয়াছে । আমি ভগবানের বিশেষ প্রেম ও করুণা এই পাপজীবনে ভোগ করিয়াছি। তিনি আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসিয়াছেন, সত্য ধনে ধনী সুখসম্পদের অধিকারী করিয়াছেন, এই পাপীকে পদাশ্রয় দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই তৃণতুল্য অকিঞ্চিতকর ব্যক্তিকে পবিত্র বিধানের কার্য্যে ব্যবহৃত করিয়াছেন। আমার জীবনে ভগবানের কৃপা যে কত প্রকাশ পাইয়াছে অন্য লোকে এমনকি নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পর্য্যন্ত তাহা অল্পই জানেন। আমি স্বীয় জীবনে প্রেমময় বিধাতার জীবন্ত প্রেমের লীলা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি জগতে স্বয়ং তাহার সাক্ষ্য দান করার উদ্দেশ্যে এই 'আত্ম-জীবন' পুস্তক লিখিলাম।"[১]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তাঁর জীবনে ঈশ্বরের (আধ্যাত্ম) মহিমা বর্ণনই 'আত্ম-জীবন' রচনার মূল প্রতিপাদ্য। একজন ধর্ম সাধক– ধর্মবোধই যার কাছে চরম সত্য, ধর্মবিশ্বাস যার কাছে পরম বিশ্বাস এবং ঈশ্বরই যার কাছে পরম আশ্রয়, সেখানে সাহিত্য নয়; বিশুদ্ধতার এক অতীন্দ্রিয় বোধ জেগে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। গিরিশচন্দ্র আধ্যাত্মিক ভক্তিরঞ্জন দৃষ্টিতে জীবন ও জগতকে নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করেছেন; জীবনে ঈশ্বরের প্রেমকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। সুতরাং তিনি জগতে ঈশ্বরের প্রেমময় বিকাশকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন । তবে ঈশ্বর সমর্পিত জীবনের বিকাশে অনিবার্য প্রয়োজনেই তাঁর 'আত্ম-জীবন' এ সমাজ বাস্তবতা উঠে এসেছে স্বমহিমায়। যার সাহিত্যমূল্য একেবারে কম নয়। গিরিশচন্দ্র তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবনে পথ চলা– ছাত্রজীবন, চাকরীজীবন, ধর্মজীবন বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতায় সমাজ-সংস্কৃতিকেই আশ্রয় করেছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের বিচিত্র সামাজিক অভিজ্ঞতা, শাণিত সাংস্কৃতিক চেতনা, জাতিগত উত্থান-পতনে রাজনৈতিক ভাবনা, প্রজ্ঞাময় ধর্মবোধের সমষ্টি তাঁর 'আত্ম-জীবন'।

গিরিশচন্দ্রের বাল্য, শৈশব ও যৌবনের কিছুটা সময় কেটেছে বর্তমান নরসিংদীর মাধবদী গ্রামে। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যময় এবং সমৃদ্ধময় একটি গ্রাম। সহজ, সরল, সাধারণ এখানকার অধিকাংশ মানুষের জীবন। পূজা-পার্বণ এবং নানাবিদ আমোদ-প্রমোদে কাটত তাঁদের সময়। গিরিশচন্দ্র তাঁর শৈশব ও কৈশোরকে বর্ণনা করতে গিয়ে পারিবারিক জীবনের বাইরে সমাজকেও এঁকেছেন নিপুণ দক্ষতায়। সে সমাজে

পূজার্চনার বাড়াবাড়ি ছিল। ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল সে সমাজ। জাত-পাতের বিভেদ ছিল প্রকট। ছোট্ট গিরিশচন্দ্রও সে বিভেদে আক্রান্ত ছিলেন–

> "আমি একজন পাক্কা হিন্দু ছিলাম, উচ্চ নীচ জাতি বলিয়া আমার ভেদ-জ্ঞান প্রবল ছিল। মোসলমানের ছায়া মারালে আমি যেন অপবিত্র হইলাম, মনে করিতাম। আমাদের ঘরে একজন শূদ্র জাতীয় চাকরাণী ছিল, সে বহুকাল আমাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিল, আমি তাহার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছি। তাহার বার্দ্ধক্যকাল পর্য্যন্ত সে আমাদের কাজে নিযুক্ত ছিল। তাহাকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম, তাঁহার নাম করুণা ছিল। একদিন রাত্রিতে আমি ভোজন করিতে বসিয়াছি, করুণা মাসী আমার পাশ ঘেঁষিয়া চলিয়া যায়, তাহার আঁচল আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া আমি তৎক্ষনাৎ ভোজনে নিবৃত্ত হইয়া অন্নপাত্র পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলাম। শূদ্র জাতির স্পর্শ হইল, আমি কেমন করিয়া আর সেই অন্ন গ্রহণ করি।"[২]

এই বিভেদ শুধু বালক গিরিশচন্দ্রের অস্পৃশ্য মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ নয়, তখন সমগ্র হিন্দুসমাজ জুড়েই ছিল অস্পৃশ্যতার প্রভাব। নিচু জাত বলে মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়া, সুযোগ-সুবিধা তথা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করা ছিল তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদের বিশিষ্টতা। চলমান বাস্তবতার প্রভাব অবচেতনেই কিশোর গিরিশকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

জীবন আনকোরা নয়, শুধু সুন্দরের সমষ্টিও নয়। সুন্দর-অসুন্দরের সমষ্টিই জীবন। সমাজে যেমন সুন্দর আছে, মানবিক বিকাশ আছে, তেমনি সুন্দরের সাথে মিলে মিশে এক হয়ে আছে গভীর গোপন অসুন্দর। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'আত্মজীবন' এ সমাজ-বাস্তবতার অসুন্দর দিকটিও তুলে ধরেছেন অকপটে–

> "সেই সময় পাঁচদোনা গ্রামের অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে নীতির বন্ধন ছিল না, চরিত্রের সুদৃষ্টান্ত দুর্লভ ছিল, আমি প্রায় কাহারও মুখে ভাল কথা– সদুপদেশ শুনিতে পাইতাম না। অধিকাংশ জ্ঞাতি কুটুম্ব পুরুষ ঘোরতর মদ্যপায়ী ছিল।"[৩]

তৎকালীন সমাজে নারীদের অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ ছিল না। তাঁদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। পুরুষ শাসিত সমাজে তাঁরা ছিল অবহেলিত, নিগৃহীত ও অবরুদ্ধ। শিক্ষা-দীক্ষা সকল দিক থেকে তাঁরা ছিল বঞ্চিত। তাঁরা জীবন যাপন করত অনেকটা দাসীর মতো। দিবা-রাত্রি খেটে তাঁরা সংসারের তুষ্টি যোগাত; সামান্য ভুল-ত্রুটি হলে গঞ্জনা পোহাতে হতো। এতকিছুর পর মনের দুঃখ-কষ্টগুলো কারো সঙ্গে তাঁরা বলতেও পারত না। এমনই বিভীষিকাময় ছিল বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন বাংলার নারীর জীবন। গিরিশচন্দ্রের ব্যথিত হৃদয়ের বর্ণনাতেও সামাজিক হীনম্মন্যতার এ চিত্রটি আমরা দেখতে পাই–

> "স্বদেশে গৃহে অবস্থান কালে প্রত্যেক পরিবারের বধূদিগের দুঃখ দুরবস্থা ও তাঁহাদের প্রতি শ্বাশুড়ী ননদ প্রভৃতির অত্যাচার দর্শন করিয়া আমার মন অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে। এইরূপ নিপীড়ন ও নির্য্যাতনের ভিতরে থাকিয়া তাঁহাদের মনোবৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল না, জ্ঞান-পিপাসা কিছুই চরিতার্থ হইতে ছিল না। ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণও বধূরূপে দাসীর ন্যায় দিবারাত্রি খাটিয়া গলদগর্ম্ম হন, প্রায় কাহারও হইতে আদর যত্ন লাভ করেন না, কাজে একটু

> ত্রুটি হইলে গঞ্জনা ভোগ করেন,তাঁহাদিগকে নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাঁহাদের মুখ ফুটিয়া কথা কহিবার স্বাধীনতাটুকু নাই।"[৪]

গভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে অন্দরমহলের মর্মব্যথা উপলব্ধি সহজ হতো না। তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে মানবিক বিবেচনায় নারীর অন্তর্বেদনাকে রূপ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে পুরুষশাসিত সমাজের অপব্যবস্থাকেও তুলে ধরেছেন।

কর্মজীবনের প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্র জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন ময়মনসিংহে। আত্মকথনের ফাঁকে ফাঁকে ময়মনসিংহের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সামাজিক চিত্রও উঠে এসেছে তাঁর লেখনিতে। ময়মনসিংহে এসে প্রথমে তিনি দাদা সৃষ্টিধর রায়ের সেরেস্তাতেই নকলনবিশের কাজে নিয়োজিত হন। সেখানে আরো কয়েকজন নকলনবিশের কাজ করতেন। তারা চাপকান ও মাথায় পাগরি বাঁধিয়া সেজেগুজে সেরেস্তায় আসতেন। তাঁদের বাহ্যিক আড়ম্বর যতটা ছিল জ্ঞানের আড়ম্বরে ছিল ঠিক ততটাই অন্তঃসারশূন্যতা। তাঁরা লেখেতেন, "জাদুকৃষ্ট জাত্রাপুরে জাইয়া জদুনাথকে অকারণ মাইর পিট করিয়া জন্ত্রনা দিয়াছে।"[৫] তথাকথিত ভাবধারী জ্ঞানের অন্তঃসারশূন্যতাকে তিনি অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে বিদ্রূপ করেছেন।

ময়মনসিংহে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হবার পর ধীরে ধীরে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় সামাজিক নির্যাতন। কেউ তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যে জলযোগ পর্যন্ত করতেন না। পার্বতীচরণ বাবুর বাড়িতে তিনি থাকতেন, সেখানেও শুরু হয়েছিল ঘোরতর বিপত্তি–

> "পার্ব্বতী বাবুর পত্নী অন্তঃপুরে আমার ভোজন বন্ধ করিয়া দিলেন, বহির্ভবনে আমার জন্য অন্ন ব্যঞ্জনে পূর্ণ থালা বাটী পাঠাইয়া দিতেন, সেই থালা বাটী আমি ধৌত প্রক্ষালন করিতে বাধ্য হইতাম। তৎপর অন্ন ব্যঞ্জন প্রেরণ বন্ধ হয়। আমি বর্হিভবনের একটি প্রকোষ্ঠে স্বয়ং রন্ধন করিয়া ভোজন করিতাম, ভৃত্যাভাবে নিজে খাদ্যসামগ্রী বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া আসিতাম, স্কুলের সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল বহন করিয়া আনিতাম, উচ্ছিষ্টপাত্র স্বয়ং মার্জ্জন করিতাম। পরে একটি ভৃত্য নিযুক্ত করা গিয়াছিল, গৃহকর্ত্রীর অত্যাচারে সে দুই তিন দিন পরেই প্রস্থান করে। ভৃত্য আমার উচ্ছিষ্ট পাত্র স্পর্শ করিলে গৃহিণী তাহাকে স্নান করাইতেন, সে দুই এক দিন রাত্রিতে স্নান করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠে।"[৬]

একজন মানুষের স্বাধীন সত্তার বিকাশ, তাঁর পছন্দ অপছন্দ এমনকি তাঁর ব্যক্তিকবোধ পর্যন্ত তৎকালীন সামাজিক জবরদস্তিতায় পরাজিত হতে বাধ্য ছিল। কখনো কেউ সামাজিক অবরুদ্ধতার বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াতে চাইলে তাঁর ওপর নেমে আসত সামাজিক অনাচারের খড়গ। সমাজ নির্মমতার এই চিত্রটি গিরিশচন্দ্র তাঁর আত্ম বিবরণীতে তাঁর চরিত্রেই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর 'আত্ম-জীবন'এ নিজ পরিবারের টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের পারিবারিক দ্বন্দ্বকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। বড় দাদা পারিবারিক কর্তৃত্বে ধর্মত্যাগী গিরিশচন্দ্রের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অবিচল দৃঢ়তায় এবং মায়ের অনুকূলতায় তাঁর দাদা তা পারেননি। এরপর তাঁর দাদার মৃত্যুর পর পারিবারিক সম্পত্তি এবং কর্তৃত্বের দায়িত্ব আসে বিপিনচন্দ্রের হাতে। বিপিনচন্দ্র অত্যন্ত অমিতাচারী ও অবিবেচক। পারিবারিক কল্যাণ ও শান্তির নিমিত্তে গিরিশচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন–"অর্থের আদান প্রদানাদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দুভূষণের অমতে করিবে না, তাহার ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের অমতে ঋণ করিবে না।"[৭] এতে বিপিনচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয় এবং আত্মীয় স্বজনদের কাছে অভিযোগ করে পত্রাদি লেখতে থাকে। এ দ্বন্দ্ব শুধু গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক দ্বন্দ্ব নয়, সে সমাজ তথা বর্তমান সমাজেরও গ্রাম-গঞ্জের নিত্য ঘটনা। এরকম অসংখ্য খণ্ড খণ্ড সামাজিক চিত্রের প্রতিরূপ বর্ণিত হয়েছে তাঁর 'আত্ম-জীবন' গ্রন্থটিতে। শুধু অনর্গল আত্মকথনই নয়, তৎকালীন সামাজ-বাস্তবতার আঁকর গ্রন্থ এ 'আত্ম-জীবন'।

গিরিশচন্দ্রের 'আত্ম-জীবন' এ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিক অনুভূতিও ব্যক্ত হয়েছে। একজন ধর্মযাজকের নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টি, ধর্ম প্রচারণায় নানা প্রতিকূলতা এবং আধ্যাত্মিক ভাবালুপতার অনাবিল আনন্দ প্রভৃতি ছাপিয়ে কখনো কখনো বড় হয়ে উঠেছে মানুষের একান্ত নিজস্ব ব্যক্তি-অনুভূতি। গিরিশচন্দ্র তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মময়ীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। রোগাক্রান্ত স্ত্রীর মুক্তি কামনায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন। স্ত্রীর রোগশয্যায় বসে গিরিশচন্দ্র যে মানসিক অস্থিরতার দুরন্ত দুর্ভাবনায় প্রহর গুণছিলেন তা সত্যি অনবদ্য সাহিত্য ভাবনায় শৈল্পিকতার অঙ্গিভূত হয়ে উঠেছে–

> "আকাশ ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন হইল, প্রবল প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, ক্রমে বিদ্যুৎ প্রকাশ ও বজ্রধ্বনি এবং বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। নৌকা চালাইয়া অগ্রসর হইবার নাবিকদের আর সাধ্য হইল না। আমার চক্ষে নিদ্রা নাই, মনে মহাভাবনা ও উদ্বেগ ছিল। প্রণয়িনীর ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ও প্রলপোক্তি হইতেছিল। প্রবল বায়ুর জন্য নৌকায় দীপ রাখিবার সাধ্য ছিল না। আমি অন্ধকারে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া এক এক বার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ছিলাম।"[৮]

এ আকাশ ভাগ্যাকাশের প্রতীকী রূপে গিরিশচন্দ্রের জীবনে মেলে ধরেছে দিব্যময় সান্ত্বনার বাণী। চারপাশের সবই যখন প্রতিকূল–মেঘ, বায়ু, বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি, বারিবর্ষণ এবং নিদ্রা যখন মহাভাবনায় তরঙ্গায়িত হয়ে প্রণয়িনীর ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ও প্রলপোক্তিতে আত্ম-সমর্পণ করে, তখন নিয়তি নির্ভরতা ছাড়া জীবন বিভ্রান্ত পথিকের আর কি-বা করার থাকে?

> "পুনর্ব্বার ঘনতর জলদজালে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; বিদ্যুতের তীব্র আলোকের সঙ্গে মেঘ-নির্ঘোর্ষ হইতে লাগিল, বায়ু প্রবাহের সহিত সবেগে বারিধারা বর্ষণ আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক্ তিমিরাবরণে আবৃত, ইতস্ততঃ কিছুই নয়নগোচর হয় না, নৌকায় দীপালোক নাই, দীপ জ্বালিলেও বায়ুবেগে তৎক্ষণাৎ নিব্বার্পিত হয়। আমি অন্ধকারে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার

> সেবা শুশ্রূষা করিতেছি, আমার অন্তঃকরণ ক্লেশ যাতনায় অস্থির, মনের কথা বলিব এমন কেহ নাই; ভৃত্যটি সঙ্গে ছিল, সেও নাই।"[৯]

প্রকৃতির দাপটের কাছে জীবন অসহায়; মানুষ তাঁর ক্রীড়ানক মাত্র। ভাগ্যতাড়িত জীবনবিপন্ন মানুষ আবার প্রকৃতির বিধ্বস্ততাতেই ঘোষণা করে আপন বিপর্যয়। গিরিশচন্দ্র অন্তর্বেদনায় অবসন্ন, প্রিয়তমার যন্ত্রণা লাঘবে ব্যর্থ, দুঃখ ক্লেশে হয়ে পড়েছেন অস্থির। আলোহীন তিমিরাবরণে প্রকৃতির মতোই ডুবে গেছে তাঁর জীবন।

> "তাহাতে আবার ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী, মুষলধারায় বারিবর্ষণ। আমার বাহিরে আঁধার, অন্তরেও আঁধার। আমি অন্তরে কোনও আলোক পাইতেছিলাম না; বাহিরে বারিদমণ্ডল হইতে অবিরল বারিধারা বর্ষিত হইতেছিল, আমার নেত্রযুগল হইতেও অনর্গল অশ্রুধারা পড়িতেছিল। আমি ক্ষণে ক্ষণে ভগবানকে ডাকিতেছিলাম। সেই রাত্রি এত দীর্ঘ বোধ হইতেছিল, যেন সম্বৎসরের সমুদায় রাত্রি একত্র মিলিত হইয়া আমাকে নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত; কিছুতেই শেষ হয় না। এমন অন্ধকার আমি জীবনে কখনও দর্শন করি নাই। ভাবিতে ছিলাম যে, আমার ন্যায় বন্ধুবিহীন নিরাশ্রয় বুঝি পৃথিবীতে আর কেহ নাই।"[১০]

নিঃসঙ্গ,শ্রান্ত-ক্লান্ত পথযাত্রী– যাপিত জীবনের ব্যর্থতায় জর্জরিত; প্রিয়তমা স্ত্রী দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত; প্রকৃতি বিরূপ– মেতে উঠেছে তাণ্ডবলীলায়। বাইরে অবিরল ধারায় বারিবর্ষণ হচ্ছে সেই সঙ্গে ঝরছে গিরিশচন্দ্রের অবিরল নয়নের জল। গিরিশচন্দ্রের ভেতরের অশান্ত ঝড়ই প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছে প্রলয়লীলা। ভয়ংকর তাণ্ডবলীলা প্রকৃতিকে যেমন করে তুলেছে নিকষ আঁধার, তেমনি গিরিশচন্দ্রের জীবনের দুর্যোগ তাঁর ভেতরটাকে ভেঙ্গে-চূড়ে জন্ম দিয়েছে নিকষ আঁধার। স্ত্রীর বিয়োগ সম্ভাবনায় তিনি হয়ে পড়েছেন বন্ধুহীন, স্বজনহীন, আশ্রয়হীন একজন।

শুধু স্ত্রীর সম্ভাব্য বিয়োগে নয়, জীবনের ক্লান্তি প্রকাশেও তিনি প্রতীকী ব্যবহার এনেছেন। চাকরীজীবনের প্রথমাবস্থায় যখন তিনি হতাশায় নিমজ্জিত ছিলেন, তখন তাঁর জীবন হয়ে পড়েছিল অর্থহীন। ব্যর্থ জীবনের হতাশা তিনি প্রকাশ করেছেন–"এই সময় আমার অন্তরে ঘন বিষাদের ছায়া পড়ে, আমি মনে এক বিন্দু শান্তি পাইতেছিলাম না, যেন অনলে দগ্ধ হইতেছিলাম"[১১] জীবনের বৈচিত্র্যময় অনুভূতির সমৃদ্ধ প্রকাশ 'আত্মজীবন'।

উনিশ শতকের বাংলা রাজনৈতিক চেতনার উত্থান-পতনে ছিল ঘটনাবহুল। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় প্রতিনিয়তই নতুন বাঁক নিয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ঢাকা এবং কলকাতা বসবাস কালে গিরিশচন্দ্র পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তিনি ছিলেন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিত্ব। সে যুগের রাজনৈতিক সচেতনতাকে ঠিক আধুনিক যুগের সচেতনতা দিয়ে পরিমাপ করলে যথার্থ হবে না। আধুনিক যুগের সচেতনতা নানা দিক দিয়ে ব্যঞ্জনাময় এবং নানা অর্থে অর্থবহ। তখনকার শিক্ষিত ও সংস্কারপন্থীদের

অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী। রামমোহন রায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত সবাই ইংরেজ শাসনকে আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ বয়সে ইংরেজ সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতাকে বুঝতে পেরেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ছিলেন অন্ধ ইংরেজ অনুরক্ত। নববিধানের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে রাজভক্তিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ধর্মীয় অনুষঙ্গ হিসেবে। সুতরাং তাঁর 'আত্ম-জীবন'এ বর্ণিত রাজনৈতিক মন্তব্যগুলোকে রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ না করে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ হিসেবে গ্রহণ করাই শ্রেয়।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে কলকাতায় গড়ে উঠেছিল তুমুল আন্দোলন। সংবাদপত্র মুখর হয়েছিল ইংরেজ সমালোচনায়। সভা সমিতির জ্বালাময়ী ভাষণেও ছিল বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা। সাধারণ মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী এমনকি মহিলারা পর্যন্ত সে আন্দোলনে পথে নেমে এসেছিলেন। ধীরে ধীরে তা রূপ নিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনে। এদেশের মানুষ বিলাতি পণ্য বর্জন করে এদেশীয় পণ্যকে গ্রহণ করতে থাকেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে কলকাতায় যে কী অবস্থা বিরাজ করছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় গিরিশচন্দ্রের বর্ণনাতেই–

> "রাজধানীতে ও নানা স্থানের পথে ঘাটে মাঠে বাজারে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি, আন্দোলন ও বক্তৃতাদি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া উঠে। কলিকাতার পটলডাঙ্গা গোলদিঘীর তীর আন্দোলনকারীদিগের কেন্দ্রস্থল হয়। ছোট ছোট বালকেরা বাজারে ও দোকানে বিলাতীদ্রব্য ক্রয়কারীদিগের প্রতি উৎপাত ও অবিচার করিতে থাকে। সকলে শোকচিহ্ন ধারণ করে। যে দিন ঢাকা নগরে রাজধানীর সূত্রপাত ও প্রধান বিচারালয় সকল স্থাপিত হয়, সেদিন কলিকাতাস্থিত সকলে বাবু বিপিন পাল প্রভৃতি বক্তা ও দেশহিতৈষী চারি পাঁচ জনের দ্বারা প্রচারিত বিধিমতে দুঃখসূচক অরন্ধনের নিয়ম পালন করেন। আন্দোলনকারিগণ চেষ্টা যত্ন করিয়া নগরের বাজার প্রসার বন্ধ করিয়াছিলেন।"[১২]

গিরিশচন্দ্র বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন। পক্ষপাতটুকু বাদ দিলে তাঁর বর্ণনা যে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার অখণ্ড চিত্র তাতে সন্দেহ নেই।

গিরিশচন্দ্রের 'আত্ম-জীবন' গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় অবস্থা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। গিরিশচন্দ্রের জীবনের বিকাশই ঘটেছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে। ছেলেবেলায় ধর্মচর্চার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাঁর জীবনের যে পরিক্রমণ শেষ পর্যন্ত প্রজ্ঞাময় ধর্মবোধেই হয় তার সমাপ্তি। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে যুগে শিক্ষার প্রসার তেমন ছিল না। যৎসামান্য যেটুকু ছিল তাও ছিল ধর্ম সংশ্লিষ্ট। সে সমাজের মানুষের জীবন ছিল ধর্মবোধে আচ্ছন্ন। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের মধ্যেই তাঁরা দেখেছেন ইহজাগতিক জীবনের চরম উৎকর্ষ। গিরিশচন্দ্র তাঁর বাল্যকালের স্মতিচারণ করতে গিয়ে যে সাজসজ্জা ও আমোদ-প্রমোদের কথা বলেছেন তা ছিল ধর্ম চেতনা সমৃদ্ধ। একটি শিশুর বাল্যক্রীড়ার মধ্যে প্রধান ক্রীড়া ছিল ঠাকুর পূজা, তাঁর সারাবেলা কাটত পূজা-আহ্নিকে। গিরিশচন্দ্রের বর্ণনায়–

"আমার বাল্যক্রীড়ার মধ্যে প্রধান ক্রীড়া ছিল ঠাকুর পূজা। পিত্তল নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গণেশ, গোপাল এবং অন্নপূর্ণা মুর্ত্তি ছিল, সে সকল আমা কর্তৃক গৃহের এক প্রকোষ্ঠে সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রত্যূষে এই সমস্ত মূর্তিপূজার জন্য আমি পুষ্প চয়ন করিতাম। স্নান করিয়া বা বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া পুষ্প চয়ন চন্দন ও নৈবেদ্য এবং ধূপ দীপযোগে নিবিষ্ট মনে সেই প্রতিমূর্ত্তি সকলের পূজায় নিযুক্ত হইতাম।... ...। আমি শাক্তপরিবারের বালক ছিলাম, শৈশবকালে সময়ে সময়ে কদলী তরু কাটিয়া আনিয়া তাহাকে মহিষ বা পাঁঠা কল্পনা করিয়া পুতুলের সম্মুখে বলিদান করিতাম। অনেক পক্ষীর ছানা পোষা গিয়াছে; কখন কখন আমি পাখীও বলিদান করিয়াছি, কখন কখন তুলসী তরুর সেবা করিয়া তুলসীভক্ত বৈষ্ণবদের অণুকরণ করিয়াছি।"[১৩]

একটি শিশু জন্মেই ধর্মকে আঁকড়ে ধরেনি। পরিবার, পরিবেশ ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে ধর্মকে জন্ম দিয়েছে। গিরিশচন্দ্রের বর্ণনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সে সমাজ ছিল ধর্মীয় আচারাদিতে অবরুদ্ধ।

গিরিশচন্দ্রের ধর্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মধর্মে অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে। ধর্ম পরিভ্রমণের পথটাও তাঁর জন্য মসৃণ ছিল না। সামাজিক প্রতিকূলতা, স্ত্রীর অন্তর্ধান, বন্ধু-বান্ধবেব হীনম্মন্যতা, পারিবারিক তিক্ততা প্রভৃতি তাঁর ধর্মজীবনকেও করে তুলেছিল বন্ধুর। তবে কোনো প্রতিকূলতাই তাঁর নিরবচ্ছিন্ন ধর্মসাধনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। স্ত্রী বিয়োগের পর ধর্মই ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। প্রচারব্রত গ্রহণ করে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ধর্ম প্রচারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর 'আত্ম-জীবন' এ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষিত প্রগতিশীলদের প্রচারিত নতুন ধর্ম। রক্ষণশীল হিন্দুরা এ ধর্মকে সুনজরে গ্রহণ করেননি। ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে তাঁরা নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়–

একবার তাঁরা সদলবলে পূর্ববঙ্গের রংপুর অঞ্চলে প্রচারাভিযান চালিয়ে ছিলেন। তারপর সেখান থেকে বরিশাল হয়ে মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত ছিল তাঁদের প্রচার যাত্রা। কিন্তু বঙ্গচন্দ্র রায়ের অনুকূল সম্মতি না পাওয়াতে বরিশাল পর্যন্তই যাত্রাসীমা নির্ধারিত হলো। যাত্রা শুরু হলো মঙ্গলগঞ্জ থেকে। ইছামতী তীরস্থ নাকফুলী গ্রামে কীর্তন ও বক্তৃতা করে রাত ৯টা-১০টার দিকে নৌকার দিকে যাত্রা করলেন। তাঁরা ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন তাই উর্ধ্বশ্বাসে নৌকার দিকে ছুটতে লাগলেন। রাত্রি অন্ধকারময় হওয়াতে তাঁরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। অনেকদূর পথ চলার পর তাঁরা একটি ঘরে একজন লোককে বসে থাকতে দেখলেন। লোকটি তাঁদেরকে ভুল পথ দেখিয়ে দিলেন। অনেক ঘোরাঘুরি করে, নৌকার মাঝিকে হাঁকাহাকি করে তাঁরা আবার লোকটির কাছে ফিরে এলেন। তার কাছে বাইরের ঘরে রাত্রি যাপনের আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। কিন্তু লোকটি তাঁদেরকে পাশের জমিদার বাড়িতে নিয়ে গেলেন–

"সেই বাড়িতে বড় বড় ঘর এবং জমিদার বাবুর প্রচুর শস্যসম্পত্তি দৃষ্ট হইল। গৃহস্বামী নিদ্রিত ছিলেন, ডাকাডাকির পর জাগরিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। তিনিও আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য

করিলেন না, তাঁহার কোন গৃহে স্থান দান করিতে সম্মত হইলেন না। ভাবে বুঝা গেল, তিনি আমাদিগকে ডাকাত ভাবিয়াছিলেন, সুযোগক্রমে লুটপাট করিয়া চলিয়া যাইব, এরূপ মনে করিয়াছিলেন।”[১৪]

এরকম নানা প্রতিকূলতায়–কখনো খেয়ে না খেয়ে, কখনো রাস্তায় রাত্রি যাপন করে, অনেক সময় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তাঁরা বিতাড়িতও হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের ধর্মবোধের অবিচল নিষ্ঠাকে কেউ দমাতে পারেনি।

গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর আত্ম-কাহিনিকে অবিকৃতভাবে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের কাছে তুলে ধরার জন্য ‘আত্ম-জীবন’ রচনা করেছেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ এক সাধক পুরুষ। সত্যের অপলাপ তাঁর কাছে অমর্যাদাকর। তিনি তাঁর চরিত্রের দোষ-ত্রুটি, পাপ-পুণ্যি সবই তুলে ধরেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। কিন্তু জীবন যে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্মের ছায়াতলে বিকাশমান তাকে অনুষঙ্গ করেই রচিত হয়েছে তাঁর ‘আত্ম-জীবন’। সুতরাং তাঁর ‘আত্ম-জীবন’ শুধু আত্মকথার অনর্গল বর্ণনাই নয় তা তৎকালীন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক,ও ধর্মীয়জীবনের এক কালীক সাক্ষী।

ধর্মমূলক রচনা: গিরিশচন্দ্রের ধর্মসংক্রান্ত রচনার অধিকাংশই অনুবাদমূলক। কয়েকটি মৌলিক রচনা ও বিভিন্ন সভা-সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতা যা পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে– সেগুলো ছাড়া তাঁর ধর্মমূলক রচনাগুলো সাধারণত আরবি, ফারসি, হিন্দি এবং উর্দু থেকে অনূদিত। তাঁর ধর্মমূলক রচনাকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি–১. মুসলমান ধর্মবিষয়ক রচনা; ২. নববিধান বিষয়ক রচনা। তাঁর ধর্মমূলক রচনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কোরআন অনুবাদ। কুরআন অনুবাদে তাঁর নিরলস সাধনা ও অধ্যবসায় প্রসংশার দাবি রাখে। একটি প্রাচীন ও ব্যাকরণ সমৃদ্ধ অজানা ভাষা আরবিকে আয়ত্ত করে মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ কোরআন অনুবাদের মতো দুঃসাহসিক কাজে তিনি ব্রতী হয়েছেন এবং সাফল্যের সঙ্গেই তা সম্পন্ন করেছেন। পৃথিবীর ধর্মীয় ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা। তবে সকল প্রশংসনীয় কাজের পেছনেই সমালোচনা থাকে। গিরিশচন্দ্রও সেই আক্রমণাত্মক সমালোচনার তোপে পড়েছিলেন। কেউ কেউ তাঁর শিরশ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন আবার কেউ কেউ তাঁর কোরআন অনুবাদের ভাষা ও গঠন প্রণালী নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর কোরআন অনুবাদের প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেই ভাষা সংক্রান্ত তাঁর দীনতাকে অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি কোরআনের আয়াতকে অবিকল অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছেন এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার লালিত্য বজায় রাখতেও সবিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার গঠন প্রণালী আরবি ভাষার গঠন প্রণালী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলেন–

“আরব–ভাষার প্রণালী বঙ্গীয়–ভাষার প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গালা বাম দিক হইতে লিখিত হইয়া থাকে, আরবী ঠিক তাহার বিপরীত দক্ষিণ দিক হইতে লিখিত হয়। বচন বিন্যাস প্রণালীও সেইরূপ। সাধারণতঃ কর্তৃপদ পূর্বে স্থাপিত ও সমাপিকা ক্রিয়ার অন্তে সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার বাক্য সমাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু, প্রায়শঃ আরব্য বাক্যের আরম্ভে সমাপিকা ক্রিয়ার ও অন্তে কর্তৃপদের প্রয়োগ হয়। অনেক স্থলে বঙ্গ-ভাষার কর্তৃকারক ব্যক্ত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে, আরব্য ভাষায় তাহার বিপরীত; অর্থাৎ কর্তৃকারক অব্যক্ত ক্রিয়াপদ ব্যক্ত হইয়া থাকে;

Dhaka University Institutional Repository

> ক্রিয়া পদের পুরুষ, লিঙ্গ ও বচনের চিহ্ন দ্বারা কর্তা নির্ণয় করিতে হয়। অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব ব্যক্ত করিতে আরব্য ভাষা যেরূপে অনুকূল এমন পূর্ণ ভাষা সংস্কৃত তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে পরাস্ত। আরবীয় একটি কথার ভাব ব্যক্ত করিতে বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় দ্বিগুণ-ত্রিগুণ কথা প্রয়োগ করিতে হয়। এই উভয় ভাষার পদ-বিন্যাস প্রণালী ইত্যাদির বহু বিভিন্নতাহেতু কোরআনের প্রবচন সকল আরবী ভাষার রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত শ্রুতিকটু ও দুর্বোধ্য হইয়া উঠে, অতএব আমাকে অনুবাদে বঙ্গ-ভাষার বচন বিন্যাস প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইয়াছে। বিশদরূপে ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে যে স্থানে দুই একটি অতিরিক্ত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা () এই চিহ্নের মধ্যে ব্যবস্থাপিত করা গিয়াছে।"[১৫]

গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কোরানের অনুবাদ করেছেন। তিনি জানতেন কোরআন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কোরআনের অপর নাম 'কালামুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর বাণী। কোরআন অধ্যয়ন ও শ্রবণে পুণ্য হয়। পাক পবিত্র হয়েই কোরআন স্পর্শ করতে হয়। সেজন্যই কোরআনের দুরূহ বাক্যের টীকা ও ঐতিহাসিক তথ্যের প্রয়োজনে তিনি 'তাফসীর হোসেনী' (কোরআনের ফারসি অনুবাদ) এবং শাহ আবদুল কাদেরের উর্দু অনুবাদকে অনুসরণ করেছেন।[১৬]

কোরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়েছে। কোরআন শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করার জন্য ত্রিশ-বত্রিশ প্রকার আক্ষরিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সেই চিহ্নগুলো বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই বলে তার প্রয়োগ ঘটাননি। কিন্তু প্রত্যেক আয়াতের ক্ষেত্রে তিনি বিরাম চিহ্নের ব্যবহার রেখেছেন। কোরআনের প্রত্যেক সূরার আয়াত সংখ্যা সূরার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন পাঠের সময় বিশেষ বিশেষ আয়াতে মাথা নত করে কিছুক্ষণ বিরত থাকতে হয়। একে রুকু বলে। প্রত্যেক সূরার শুরুতে রুকুর সংখ্যাও তিনি উল্লেখ করেছেন। কোরআনের ভিন্ন ভিন্ন সূরার অন্তর্গত নির্দিষ্ট ১২টি আয়াতে সিজদা বিধিকেও অনুসরণ করেছেন। কোনো বিশিষ্ট সূরা কোনো স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে তা ফুটনোটে লিপিবদ্ধ করেছেন। মাঝে মাঝে 'শানে নুযুল'ও দিয়েছেন। কোরআনের এক আয়াতের সঙ্গে যেখানে অন্য আয়াতের সাদৃশ্য পেয়েছেন সেখানে তিনি যোগচিহ্ন (+) ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু এতবড় একটি গুরুভার প্রথম উদ্যোগেই নির্ভুল হবে এমনটা প্রত্যাশা করা বাঞ্ছনীয় নয়। গিরিশচন্দ্র কোরআনের প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর ভুল ত্রুটি স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে সেই ভুলত্রুটি সংশোধন করে অনুবাদকে শ্রুতিমধুর ও প্রাঞ্জল করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। গিরিশচন্দ্র কোরআনের ভাবানুবাদ নয়; আক্ষরিক অনুবাদে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু কোরআনের ভাষা যেহেতু প্রাচীন এবং ব্যাকরণ সমৃদ্ধ অপেক্ষাকৃত জটিল, সেহেতু অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ দুরূহ হয়ে পড়েছে। গিরিশচন্দ্র সেন দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপণে বলেন, কোরআন একটি সুদুরূহ ধর্মগ্রন্থ। তার অনুবাদে অনেক স্থানে সাধারণ প্রচলিত সহজ শব্দ ব্যবহার যথার্থ হয়ে উঠে না। ফলে কখনো কখনো ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

সম্বন্ধীয় আরবি শব্দের বাংলা অনুবাদে কিছু কঠিন প্রতিশব্দ প্রয়োগ করতে হয়েছে। ভাব গ্রহণ করে স্বাধীন শব্দ চয়নে ভাষাকে অনেকটা গতিশীল করা যায়। একটি আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদে 'যে উপদেশ গ্রহণ করিতেছে, তাহা অল্পই' কিন্তু ভাব গ্রহণ করে অনুবাদ করলে 'অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিতেছে' বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয়। কিন্তু কোরআনের ক্ষেত্রে এরকম অনুবাদ দুঃসাধ্য। ফলে অনুবাদ সংক্ষিপ্ততায় ও জটিলতায় দুর্বোধ্য হয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি তাঁর ভাষাজ্ঞান ও শব্দবিন্যাসের দরিদ্রতাকেও স্বীকার করেছেন। গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয় সংস্করণে 'তাফসীর হোসেনী' ও শাহ্ আবদুল কাদেরের উর্দু অনুবাদের পাশাপাশি আরবি ভাষার 'তাফসীর জ্বালালাইন' অবলম্বনে বাংলা টীকা সংযোজন করেন। এ সংস্করণে 'তাফসীর হোসেনী' হতে আবার নতুন কিছু ব্যাখ্যাও সংযোজন করা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে গিরিশচন্দ্র প্রত্যেক রুকুর আয়াতের সংখ্যা তত্তৎ রুকুর শেষভাগে নিবন্ধ করেন। কোরআনের কোনো অধ্যায়ের কোন রুকুতে কি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে সেটা যেমন তিনি নিবন্ধ করেছেন, তেমনি নিবন্ধিত বিষয়ের নির্ঘন্টও দিয়েছেন। ফলে কোরআনের কোথায় কোন বিষয় আছে নির্ঘন্টের সাহায্যে অনুধাবন করা সহজতর হয়ে উঠেছে।

গিরিশচন্দ্র সেন কোরআন অনুবাদে তৃতীয় খণ্ডের শুরুতে প্রতিটি সূরার সূচিপত্র দিয়েছেন। সূরার নাম, নামের বাংলা অর্থ এবং সেগুলোর পত্রাংকও বর্ণিত হয়েছে সূচিতে। সূরা 'আল-ফাতিহা' ও সূরা 'ইখলাস' ছাড়া প্রায় প্রতিটি সূরার নামকরণ হয়েছে সূরার অন্তর্গত আয়াতের কোনো একটি লক্ষণকে অবলম্বন করে। গিরিশচন্দ্র সূচিতে এ বিষয়টিও আলোকপাত করেছেন। সূরার সূচিপত্রের পর তিনি প্যারারও আলাদা সূচিপত্র দিয়েছেন। এতে কোন পৃষ্ঠায় কোন সূরার কোন আয়াত থেকে কোন প্যারা শুরু হয়েছে তা ব্যক্ত হয়েছে।[১৭]

গিরিশচন্দ্রের কঠোর শ্রমলব্ধ তপস্যার ফসল কোরআন অনুবাদ। এর ভাষা, ব্যকরণ, গঠন বিন্যাস, রচনাশৈলী ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিয়ে তিনি নিরলস অধ্যবসায় করেছেন। টীকা টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে কোরআনের বাণী পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। একটি ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন আবহে রচিত ধর্মগ্রন্থকে নিজস্ব শব্দ ব্যবহারে যে কতটা নিজস্ব করে তোলা যায় তার অনবদ্য প্রয়াস গিরিশচন্দ্রের কোরআন বঙ্গানুবাদ। তাঁর অনুবাদকৃত 'সূরা বাকারা'র অংশবিশেষ উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরছি–

সূরা বাকারা[৩]

দ্বিতীয় অধ্যায়

২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকূ

(দাতা দয়ালু মহান আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।১।)

"ইহাতে নিঃসন্দেহ, এই পুস্তকই[৪] ধর্মভীরু লোকদের জন্য পথ-প্রদর্শক।২। যাহারা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং আমি যে উপজীবিকা দিয়াছি তাহা ব্যয় করে।৩। এবং তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে যাহা অবতরণ করিয়াছি[৫] তাহা যাহারা বিশ্বাস করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে তাহারা স্বীয় প্রতিপালক কর্তৃক সুপথে আছে এবং তাহারা পরিত্রাণ লাভের যোগ্য। ৪+৫। যাহারা

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহদ্রোহী হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর তাহাদের পক্ষে তুল্য, তাহারা বিশ্বাস করিবে না।৬। মহান রব তাহাদিগের অন্তঃকরণ ও কর্ণকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ও তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ আছে, এবং তাহাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে।৭। (রুকূ ১, আয়াত ৭)”[১৮]

যথাসম্ভব সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি কোরআন অনুবাদে সচেষ্ট থেকেছেন। কিছু ভুলত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কোরআন বঙ্গানুবাদের যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তা ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ। তৎকালীন বাংলার দুই বৃহৎ জাতি হিন্দু-মুসলিম উভয়েই নিজ ধর্ম সম্পর্কে ছিলেন ধর্মান্ধ ও গোঁড়া। ধর্ম সম্পর্কিত অনুভূতিতে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। গিরিশচন্দ্রের তা অজানা ছিল না। একজন হিন্দু (ইসলামের দৃষ্টিতে কাফের) মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করেছে এবং বাংলায় (কাফেরের ভাষা) তা অনুবাদ করেছে শুনলে গোঁড়াপন্থী মুসলমান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন এটা তিনি জানতেন। এর পরিণাম সম্পর্কেও তার মনে আশঙ্কা জেগেছিল। তারপরও মুসলিম সমাজের অবরুদ্ধতাকে ভেঙ্গে কোরআন অনুবাদের যে মহৎ উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন তা-ই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

তাপসমালা : গিরিশচন্দ্র সেন রচিত ‘তাপসমালা’ পারস্য গ্রন্থ ‘তেজকরতোল্ আওলিয়া’র অনুবাদ। পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক মওলানা শেখ ফরিদোদ্দিন আত্তার ‘শরহোল্ কল্‌ব কশফোল্ আস্‌রার’, ‘মারফতোন্নফস্’ ও ‘অররব’ গ্রন্থের সার সঙ্কলনে ‘তেজকরতোল আওলিয়া’ গ্রন্থটি রচনা করেন। মুসলমান তপস্বীদের জীবনচরিত বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে। ইসলাম ধর্মের তাপসীদের মাহাত্ম্যকে বাংলার সাধারণ মানুষের গোচরীভূত করাই ছিল তাঁর ‘তাপসমালা’ অনুবাদের অভিপ্রায়। তাঁর ধারণা, ইসলাম ধর্মের মহর্ষিদের জীবনী অনুবাদের মাধ্যমে তাঁদের স্বর্গীয় চরিত্রের মহিমা বাঙালির অন্তর আলোকিত করবে। ঈশ্বরভক্তি ও সাধুভক্তির দৃশ্যমান প্রতিফলনে সাধারণ মানুষের হৃদয়েও ফুটবে স্বর্গীয় কুসুম। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষ থেকে মুসলমান সম্পর্কে বদ্ধমূল কুসংস্কারও তিনি দূর করতে চেয়েছেন। ‘তাপসমালা’ আক্ষরিক অনুবাদ নয়। গিরিশচন্দ্র সেন বলেন, “ইহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু সমুদায় অবিকল অনুবাদ নহে। অনেক স্থানে ভাষা-প্রণালীর অনুরোধে ও অন্য অন্য কারণে ভাবমাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং কোন কোন অংশ অনাবশ্যক বোধে একেবারে পরিত্যাগ করা গিয়াছে।”[১৯]

‘তাপসমালা’র ছয় খণ্ডে মোট ছিয়ানব্বই জন তাপসীর জীবনী বিধৃত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র সেন প্রথমে ‘তাপসমালা’ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে কতিপয় তাপসীর জীবন বিধৃত করেন। এরপর বেশ কয়েক বছর ‘তাপসমালা’র পরবর্তী অনুবাদ থেকে বিরত থাকেন। এ গ্রন্থ পাঠে জনজীবন উপকৃত হয়েছে শুনে এবং বন্ধুদের বিশেষ আগ্রহে প্রায় এক দশক পর পুনরায় অনুবাদের কাজ শুরু করেন। ‘তেজকরতোল্ আওলিয়া’র অবশিষ্ট তপস্বীদের জীবনচরিত নিয়ে তিনি ‘তাপসমালা’র চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাগ সমাপ্ত করেন। ‘তাপসমালা’ অনুবাদে তিনি মুসলমান মনীষীদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। প্রত্যেক মনীষীর নামের আগে ‘তাপস’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ‘তাপসমালা’ দ্বিতীয় ভাগে ‘তাপস মালেকদিনার দমস্কী’ মূল

Dhaka University Institutional Repository

লেখার শিরোনামে 'তাপস' শব্দটি নেই বটে কিন্তু সূচিপত্রে 'মালেকদিনার দমস্কী' নামের পূর্বে 'তাপস' শব্দটি রয়েছে। সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রয়াসে গিরিশচন্দ্র যখন ইসলাম ধর্মের কোরআন হাদিস অধ্যয়ন শুরু করলেন, তখন তিনি মুসলিম তপস্বীদের জীবনী পড়ে মুগ্ধ হলেন। তাঁদের জীবনাচরণ, কর্তব্যনিষ্ঠা, ধ্যানমগ্নতা, ত্যাগী মনোভাব, ভক্তিপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতায় অবিভূত হয়ে তিনি তাঁদেরকে মুসলমান সম্প্রদায়ের রত্ন বলেছেন। অবশ্য মুসলমান সম্পর্কে তাঁর এ বিনয় প্রকাশ অনেকাংশেই নববিধান দ্বারা অনুপ্রাণিত–

> "আমি একজন নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্ম। নববিধান সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ও তাঁহাদের নিকটে অবনতমস্তকে সত্য শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। আমি সেই উদার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মোসলমান মহর্ষিদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি, এবং সমাদরে তাঁহাদিগকে বন্ধুগণের নিকটে উপস্থিত করিতে সংকল্প করিয়াছি।"[২০]

'তাপসমালা' ইসলাম ধর্মের সাধু, সন্ন্যাসী ও মহাজন জীবনীর বাংলা সংস্করণ। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাসী। ইসলাম ধর্মও এর ব্যতিক্রম নয়। সকল ধর্ম প্রবক্তা ও সাধক পুরুষরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। ধর্মীয় প্রাচীন ইতিহাসের এটি স্বাভাবিক প্রবণতা। 'তাপসমালা'য় স্বীয় আধ্যাত্মিক প্রতিভায় সিদ্ধি লাভ করা তপস্বীদের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। ফলে এসব জীবনীতেও অলৌকিক, অপ্রাকৃত ও জনশ্রুতির প্রভাব সুস্পষ্ট। আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে কেউ মৃত্তিকাকে স্বর্ণে পরিণত করলেন, কেউ আকাশে উড়লেন, কেউ পদব্রজে নদী পার হলেন, কেউ হাতের লাঠির আঘাতে নদীর মধ্যে রাস্তা তৈরী করলেন এরকম হাজারো ঘটনা অলৌকিতার ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছে ধর্ম কাহিনিতে। গিরিশচন্দ্র তাপসীদের জীবনী থেকে অপ্রাকৃতিক ঘটনাবলিকে যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। কখনো কখনো বাহ্যিক অনৈসর্গিক ঘটনার রূপক ব্যবহারকে তিনি স্বীকার করেছেন বটে কিন্তু তাঁদের আত্মিক বিকাশ–ভক্তি, প্রেম, নিষ্ঠা, বৈরাগ্য ও মানবিকতাকেই বড় করে দেখেছেন।

'তাপসমালা' পশ্চিম এশিয়ার অন্তর্গত আরব, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশের ধর্ম সাধকদের জীবনীর অনুবাদ। কিন্তু তাঁর অনুবাদ দেশজ শব্দ ও উপকরণ ব্যবহারে অনেকটাই বাংলার চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে–

> "একদা কয়েকজন লোক শব বহন করিয়া গমন করিতেছিল, একজন তাহার পশ্চাৎ যাইতেছিল, এবং বলিতেছিল, "হায় পুত্রের বিচ্ছেদ।" তখন শব্ লি স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় ঈশ্বরের বিচ্ছেদ।"
> একদা আর্দ্র কাষ্ঠ শব্ লির সম্মুখে দগ্ধ হইতেছিল। কাষ্ঠের এক প্রান্তে অগ্নি জ্বলিতেছিল, অপর প্রান্ত হইতে জল নিঃসৃত হইতেছিল। তিনি ইহা দেখিয়া বন্ধুদিগকে বলিলেন, "তোমরা বলিয়া থাক যে, আমাদের হৃদয়ে অনুরাগের অনল জ্বলিতেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তোমাদের চক্ষু হইতে কেন জল বাহির হইতেছে না।"[২১]

Dhaka University Institutional Repository

> "একদিন দাউদ রৌদ্রোত্তাপে বসিয়াছিলেন, স্বেদবিন্দু তাহার অঙ্গ হইতে ক্ষরণ হইতেছিল। জননী দেখিয়া সস্নেহ বচনে বলেন,"বৎস মাতৃজীবন, এখন তীব্র উষ্ণতা, তুমি নিত্য উপবাসব্রতধারী, ছায়াতে বসিলে ক্ষতি কি?" তিনি বলিলেন,"মাতঃ, আত্মজীবনের তোষামোদের অনুরোধে উঠিতে ঈশ্বর হইতে লজ্জা হয়, আমার বাস্তবিক গাত্রাবরণও নাই।" জননী বলিলেন, "বৎস, একি কথা!" দাউদ বলিলেন, "বাগ্দাদে যখন লোকের অত্যন্ত হীনাবস্থা দেখিয়াছিলাম, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাহাতে পরমেশ্বর চাদরখানা আমা হইতে প্রত্যাহার করিয়াছেন। তজ্জন্য আমাকে মণ্ডলীতে উপস্থিত হইতে হয় না, এ বিষয়ে আমি নিষ্কৃতি পাইয়াছি। ষোল বৎসর হইল, আমার চাদর নাই, এ কথা আমি তোমাকে জ্ঞাপন করি নাই।"[২২]

শব্দ ব্যবহার, আবহ সৃষ্টি এবং বর্ণনা ভঙ্গির গুণে অনুবাদ যে কতটা নিজস্ব হয়ে প্রকাশ পেতে পারে তা গিরিশচন্দ্র অনূদিত উদ্ধৃত অংশগুলোতে সুস্পষ্ট। পুত্রবিচ্ছেদ, জননীর স্নেহ, ঈশ্বরানুরাগ, মানবীয় আবেদন দেশ-কাল-পাত্র ভেদে একই। সেই শাশ্বত আবেগ-অনুভূতিকেই তিনি নিজস্ব বর্ণনায় বাঙালির প্রাণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

হাদিস-পূর্ব্ববিভাগ : হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় যা বলেছেন এবং যা করেছেন কিংবা অন্যের যে কাজকে তিনি সমর্থন করেছেন সে সমস্ত উক্তি ও কাজকে হাদিস বলে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজে যে উক্তি দিয়েছেন তা 'কওলী হাদিস' বা বচনাত্মক হাদিস; তিনি নিজে যা করেছেন তা 'ফেলী হাদিস' বা ক্রিয়াত্মক হাদিস; তাঁর সম্মুখে যা ঘটেছে এবং তিনি যেসব কাজ ও উক্তিকে অনুমোদন করেছেন তা 'তক্রিরী হাদিস' বা স্বীকার্য হাদিস হিসেবে পরিচিত।[২৩] ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার বহুকাল পেরিয়ে গেলেও হাদিস সম্পর্কীয় কোনো গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়নি। যুগ যুগ ধরে সাহাবীগণ তা মুখস্থ রাখতেন। এব্ নজ্বোরিহু, এনাম মালেক ও রবিয় যখন হাদিস সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করলেন, তখন থেকে হাদিস লিপিবদ্ধ করার চর্চা শুরু হয়। হাদিস সংকলনকারীদের মধ্যে প্রধান হলেন– মোহাম্মদ বোখারী, মোসলেম, এমাম মালেক, আবু দাউদ, নেয়াসী, দারমী, এমাম নওয়ী, এমাম আবু মোহাম্মদ প্রভৃতি।

এমাম আবু মোহম্মদ মহিয়োস্সোন্নত কর্তৃক সঙ্কলিত হাদিসের নাম 'মেশকাত মসাবিহ'। মেশকাত মসাবিহ শব্দের অর্থ আলোকাধার। এ সুবৃহৎ গ্রন্থে সহিহ হোসেনসহ প্রায় সকল প্রকার হাদিস সংগৃহীত হয়েছে। যথাযথ নিয়মের সুবিন্যস্ত রূপায়ণে 'মেশকাত মসাবিহ' সর্বোৎকৃষ্ট হাদিসের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। 'মেশকাত মসাবিহ' এর অনুবাদ ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের 'হদিস পূর্ব্ববিভাগ'। 'কোরআন'এর মতো এটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়। তবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উক্তিগুলোকে তিনি হুবুহু অনুবাদের প্রয়াস পেয়েছেন। 'হদিস পূর্ব্ববিভাগ'এর টীকা অংশের জন্য তিনি মহাপণ্ডিত অবদোল্হকের 'আশাতোল্লমাত' গ্রন্থকে অনুসরণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মূল হাদিস 'মেশকাত মসাবিহ' দুই খণ্ডে বিভক্ত। এ হাদিসের প্রথম ভাগে ধর্মের অঙ্গীভূত সকল বিষয় এবং দ্বিতীয় ভাগে সাধারণত ক্রিয়াকলাপ বৃত্তান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। মূল হাদিস 'মেশকাত মসাবিহ'এর পূর্বভাগের মাত্র ২৩ পৃষ্ঠার অনুবাদ গিরিশচন্দ্রের 'হাদিস পূর্ব্ববিভাগ'। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর অনুবাদকৃত হাদিসে ধর্মীয় বিষয়– বিশ্বাস প্রকরণ, জ্ঞান প্রকরণ, শুদ্ধি প্রকরণ, নামাজ প্রকরণ, জানাজা প্রকরণ, জাকাত প্রকরণ, রোজা প্রকরণ, কোরআনমাহাত্ম্য প্রকরণ, প্রার্থনা প্রকরণ, ঈশ্বরের নামাবলী প্রকরণ, মনাসক প্রকরণ, ক্রয় বিক্রয় প্রকরণ প্রাধান্য পেয়েছে।

হিতোপাখ্যান মালা (দ্বিতীয় ভাগ) : গিরিশচন্দ্র সেন হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ[২৪] এবং হিতোপাখ্যানমালা দ্বিতীয় ভাগ নামে দুটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। প্রচারাভিযানকালে তাঁকে বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়েছে। এমনকি জাহাজেও দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে। জাহাজে অবস্থানকালে তিনি প্রখ্যাত কবি শেখ সাদীর 'বুস্তান' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এটি নীতিপূর্ণ একটি কাব্যগ্রন্থ। পারস্য 'বুস্তান' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদকে তিনি 'হিতোপাখ্যানমালা' দ্বিতীয় ভাগ নামে প্রকাশ করেন।[২৫] এ গ্রন্থে মোট পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে–পরোপকার, কৃতজ্ঞতা, বিনয়, ধৈর্য এবং বিবিধ বিষয়। ছোট ছোট কাহিনির মাধ্যমে মানুষের আদর্শিক জীবন 'হিতোপাখ্যানমালা' দ্বিতীয় ভাগের মূল উপজীব্য।

মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত : সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। তিনি ইসলামের মহান আদর্শে বিশ্ব মানবতাকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা, ধৈর্যশীলতা, মহানুভবতা, উদারতা, মানবতা প্রভৃতি ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেছেন। হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্নতায় কেটেছে তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময়। নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা এবং তাঁর বিধি অনুযায়ী জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাধর ছিলেন। প্রতিভার দ্যুতিতে তিনি বিশ্বকে জয় করেছিলেন। তাঁর জীবনচরিত লিখতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র বলেন–

> "যিনি কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাদের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে পৌত্তলিকতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের সিংহাসনের নিম্নে লইয়া আসিয়াছেন, প্রত্যহ পাঁচ বার নিয়মিতরূপে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা বন্দনার বন্ধনে ধনী দরিদ্র স্ত্রীপুরুষ আবালবৃদ্ধ যুবাকে দৃঢ় রূপে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, পৃথিবীর নানা বিভাগে সহস্র সহস্র একেশ্বরের মন্দির গগনমার্গে চূড়া উত্তোলন করিয়া যাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া রহিয়াছে, সেই হযরত কি সামান্য লোক? দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া কে না তাঁহাকে স্বীকার করিবেন? ঈশ্বরকৃপা ও দেব প্রভাবের অভাবে কি জগতে কেহ এরূপ মহাকার্য্য সাধন করিতে পারেন? তিনি একজন অতি সামান্যাবস্থায় নিরক্ষর অশিক্ষিত লোক হইয়া কেবল দুর্জ্জয় বিশ্বাস ও দৈবশক্তিতেই একেশ্বরের জয় ঘোষণা সমুদায় পৃথিবীকে কাঁপাইয়াছেন।"[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

মহাপুরুষ মুহাম্মদের জীবনচরিত দুটি বিভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে আরবের বর্ণনা থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদের মদিনায় যাত্রা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। গারসুরে হযরতের প্রবেশ থেকে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শোক প্রকাশ এবং হযরত মুহাম্মদের আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে উত্তর বিভাগের সমাপ্তি। তিনি 'ফতুহমেসর' নামক প্রাচীন আরব্য গ্রন্থ থেকে মুহাম্মদের আকৃতি প্রকৃতি সঙ্কলন করেছেন।

সমাজমূলক রচনা : গিরিশচন্দ্রের সমাজমূলক রচনার কোনো নিদর্শন আমাদের হাতে নেই। নববিধান আদর্শের প্রতিফলনে তিনি নারীশিক্ষা, নারীকল্যাণ চেয়েছেন; স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন; দীর্ঘদিন 'মহিলা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন; নারী বিষয়ক প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। নারীশিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে 'বনিতাবিনোদ' কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।[২৭] কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর সমাজমূলক রচনার কোনোটাই আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

গিরিশচন্দ্রের প্রাপ্ত রচনাবলির আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় বলা যায়, তাঁর প্রায় সব রচনাই উদ্দেশ্যমূলক। তাঁর রচনার অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্মধর্ম যেমন সক্রিয় ছিল, তেমনি তিনিও রচনায় ধর্মকেই বড় করে দেখেছেন। গিরিশচন্দ্র সাহিত্য নয় ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনে লেখনি ধারণ করেছেন। তাঁর রচনায় ধর্মের অনুষঙ্গ হয়ে উঠে এসেছে জীবন ও জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। তবে ধর্ম বিকাশের পরিপূরক হয়েও তাঁর রচনায় সে সময়ের যে সমাজ ও সমাজ বাস্তবতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সাহিত্যমূল্য একবারে অস্বীকার করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্ম-জীবন*; ১৩১৩ সাল, ২২ পৌষ; ভূমিকা অংশ ।

২. ঐ; পৃ.-৫।

৩. ঐ; পৃ.-৭।

৪. ঐ; পৃ.-১৭।

৫. ঐ; পৃ.-১৪।

৬. ঐ; পৃ.-৩০।

৭. ঐ; পৃ.-৫৬।

৮. ঐ; পৃ.-৩৪-৩৫।

৯. ঐ: পৃ.-৩৬।

১০. ঐ; পৃ.-৩৬।

১১. ঐ; পৃ.-১৪।

১২. ঐ; পৃ.-১৩০।

১৩. ঐ; পৃ.- ৪-৫।

১৪. ঐ; পৃ.-৭৬-৭৭।

১৫. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত; বঙ্গানুবাদ '*কোরআন শরীফ*' প্রয়োজনীয় টীকাসহ; ভূমিকা; সালমা বুক ডিপো; ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; সালমা নতুন সংস্করণ-জুন ২০০৭ ইং; পৃ.-৯।

১৬. ঐ; পৃ.-৯।

১৭. ড. সফিউদ্দিন আহমদ; *কোরআনের প্রথম অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*; বিশ্বসাহিত্য ভবন; ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০; প্রথম প্রকাশ- বইমেলা ২০১২; পৃ.-১৬৮।

১৮. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত; বঙ্গানুবাদ '*কোরআন শরীফ*' প্রয়োজনীয় টীকাসহ; প্রাগুক্ত; পৃ.-৬৪।

১৯. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত ; *তাপসমালা*; প্রথম ভাগ; নববিধান পাবলিকেশন কমিটী; ৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা; দশম সংস্করণ-১৯৫০ খ্রি.; 'নিবেদন অংশ'।

২০. ঐ; 'নিবেদন অংশ'।

২১. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত; *তাপসমালা*; তৃতীয় ভাগ; নববিধান পাবলিকেশন কমিটী; ৯৫ নং কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা; দশম সংস্করণ-১৯৫০খ্রি.; পৃ.-২৫।

২২. স্বর্গগত গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত; *তাপসমালা*; পঞ্চম ভাগ; প্রকাশিকা লিমিটেড (নববিধান প্রেস); কলিকাতা; নবম সংস্করণ-১৯৫৩; পৃ.-৪৫-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত; *হদিস–পূর্ব্ববিভাগ*; ৩নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস; কলিকাতা; ১৮২৬ শক; ভূমিকা অংশ।

২৪. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; আত্ম-জীবন; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৭।
গ্রন্থটি আমরা প্রাপ্ত হইনি। হার্ডিঞ্জ স্কুলের নিম্ন শ্রেণির অন্যতর শিক্ষক পদে নিযুক্ত হবার পর পারস্যের 'গোলস্তান' পুস্তকের করে হিতোপাখ্যান প্রথম ভাগ নামে প্রকাশ করেন।

২৫. ঐ; পৃ.-৬৮।

২৬. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত*; মহাপুরুষ চরিত দ্বিতীয়ভাগ; ৩নং রমানাথ মজুমদারের স্ট্রীট; মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস; কলিকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ-১৮২৪ মাঘ; পরিশিষ্ট অংশ।

২৭. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্ম-জীবন*; প্রাগুক্ত; পৃ.-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ক. মূলগ্রন্থ

১. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *আত্ম-জীবন*; কলিকাতা; ১৩১৩ সাল ২২ পৌষ।

২, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত; *বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ প্রয়োজনীয় টীকাসহ*; সালমা বুক ডিপো; ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; সালমা নতুন সংস্করণ–জুন ২০০৭।

৩. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত*; মহাপুরুষ চরিত দ্বিতীয়ভাগ; ৩নং রমানাথ মজুমদারের স্ট্রীট; মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস; কলিকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ-১৮২৪ মাঘ।

৪. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *তাপসমালা*; প্রথম ভাগ; নববিধান পাবলিকেশন কমিটি; ৯৫ নং কেশবচন্দ্র সেন সট্রীট, কলিকাতা; দশম সংস্করণ–১৯৫০ খ্রি.।

৫. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *তাপসমালা*; দ্বিতীয় ভাগ; নববিধান পাবলিকেশন কমিটি; ৯৫ নং কেশবচন্দ্র সেন সট্রীট, কলিকাতা; দশম সংস্করণ– ১৯৫০ খ্রি.।

৬. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত; *তাপসমালা*; তৃতীয় ভাগ; নববিধান পাবলিকেশন কমিটী; ৯৫ নং কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা; দশম সংস্করণ-১৯৫০খ্রি.।

৭. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *তাপসমালা*; চতুর্থ ভাগ; পারস্য পুস্তক তেজকরতোল আওলিয়ার বঙ্গানুবাদ; ৩নং রমানাথ মজুমদারের স্ট্রীট, কলিকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯০২।

৮. স্বর্গগত গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত; *তাপসমালা*; পঞ্চম ভাগ; প্রকাশিকা লিমিটেড (নববিধান প্রেস); ৩নং রমানাথ মজুমদারের স্ট্রীট, কলিকাতা; নবম সংস্করণ-১৯৫৩।

৯. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *তাপসমালা*; ষষ্ঠ ভাগ; নববিধান প্রেস; ৩নং রমানাথ মজুমদারের স্ট্রীট, কলিকাতা; অষ্টম সংস্করণ- ১৯৪১।

১০. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; *হদিস পূর্ব্ব বিভাগ*; ৩নং রমানাথ মজুমদারের স্ট্রীট, মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস; কলিকাতা– ১৮২৬ শক।

১১. শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন; *হিতোপাখ্যান মালা*; দ্বিতীয় ভাগ; ঢাক-গিরিশযন্ত্রে মুন্সী ওয়াহেদ বক্স পিণ্টার কর্তৃক মুদ্রিত; ১২ মাঘ, ১৩০৩ সন।

খ. সহায়ক-গ্রন্থ

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত; *পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ*; অখণ্ড সংস্করণ; মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ; কলকাতা-৭০০ ০৭৩; দ্বাবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৯।

২, ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ এম-এ, ডি-ফিল, ডি-লিট সম্পাদিত *রামমোহন রচনাবলী;* হরফ প্রকাশনী; কলকাতা; তৃতীয় মুদ্রণ–১৩ মার্চ ১৯৯৮।

৩. শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী; *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*; পুনশ্চ; ৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন; কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ– জানুয়ারি ২০১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪. শ্রী অনীলচন্দ্র ঘোষ এম.এ; *রাজর্ষি রামমোহন*; প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী; ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩; বর্তমান সংস্করণ- জুন ২০১২।

৫. অন্নদাশঙ্কর রায়; *বাংলার রেনেসাঁস;* দ্বিতীয় মুদ্রণ- এপ্রিল ২০০৪।

৬. অসিতকুমার ভট্টাচার্য; *অক্ষয়কুমার দত্ত এবং উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজ চিন্তা*; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী; গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২; প্রথম প্রকাশ- ২০০৭।

৭. অলোক রায়; *উনিশ শতক;* ৫৭/২ই, কলেজ স্ট্রিট; কলকাতা ৭০০০৭৩; প্রমা পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১২।

৮. অরুণকুমার বসু সম্পাদিত; *সারস্বত; বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত*; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮।

৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*; পঞ্চম খণ্ড; মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড; প্রথম সংস্করণ– ১৯৮৫।

৯৬. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য;* বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ; প্রথম সংস্করণ-১৯৫৯; পরিশিষ্ট অংশ।

১০. ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত;* মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড; ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট; পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ-১৯৯৫।

১১. অভিজিত রায় সম্পাদিত; *তিন শতকের ডিরোজিও চর্চার ধারা;* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা; প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১০।

১২, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত; *পুথি-পরিচিতি*; প্রকাশক মুহাম্মদ আবদুল হাই; অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮।

১৩. আবুল আহসান চৌধুরী ; ভাই গিরিশচন্দ্র সেন; বাংলা একাডেমি, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-১৯৮৯।

১৪. আবদুল হক সম্পাদিত ; *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*; বাংলা একাডেমি ; ঢাকা; দ্বিতীয় খণ্ড; প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর ১৯৮৬।

১৫. আবদুর রাউফ ও অন্যান্য সম্পাদিত ; *রোকেয়া রচনাসংগ্রহ* ; বিশ্বকোষ পরিষদ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ-আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮।

১৬. মো. আবদুল্লাহ আল-মাসুম; *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার;* বাংলা একাডেমি ঢাকা; প্রথম প্রকাশ-জুন ২০০৮।

১৭. ইব্রাহিম খাঁ; *বাতায়ন*; বাংলা একাডেমী; বর্ধমান হাউস; ঢাকা; প্রথম প্রকাশ- জুলাই ১৯৬৭।

১৮. কঙ্কর সিংহ; *সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট*; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ; বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; দ্বিতীয় সংস্করণ এবং প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. কাবেদুল ইসলাম; *ইংরেজ আমলে বাংলার প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস ১৭৬৫-১৯৪৭*; অ্যাডর্ন পাবলিকেশন; প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১০।

২০. ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী; *আধুনিক ইওরোপ;* পরিমার্জিত সংস্করণ- অক্টোবর, ১৯৮৩; কলকাতা- ৭০০০৭৩।

২১. শ্রীকেদারনাথ মজুমদার; *ময়মনসিংহ ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ*; দ্বিতীয় প্রকাশ- নভেম্বর ২০১১।

২২, কো. আন্তোনভা ও অন্যান্য; *ভারতবর্ষে ইতিহাস*; প্রগতি প্রকাশন, মস্কো; দ্বিতীয় সংস্ককণ- ১৯৮৬।

২৩. গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ; *রাজা রামমোহন রায় (জীবন চরিতের নতূন খসড়া)*, অরুণা প্রকাশন সংস্করণ- জুলাই, ২০১০।

২৪. গোলাম মুরশিদ; *রেনেসন্স বাংলার রেনেসন্স;* অবসর প্রকাশনা সংস্থা; সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০; প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

২৫. ছবি বসু (রায়) ; *বাঙলার নারী আন্দোলন*; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩; প্রথম দে'জ সংস্করণ: আগস্ট ২০১২।

২৬. ঝরা বসু; *কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ*; ৫২/২ই, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা; দ্বিতীয় মুদ্রণ:১লা বৈশাখ, ১৪২০।

২৭. তপোব্রত ব্রাহ্মচারী; *ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও নববিধান*; *দশদিশি*; প্রথমভাগ; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; ২১১ বিধান সরণী; কলকাতা-৭০০০০৬; অক্টোবর ২০১৩-মার্চ২০১৪।

২৮. তীর্থপতি দত্ত সম্পাদিত; বিদ্যাসাগর রচনাবলী; প্রথম খণ্ড, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব; ৩য় সংস্করণ মে, ১৯৯৭।

২৯. দেবব্রত ঘোষ সম্পাদিত; *স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নবজাগৃতি*; ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট; কলকাতা ৭০০০৭৩; প্রথম প্রকাশ- ১২ জানুয়ারি ২০১৩।

৩০. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত*; দে'জ পাবলিশিং; কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩; পঞ্চম সংস্করণ: আষাঢ় ১৪২০।

৩১. নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত; *উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক;* দীপিকা বসু; উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ ও যুগচেতনা; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী; কলকাতা; তৃতীয় মুদ্রণ- ২০০৯।

৩২, শ্রীনাথ চন্দ; *ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর*; ভারত মহিলা প্রেস, ঢাকা; ১৯১১ সালে প্রকাশিত।

৩৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য;* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ; কলিকাতা; পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৯৪।

৩৪. শ্রী প্রমথনাথ বিশী; *চিত্র-চরিত্র*; বোধি (তক্ষশীলার প্রকাশনা বিভাগ); ৪১ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা- ১০০০; বাংলাদেশ মুদ্রণ গ্রন্থমেলা-২০১৩ খ্রী।

৩৫. প্রসাদরঞ্জন রায় সম্পাদিত :

Dhaka University Institutional Repository

রাজারামমোহন রচনাবলী; হরফ প্রকাশনী; কলেজ স্ট্রীট মার্কেট; কলকাতা-৭০০০০৭; প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০০৮ ।

রামমোহন রচনাবলী; রামমোহন মিশন; ১৬২/৬৯, লেক গার্ডেনস্, কলকাতা-৭০০ ০৪৫; নতুন সংস্করণ: নভেম্বর ২০১৫।

৩৬. প্রবীর মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত; *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা;* প্রথম খণ্ড : প্রথম ভাগ; দীপায়ণ; ২ কেশব সেন স্ট্রিট; কলকাতা-৭০০০০৯; দ্বিতীয় মুদ্রণ-জানুয়ারি ২০১৩।

৩৭. প্রিয়বালা গুপ্তা; *স্মৃতি মঞ্জুষা*; দে'জ পাবলিশিং কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ১৯৯৯।

৩৮. শ্রী বারিদবরণ ঘোষ; *সাহিত্য সাধক-শিবনাথ শাস্ত্রী*; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত; কলিকাতা-৬।

৩৯. শ্রীবঙ্কবিহারী কর; *পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত*; মৌমিতা প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিকেশন্স; বাংলাদেশে পুনর্মুদ্রণ; আগস্ট ২০১৪।

৪০. বারিদবরণ ঘোষ; *ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*; নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন; কলকাতা ৭০০ ০০৯; দ্বিতীয় সংস্করণ ও প্রথম নিউ এজ প্রকাশনা ২০০৯।

৪১. বিনয় ঘোষ; *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ;* প্রথম ওরিয়েন্ট ব্লাকসোয়ান সংস্করণ- ২০১১; ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৪২. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত; *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*; দ্বিতীয় খণ্ড; বীক্ষণ গ্রন্থন ভবন; কলিকাতা-৩২; প্রথম প্রকাশ-১৯৬৩।

৪৩. বিপানচন্দ্র; *আধুনিক ভারতের ইতিহাস;* অনুবাদ-কৃষ্ণেন্দু রায়; ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড ২০০৯; প্রথম প্রকাশ- ২০১২।

৪৪. বিদ্যুৎবিকাশ দে; *বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে বিবেকানন্দের ধর্মবোধ;* বুক ওয়াল্ড; ১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা- ৭৯৯০০১; প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি-২০১৩।

৪৫. বিপিনচন্দ্র পাল; *নবযুগের বাংলা*; চিরায়ত প্রকাশন; ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা; পরিবর্ধিত পরিমার্জিত চিরায়ত সংস্করণ আগস্ট ২০১২।

৪৬. শ্রী বিপিনপাল; *চরিতকথা*; ৩৭ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত; কলিকাতা; ১৩২৩।

৪৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; *বাংলা সাময়িকপত্র*; দ্বিতীয় খণ্ড; তৃতীয় মুদ্রণ-ফাল্গুন ১৩৮৪।

৪৮. ভারতী রায় সংকলিত ও সম্পাদিত; *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা*; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা; দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল-২০১২।

৪৯. শ্রীভূদেব চৌধুরী; *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়);* পরিবর্তিত প্রথম দে.জ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর-১৯৮৪।

৫০. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*; অলকানন্দ পাবলিশার্স; ৩৫/৩ বেনিয়াটোলা লেন; অলকানন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২।

Dhaka University Institutional Repository

৫১. ডক্টর এম. মতিউর রহমান; *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ উনিশ শতক*; অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০; প্রথম অবসর প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

৫২, মুনতাসীর মামুন; *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন*; *দশদিশি*; প্রথমভাগ; অক্টোবর ২০১৩-মার্চ ২০১৪।

৫৩. মুন্শী শ্রী আবদুল করিম সঙ্কলিত; *বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ*; প্রথম খণ্ড; দ্বিতীয় সংখ্যা; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হতে প্রকাশিত; পৃ.-

৫৪. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য; *বাংলাদেশের ইতিহাস;* নওরোজ কিতাবিস্তান; ৫, বাংলা বাজার; ঢাকা-১১০০; সপ্তম সং- নভেম্বর-১৯৯৮; পৃ.-৪২৬।

৫৫. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক; *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; তৃতীয় পুনমুর্দ্রণ জুন-২০০৯; পৃ.-১১৮.

৫৬. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক; *বাংলার ইতিহাস: ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব;* বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রথম পুনর্মুদ্রণঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৯; পৃ.-৬৪।

৫৭. ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য; *বাংলাদেশের ইতিহাস*; ৫, বাংলাবাজার, ঢাকা; ষষ্ঠ সংস্করণ; মে ১৯৯৭।

৫৮. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবর রহমান; *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা*; প্রকাশনা পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ; প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৮৬।

৫৯. মোহাম্মদ হান্নান; *বাঙালির ইতিহাস;* আগামী প্রকাশনী কর্তৃক প্রথম বর্ধিত সংস্করণ-ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৬০. ড. মোহাম্মদ হাননান; *পবিত্র কোরআন অনুবাদের নানা প্রসঙ্গ;* আগামী প্রকাশনী; প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

৬১. মোবাশ্বের আলী; *মধুসূদন ও নবজাগৃতি*; মুক্তধারা, ঢাকা-১১০০; চতুর্থ সংস্করণ– ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭।

৬২, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল; *রাজনারায়ণ বসু*; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ; ২৪৩/১, অপার সারকুলার রোড; কলিকাতা; প্রথম সংস্করণ- পৌষ ১৩৫২।

৬৩. রঞ্জন গুপ্ত ; *ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা; প্রথম

সং. জানুয়ারি ২০০৯।

৬৪. রণজিৎ কুমার সেন; *মওলানা ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*; ৩৭,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৬৫. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়; *উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য;* ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা; প্র. প্র. জুলাই ১৯৯৯।

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; *ভারতপথিক রামমোহন রায়*; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ; কলকাতা; পুনরমুদ্রণ- বৈশাখ-১৪১৫।

৬৭. শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার; *বাংলা দেশের ইতিহাস;* তৃতীয় খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; চতুর্থ সংস্করণ- ১৯৯৬।

৬৮. রশীদ আল ফারুকী; *বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ;* বাংলা একাডেমি; ঢাকা; প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫।

৬৯. রহমান হাবিব; *রাজা রামমোহন রায় দর্শন ও ধর্মচিন্তা*; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ- জুন, ২০১০।

৭০. রাজা রামমোহন রায়; *তুহফাৎ উল মুত্তয়াহিদীন*, অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; কলকাতা-১৯৪৯।

৭১. লক্ষ্মীনারায়ণ রায়; *ব্রাহ্মধর্মের পরম্পরা ও ইতিবৃত্ত*; প্রথম প্রকাশ; কলকাতা বইমেলা, ২০০৪।

৭২, শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়; *রেনেসাঁসের আলোয় বঙ্গ দর্শন;* কথা প্রকাশ; বাংলাবাজার, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ- একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

৭৩. শাহ মুহাম্মদ সগীর; *ইউসুফ জোলেখা*; ডক্টর মুহম্মদ এনামূল হক সম্পাদিত; মাওলা ব্রাদার্স; ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; ষষ্ঠ মুদ্রণ মে ২০১৫।

৭৪. শিবনাথ শাস্ত্রী; *আত্মচরিত*; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; ২১১ বিধান সরণি, কলিকাতা; পুনর্মুদ্রণ ২০০০।

৭৫. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়; *পলাশি থেকে পার্টিশন;* প্রথম ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান মুদ্রণ: ২০০৯।

৭৬. সরকার আবুল কালাম সম্পাদিত; অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থের; *মহেশ্বরদীর ইতিহাস*; বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০; প্রকাশকাল-১৪ এপ্রিল, ২০১৪।

৭৭. সফিউদ্দিন আহমদ*; ইয়ংবেঙ্গল মুভমেন্ট ও ডিরেজিও;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৯।

৭৮. ড. সফিউদ্দিন আহমদ; *বাংলা সাহিত্যের কাল ও কালান্তর;* প্রকাশ- জুন ১৯৯৮।

৭৯. ৬. সফিউদ্দিন আহমদ; *ডিরোজিও: জীবন ও সাহিত্য;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ–জুন ১৯৯৫।

৮০. ড. সফিউদ্দিন আহমদ; *কোরানের প্রথম অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন*; বিশ্বসাহিত্য ভবন; ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০; প্র.প্র. বইমেলা ২০১২।

৮১. সিরাজুল ইসলাম; *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা; দ্বিতীয় মুদ্রণ- নভেম্বর ১৯৮৯।

৮২, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত: ;

বাংলা পিডিয়া; খণ্ড-১; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০১৩।

বাংলা পিডিয়া; খণ্ড-৩; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০১৩।

বাংলা পিডিয়া; খণ্ড-৬; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০১৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা পিডিয়া; খণ্ড ৮; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০০৩।

৮৩. অধ্যাপক শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত; *মেঘনাদবধ কাব্য;* পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৭; মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ; কলিকাতা-৭০০০৭৩।

৮৪. সুকোমল সেন; *ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ;* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড; ষষ্ঠ মুদ্রণ : জুলাই, ২০১০।

৮৫. সুপ্রকাশ রায়; *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*; তৃতীয় র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ; কলকাতা; আগস্ট ২০১৩।

৮৬. সুশোভন সরকার; *বাংলার রেনেসাঁস*; দীপায়ণ, কলকাতা; পঞ্চম সংস্করণ-নভেম্বর ২০১১।

৮৭. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনুবাদিত ও সম্পাদিত; *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*; প্রথম খণ্ড; কামিনী প্রকাশালয়; কলকাতা; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য; কামিনী সংস্করণ– বৈশাখ, ১৪১৭।

৮৮. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনুবাদিত ও সম্পাদিত; প্রাগুক্ত; দ্বিতীয় খণ্ড; পঞ্চম প্রকাশ–মাঘ, ১৪১৮।

৮৯. সুরজিৎ দাশগুপ্ত; *রামমোহন: ব্যক্তিতন্ত্র ও বিশ্বতন্ত্র*; সংস্কার; ১২এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩; জানুয়ারি-২০১৩।

৯০. সোনিয়া নিশাত আমিন; *নারী ও সমাজ*; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত ; *বাংলাদেশের ইতিহাস*; তৃতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০০।

৯১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ; *ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসন);* গ্লোব লাইব্রেরি (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা ও বরিশাল; পুর্নমুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৯১।

৯২, স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত; *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি;* পুস্তক বিপণি, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০০৩।

৯৩. স্বপন বসু; *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*; পুস্তক বিপণি; ২৭ বেনিয়াটোলা লেন; কলকাতা-৯; পঞ্চম সংস্করণ-জানুয়ারি, ২০১৪।

৯৪. স্বামী স্বাহানন্দ; *বেদান্ত ও রামকৃষ্ণ*; ভাষান্তর; ড.সচ্চিদানন্দ ধর; রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার; কলকাতা ৭০০ ০২৯; প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর, ২০১২।

৯৫. হারুন-অর-রশীদ; *বাঙালী ও বাংলাদেশ ০-২০০৫*; হাসিনা প্রকাশনা ঢাকা; বর্ধিত সংস্করণ-ফেব্রুয়ারি ২০০৮।